আলোছায়া দোলা

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক

দি বুক এক্সচেঞ্জ

পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক

২১৭, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ ১৩৬৭

প্রকাশক :
শ্রীমতী সুলেখা চট্টোপাধ্যায়।
৮/৪ জে, বীরপাড়া লেন।
কলিকাতা—৭০০০৩০

মুদ্রক :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

দিন দুপুরের চাঁদ

কোলকাতা সহর।

কালো পিচের বুকের দু'পাশে ঠেলে উঠেছে যৌবনোন্নত দুটি স্তনের মত পথের দু'ধারের তিন কোণা খোলার বস্তির ছাদ। আর তার পিছনে, ঠিক দুপুর বেলা রৌদ্রপ্লাবিত নীল আকাশে খড়ি দিয়ে আঁকা একফালি চাঁদ—দিন দু'পুরের চাঁদ।

এই দিন দুপুরের চাঁদই একদিন মনে হয়েছিল পিঙ্গলা ও মহেন্দ্রের কাছে মাঝ রাত্রিরের চাঁদ, দুপুরটাকে মনে হয়েছিল রাত, রৌদ্রটাকে মনে হয়েছিল জ্যোৎস্না। আর তাইত মহেন্দ্র সেদিন তিন নম্বর খোলার বস্তিতে শুধু নিরাভরণ দুটি হাতের শুভ্র সুন্দর পরম করুণারসাযিত অঙ্গুলিস্পর্শ লাভ করতে করতে অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করেছিল। না, ভুল হোলো, মহেন্দ্র চৌধুরী সেদিন অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করতে পারেনি—বিনা কষ্টে নিজেকে অসংযত করেছিল। আর পিঙ্গলার কি মনে হয়েছিল এমন এক দিন আসবে।

*　　*　　*

অনেক দিনের কথা, পিঙ্গলার কিছু মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে না। যাকগে সে কথা।

আঁকা বাঁকা সর্পিল রাস্তাটি চলে গেছে গঙ্গার দিকে। সে পথের ডাইনে বাঁয়ে নানা ধরণের মনোহারী দোকান—কোথাও চুড়ি বিক্রী হচ্ছে, কোথাও শাঁখা, কোথাও তরী-তরকারীর আসর বসেছে, কোথাও বেচাকেনা চলেছে কোথায় পরিচিতের দেখা শোনা। সমস্ত পথটির কোথাও গঙ্গাস্নানার্থীর শুকনো পায়ের ধূলিধূসরতায় আচ্ছন্ন, কোথাও স্নান সমাপনান্তে ফিরতিমুখো নরনারীর দেহচ্যুত জলধারায় একটা কুৎসিত পিচ্ছিল পঙ্কিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিঙ্গলা চলেছে গঙ্গার দিকে। বাড়ীর কাজ এক্ষুণি সারা হোলো। বাঁ হাতে গামছা আর ডান হাতে ছোট্ট একটি পেতলের ঘট, মাথায় আধো ঘোমটা, মুখে বিষণ্ণ রুক্ষতা—দ্রুতপদে নিঃসঙ্গ অবস্থায় গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলেছে।

হৈ হৈ হৈ হৈ······

চারদিকে ভীড় জমেছে, তার মধ্যে ছোট ছেলে আর অশিক্ষিতের সংখ্যাই বেশী। সেই ভীড়ের মর্মমূল হাতে চাপা একটা ডুগডুগির শব্দ ও হিন্দী ভাষায় "বাচ্চালোগ সব তালি এক দফে।" স্ত্রীজাতিসুলভ অসামান্য কৌতুহল নিয়ে পিঙ্গলা ভীড়ের সেই অংশটার দিকে ঘেঁসতে চেষ্টা করল যেখানে লোক একটু ঘনসনিবদ্ধভাবে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই চক্রব্যূহের অভ্যন্তরে কি আছে দেখবার চেষ্টা করছে। উঠে দাঁড়াল পিঙ্গলা গাছকোমর বেঁধে। একটু অশ্লীল হল, তা হোক্‌গে। গরীবের মেয়ে, মানুষ হয়েছে বস্তির কদর্য্য আব হাওয়ায়, অত সুরুচির বালাই তার নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখলে পিঙ্গলা ভীড়ের মধ্যে এক যাদুকর একটি স্ত্রীলোককে নিয়ে খেলা দেখাচ্ছে। যাদুকর মুখে এঁটেছে মুখোস আর স্ত্রীলোকটির মুখটি অবগুণ্ঠনে আবৃত। তার দেহটি রয়েছে অস্পষ্টভাবে ভীড়ের লোকগুলির লোলুপ চোখের সামনে তুলে ধরা; তার পীবর স্তন দুটি ঠেলে বেরিয়ে আছে পাতলা কাঁচুলির সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করে উদ্দীপকভাবে। কুঁচি দেওয়া ঘোরানো পাতলা ঘাঘরায় তার সায়াবিহীন নিম্নাঙ্গ আবছাভাবে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। লোকটি খেলা দেখিয়ে চলেছে; সঙ্গিনী মেয়েটি ডুগডুগি বাজিয়ে ভীড় বাড়াচ্ছে। লোকটির পাশে কতকগুলি ছুরি পড়ে রয়েছে—ম্যাজিকের ছুরি.। ইতিমধ্যে সে পামিংয়ের কতকগুলি বিচিত্র খেলা দেখাল।

আনন্দে পিঙ্গলার চোখ দুটি বড় হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনটা অনেকদিন আগেকার স্মৃতির ভারে করুণ বিষণ্ণতায় ভরে উঠল।

মহেন্দ্র চৌধুরী ছিল যাদুকর।

পিঙ্গলা এই খেলাগুলি বেশ বোঝে। পামিং অর্থাৎ করতলে লুকিয়ে রাখার পদ্ধতি সে মহেন্দ্রর কাছে বেশ ভাল করেই শিখেছিল। অবশ্য সেদিন সে বাইরে এসে খেলা দেখাত না। চেনাশুনা বস্তির মধ্যে অথবা খুব কাছাকাছি কোন একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হলে সে মহেন্দ্র চৌধুরীর সহকারিণী হত।

যাক্‌গে সে কথা।

গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসা যাক—গঙ্গার পবিত্র জলধারায় মিশে যাক তার পঙ্কিল পদস্খলনের কদর্য্য ইতিহাস।

* * *

গঙ্গায় গিয়ে দেহটা ডুবিয়ে দিল বটে, কিন্তু স্মৃতিটাকে ডুবিয়ে দিতে পারল না। মনে করেছিল মহেন্দ্রের কথা সে আর ভাববে না। চুলোয় যাক্ বিনোদিনী। তারা সুখে থাক বা দুঃখে থাক তাতে তার কিছু যায় আসে না। পাড়াগাঁ হতে অন্নসংস্থানের ব্যাকুল চেষ্টায় মাত্র কয়েকটি টাকা মূলধন নিয়ে আর একটা ভাঙা তোরঙ্গ নিয়ে চলে এসেছিল মহেন্দ্র চৌধুরী। তিন নম্বর বস্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে কাকে যেন সেদিন একখানা ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করছিল। ভাড়া সে বেশী দিতে পারবে না, মাত্র দুটি টাকা। বস্তির বাড়ীওয়ালা তার শীর্ণ চেহারা আর জীর্ণ বেশবাস দেখে রুক্ষভাবে বলেছিল অন্যত্র বাড়ীর সন্ধান করতে। সেদিন পিঙ্গলার কি রকম লেগেছিল মহেন্দ্রের অসহায় মুখটি। কিছুতেই সে বাড়ীওয়ালীর কথা সমস্ত মন দিয়ে সমর্থন করতে পারেনি। তীব্র চাপা বিরক্তিতে বলেছিল, "ভদ্রলোকের ছেলে খারাপ অবস্থায় পড়েছে বলে সে কি তোমায় মাসে দুটি টাকাও দিতে পারবে না?"

একরকম জোর করেই সে নিজের ঘরটির অর্দ্ধাংশ ছেড়ে দিয়েছিল মহেন্দ্র চৌধুরীকে। কিন্তু তাকে সে সুস্পষ্ট বলে দিয়েছিল রাত্রে তাকে বারান্দায় থাকতে হবে, ঘরে থাকা কিছুতেই চলবে না। কারণ রাত্রিবেলা দূর সম্পর্কের একজন আত্মীয় আসত তার কাছে কেবল নাকি গল্পসল্প করার জন্যেই, আর মাসে মাসে সেই তার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে পোনেরো টাকা করে দিত। সেদিন রাত্রের কথা মনে পড়ল পিঙ্গলার। মহেন্দ্র রোয়াকে ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে। ঘরের ভেতর হোতে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে তার এপাশ ওপাশ করার শব্দ। সেই ম্লান অন্ধকারে নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে অত্যধিক কামোত্তেজনার মধ্যেও চুম্বনবুভুক্ষু পুরুষের আনীয়মান মুখখানির উষ্ণ নিঃশ্বাস ভোগ করতে করতে তার সমস্ত আনন্দ কী জানি হঠাৎ দুঃখের বাঁকা খালে তার মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘরে সঙ্গের লোকটি বুঝতে পারেনি বাইরের ঐ নিরাশ্রয় লোকটির কথা ভেবে তার মন কতখানি ব্যাকুল হয়েছিল। কড়ায় গণ্ডায় সে তার পাওনা পুষিয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর পিঙ্গলা অনেক রাত্রে উঠে বাইরে এসে দেখলে কি করছে মহেন্দ্র চৌধুরী।

রাত্রি তখন অন্ধকার ক'রে এসেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে ঘন ঘন ঐকতানে। উচ্ছিষ্ট ভোগপাত্রের চারধারে ইঁদুর কিচমিচ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর ঠিক

সেইখানে থালার উপর একটি হাত রেখে ফেলে দেওয়া এঁটো ভাত চুরি করে খেতে খেতে অপরিসীম ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়েছে মহেন্দ্র চৌধুরী।

ঘরে ফিরে এল পিঙ্গলা চুপিসাড়ে। একটু শব্দ হোলেই মহেন্দ্রের তন্দ্রা ভেঙ্গে যেত। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে কিছুতেই সে ডাঙ্গাটুলের উপর পর্য্যুষিত ঠাণ্ডা আলুর চপ আর পেঁয়াজী আর ঠাণ্ডা চায়ের গেলাস আর তার পাশে লেড়ো বিস্কুটের টুকরো কিছুক্ষণ আগে যেমন সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছিল তেমনি ভাবে গ্রহণ করতে পারল না। একবার মনে হল উঠে বাইরে যায়, উচ্ছিষ্ট ভোগপাত্রের উপর ঐ ভোজ্যগুলি মহেন্দ্রের সামনে ফেলে দেয়। তারপরেই মনে হোলো মাত্র একদিনের উপবাসেই সম্পূর্ণ একটি বাইরের অপরিচিত লোকের জন্য অতখানি আকুলতা প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। আর রাতের বাঁধা আতিথিটিই বা কি ভাববে। যদি সে মাসিক পনের টাকাটা বন্ধ করে দেয় তাহলে সে কত নিরাশ্রয়।

চুপ করে শুয়ে রইল পিঙ্গলা। অনেক রাত্রি অবধি সে ঘুমোতে পারল না।

পরের দিন সকালে রাতের লোকটি চলে যাবার পর পিঙ্গলা মহেন্দ্রকে ডাকলে, "বলি শুনুন, কত টাকা এনেছেন?"

মহেন্দ্র উত্তর দিলে না। হয়ত একটু ভীতই হোলো।

পিঙ্গলা বল্লে: আপনার যেদিন খাবার অসুবিধে হবে সেদিন আমাকে বলবেন।

বিগলিত হোয়ে মহেন্দ্র ঘরের অন্যার্দ্ধে গিয়ে চুপ করে বসে বিড়ি টানতে লাগল। সামনে একটা জানালা ছিল, তার নীচে বাইরের দিকে কল, সেজন্য সব সময় ফুলো থাকত। পিঙ্গলা কিছুতেই খুলতে পারত না। আজকে মহেন্দ্র সেই জানালাটি খোলার ব্যবস্থা করেছিল। ঘরে এক ঝলক হাওয়া এল · ঠাণ্ডা হাওয়া। সমস্ত রাত্রির মাতামাতি আর ক্লান্তি মুছে ফেলবার জন্য স্নান করতে চলল পিঙ্গলা, যাবার সময় কিন্তু জানালাটি বন্ধ করে দিয়ে গেল।

খানিক বাদে ফিরতেই সে দেখতে পেল মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে সরে এল। নিশ্চয়ই সে জানালায় কোন একটি ছিদ্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে স্নানরতা পিঙ্গলার অনাবৃত দেহশ্রী দেখবার জন্য সে এতক্ষণ ব্যগ্র হয়েছিল। কাপড়টা ছাড়তে ছাড়তে পিঙ্গলা বল্লে, "পেটে ভাত নেই, প্রাণে রস ত খুব!"

থতমত হয়ে মহেন্দ্র বল্লে: তার মানে?

তার দিকে পিঙ্গলা তাকালো নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে। মহেন্দ্র চোখাচোখি বেশীক্ষণ হতে পারল না, মুখটা নামিয়ে ফেললে। তারপর নিজের হাতে পিঙ্গলা তাকে খাওয়ালে, জামার দু' একটা ছেঁড়া জায়গা মেরামত করে দিলে। মহেন্দ্র দুপুর রৌদ্রে বেরিয়ে পড়ল কাজের সন্ধানে।

এমনি কোরে এক নিরাশ্রয়কে কেন্দ্র করে পিঙ্গলার সমস্ত মাতৃত্ব, পত্নীত্ব, ভগ্নীত্ব যেন জেগে উঠল। দেহের ক্ষুধা এবং স্নেহের সুধা দুই তার মনের মধ্যে উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে লাগল। রাত্রের রুটিনবাঁধা জীবনে না আছে প্রেম, না আছে কোনও অনুরাগের দীপ্তি। সে কেবল মাসিক পনের টাকা মাহিনায় সারা জীবনব্যাপী চুক্তির আনন্দ বিধানের দায়িত্বটুকু। এখানে কোন দায়িত্ব নেই, কিন্তু মমত্ব রয়েছে। ভদ্রতা করে যাকে সে প্রথমে পথের মাঝখান থেকে টেনে এনেছিল, আজ তাকে নিবিড় হৃদ্যতায় ঘিরে ফেলতে চায় পিঙ্গলা।

পিঙ্গলাই নিজের টাকা দিয়ে দু'চারটে ম্যাজিকের সরঞ্জাম কিনতে সাহায্য করল মহেন্দ্রকে। তারপর ধীরে ধীরে রাস্তায় বার করলে তাকে কাঁধে ঝুলি ঝোলা নিয়ে। সেই ঝুলি-ঝোলায় থাকত ডিমিনিসিং কার্ডের খেলা দেখাবার জন্যে ছোট থেকে বড় আকারের নানাবিধ তাস, একটি ফোর্সিং প্যাক—তাতে বাহান্নখানা তাসই চিড়িতনের গোলাম, আর তার সঙ্গে ঐ মার্কামারা তিন চার প্যাকেট তাস; ছোট্ট একটি কাঁচের গেলাস আর তার ভেতরে লুকোনো কৃত্রিম কাঁচের একটি পয়সা। কাঠের একটি কাঠিকে কালো কাগজে মুড়ে যাদুদণ্ডে রূপান্তরিত করা হয়েছিল—এটি থাকত সর্বাগ্রে। এছাড়া আরও কতক গুলি দড়ির খেলা দেখাবার জন্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থাকত তার ঝোলা ঝুলিতে। বাহিরে ম্যাজিক দেখাত মহেন্দ্র চৌধুরী রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, ডুগডুগি বাজিয়ে, চেঁচিয়ে ভীড় জমিয়ে। গড়পড়তা আনা আষ্টেক আসত দৈনিক। তার থেকে নিজের কাছে আনা দুয়েক রেখে বাকী পয়সা মহেন্দ্র পিঙ্গলার হাতে তুলে দিত। পিঙ্গলাকে সে আদর কোরত না মোটেই, বরঞ্চ নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে তার সঙ্গ এড়িয়ে যাবার চেষ্টাই কোরত। অথচ যখনই পিঙ্গলা চোখ বন্ধ করে ঘুমোবার চেষ্টা কোরত, তখনই সে তার বুভুক্ষু দৃষ্টি দিয়ে তার স্খলিত গাত্রাবাসের ভিতর থেকে ঠেলে আসা রক্ত-শিখরিত দুটি যৌবনপুষ্পের দিকে তাকিয়ে থাকত।

বুঝতে পারল পিঙ্গলা কি সে চায়, আর কি সে চায়না। কেমন কোরে দু'জনের মাঝপথে আসে লজ্জা, আসে মহেন্দ্রের দৈন্যের কুণ্ঠা, আসে অকৃতজ্ঞতার ভয়। মহেন্দ্রকে একদিন সে প্রলুব্ধ করলে। দুপুরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে। *পাশ ঘেঁসে একটি চোখ বন্ধ কোরে তার দিকে তাকিয়ে* প্রশ্ন করলে: এর মানে কি বলত?—তারপর সে মহেন্দ্রের এক প্যাকেট তাস হাতে নিয়ে বল্লে: তুমিও ম্যাজিক জান, আমিও জানি। কিন্তু আমি তাসটা লুকোলে তুমি খুঁজে বার কোরতে পারবে?

গঙ্গায় ডুব দিতে দিতে সেদিনের পরিপূর্ণ আনন্দের কথা পিঙ্গলার মাথায় ভেসে এল।

সবটুকু দিয়ে পিঙ্গলা ভুল করলে। মহেন্দ্রের আগ্রহের অবসান ঘটল, শ্রদ্ধার ভাবও অন্তর্হিত হোলো। কোনও কৃতজ্ঞতার কথাই আর তার মাথায় এল না। একটি আদর্শের সামনে দাঁড়িয়ে মহেন্দ্র এতদিনে নিজেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল নতুন ভাবে। আদর্শ যেদিন গেল, সেদিন মহেন্দ্রেরও আর লজ্জার কোনও প্রয়োজন রইল না। এতদিন তার সাহস ছিল না, এবার সে সাহস পেল। রাত্রের অতিথিটির আসা বন্ধ হোলো, পিঙ্গলাকে মারধর সুরু করলে, সুরু করলে মাতলামি। তারপর একদিন বিনোদিনী বলে বস্তির অন্য একটি মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাত্রিতে। যাবার সময় সে পিঙ্গলার টাকা-গুলো নিতে ভুলল না।

আর পিঙ্গলা—শত সহস্র বিরক্তির মধ্যেও অনুরক্তিতে ভরে উঠল। ঘৃণা সে সুরু কোরল মহেন্দ্রকে, ভালও সে না বেসে থাকতে পারল না। বাধ্য হয়ে সে আবার পুরাতন নৈশ জীবন গ্রহণ করল, কিন্তু সে কেবল দেহের জন্য, মন রয়ে গেল অবাধ্য।

গঙ্গা স্নান কোরে উঠল পিঙ্গলা। আপাদমস্তক দিয়ে জল ঝরে ঝরে পড়ছে। সমস্ত পাপও কি ঝরে পড়ল?

আবার ফিরতি পথ।

সেই আঁকা বাঁকা সাপের পথ। ভীড়ের সামনে এসে পিঙ্গলা থমকে দাঁড়াল। ছুরির খেলা চলেছে যাদুকরের—চোখ ঢাকা মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঠের তক্তার সামনে। আর তার আশে পাশে তার দেহ বাঁচিয়ে অদ্ভুত··· অব্যর্থ লক্ষ্যের সঙ্গে মুখোস আঁটা যাদুকর ছুরি ছুঁড়ে চলেছে।

মুখোস আঁটা লোকটি কি মহেন্দ্র চৌধুরী?

মেয়েটি কী বিনোদিনী? অতি তীব্র ঈর্ষার সঙ্গে সে তাকাল দু'জনের দিকে—চোখের আগুনে যদি মানুষ ভস্ম হতো তাহলে এতক্ষণ ওরা ছাই হয়ে উড়ে যেত। খানিক পরে কিন্তু পিঙ্গলার চোখ জলে ভরে গেল। হোক ওরা মহেন্দ্র আর বিনোদিনী—আজ সে কোনও অনুযোগ করবে না। কেবল মুখোস খুলে একবার এগিয়ে আসুক মহেন্দ্র চৌধুরী···একবার। অনেক দিন সে তাকে দেখেনি। আজ তার মনে হোলো মহেন্দ্র রাত্রির চাঁদের মত শোভা পাচ্ছে না, কিন্তু তবুও সে আছে দিনের বেলার খড়ি দিয়ে আঁকা চাদের মত দীপ্তি-বিহীন স্মৃতিরেখায় পর্য্যবসিত।

পিঙ্গলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। যাদুকর তাকে যাদু করেছে।

জীবনায়ন

পঞ্চানন মিত্রকে যে দেখেছে ছত্রিশ থেকে ছেচল্লিশ অবধি সে কখনও ভাবতে পারে না যে পঞ্চানন কোনও দিন কবিতা লিখেছে, ফুল দেখে বিভোর হয়েছে, চাঁদ দেখে কত কি কল্পনা করেছে। আজ সে-পঞ্চানন মারা গেছে তার বদলে দেখা দিয়েছে আর এক পঞ্চানন, যে মাঝে মাঝে নিজের নাড়ী দেখে, জিভের তলায় উত্তাপমান যন্ত্র রাখে, কোনও দিন গরম জলে স্নান করে, কোনও দিন গোটা কতক ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খায়। আর রোগ? পঞ্চানন জানে রোগ তার বারোমাসে লেগেই আছে—হয় বেরিবেরি, নয় সেরিব্র্যাল কনজেস্‌সান; হয় গ্লোকোমা, নয় কার্ডিয়াক ট্রাবল। হয় থোর্য়াক্স, নয় এ্যাবডোমেন ঠিক বিকল হয়ে বসে আছে।

ডাক্তাররা হাসেন।

আর সেই হাসি কল্পনা করে পঞ্চানন সমস্ত ডাক্তার-হাতুড়েদের মৃত্যু কামনা করে। পঞ্চানন বিলক্ষণ জানে ডাক্তারেরা কিস্যু জানে না। তারা জানে কেবল রোগী ঠকাতে, বুকের ওপর গাঁট্টা দিতে, স্টেথস্‌কোপ দিয়ে পিঠে সুড়সুড়ি দিতে। আসলে ডাক্তারেরা গোরু মাত্র।

অবশ্য সেই গোরুদের সঙ্গেই বাধ্য হয়ে তাঁকে মিশতে হয়। উপায় নেই··· নাচার।

মনে করুন সেদিনের কথা। সকাল হয়েছে। ঘাড়ে আর গলায় খাঁটি মেষ লোমের পুরু প্যাঁচ দেওয়া মাফ্‌লার, তার নিচে মোটা একটা কোট, তার আকণ্ঠভুঁড়ি বিস্তৃত দেহে যতগুলো বোতাম থাকা সম্ভব সবগুলোই আটকান। তারপর নাকের ভেতর ঘসে গোঁজা হচ্ছে নস্যির মত করে ইউক্যালিপ্‌টাস। মাঝে মাঝে তুলোয় করে খানিকটা গলার ভেতরও নেওয়া হয়েছে—কেননা সাবধানের মার নেই। ইনফ্লুয়েঞ্জা-জীবাণুর বৈঠকখানা হল গলা কিনা। অবশ্য গলার ঘাঁটি অতিক্রম করে কোন্ সময় পাকস্থলীর ভেতরে প্রবেশ করে তারই বা ঠিক কি? সেজন্য উপযুক্ত পরিমাণে জলের সঙ্গেও ইউক্যালিপ্‌টাস সেবন করতে হয়।

কিন্তু এমন সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও সেদিন সকাল থেকে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল। খুব গম্ভীর গলায় ডাক দিলেন: হারু!

হারু তাঁর অনেকদিনের ভৃত্য। প্রভুর চরিত্র বিলক্ষণ জানে। পঞ্চানন গম্ভীর গলায় বললেন : এখনই ডাক্ বদ্যিনাথকে·· যা···

বৈদ্যনাথ লাহিড়ী ডাক্তার। তিনি এলেন এবং গেলেন। কিন্তু তাঁর চলে যাওযার সঙ্গে সঙ্গে রোগটার মারাত্মকতা সম্বন্ধে আরও সচেতন হযে উঠলেন পঞ্চানন। বৈদ্যনাথ গোরু না হলে এমন গুরুতর অসুখের এমন লঘু ব্যবস্থা করে যেতে পারে? আশ্চর্য।

: হারু!

ডাক পড়তে আবার হাজির হল হারু। বললেন : বদ্যিনাথটা হাতুড়ে-বদ্যি। কিস্স্যু জানে না, গোরু। তুই দেখত নাড়ীটা!

আগে আগে হারু বলত, 'আজ্ঞে নাড়ী তো বেচাল হযনি।' সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠতেন তিনি, "থাম্ থাম্, বাঁদর কোথাকার। বলি নাড়ী দেখার কি জানিস তুই। কত বযসে কত নাড়ীর গতি হয বলত? জানিস্ তা? তবে, টকাস্ করে বলে দিলেই হল 'নাড়ী তো বেচাল হযনি'।"

আজকাল হারু কড়ে আঙুলের দিকটা টিপেই বলে : নাড়ীটা যেন কেমন এক রকম ঠেকছে!

: ঠেকছে না? দে ত দেখি আযনাটা, মুখটা দেখি·

· আযনাটা কাছে এনে ভাল করে চোখ দুটো পরীক্ষা করতে লাগলেন। চোখের তলার অংশ কতখানি লাল হয়েছে সেইটেই হল তাঁর মতে আসল পরীক্ষা। চোখের তলার অংশ যদি লালে লাল থাকে ত নিঃসন্দেহে বুঝতে পারেন ইন্ট্রাঅকুলার টেন্সন্ বেড়েছে···আর যদি হাল্কা লাল থাকে তো রক্তাল্পতা দেখা দিযেছে। প্রথম ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করেন ঘাড় উঁচু করে সোজা বসে থাকা চোখ বন্ধ করে। তাহলে চোখের রক্ত সুড় সুড় করে ভাল ছেলের মত নেবে আসবে। আর সেইটেই তাঁর মতে রক্ত-নামানোর সব চেয়ে ন্যাচুরাল প্রসেস।

অর্থাৎ পঞ্চানন মিত্র আর একটি অদ্ভুত লোক। কোনও কাজ নেই···কর্ম্ম নেই···কেবল অসুখ আর ওষুধের বই পড়া। জীবনের আট আনা ভরা ব্যাধিকল্পনা, আট আনা ভরা অভিমান। আর শান্তি নেই কোথাও!

অথচ পঞ্চানন মিত্র একদিন না করেছে কি? চাঁদ দেখে কি-পাগলামীই না করেছে, তারা দেখে টিপের কথা স্মরণ করেছে। বাতাস লেগে বেতস-পত্রের মত আন্তর আকুলতা লাভ করেছে। সেদিনকার পঞ্চানন চোখে চশমা

দিয়েছে, গুনগুন করে গান গেয়েছে, অপরের সঙ্গীতে সঙ্গত করে টেবিলের ছারপোকাকে সন্ত্রস্ত করে বেতালা চপেটাঘাত করেছে। রাস্তাতে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে হেঁটেছে, লেডিজ্ সীটের পেছনে পুলকাকুল চিত্তে বসে সিল্কের সুরভিত রুমালের হাওয়া খেয়েছে। 'বোয়া কনষ্ট্রিক্টর' বলে যাদের তর্কের স্থানে ব্যক্ত করেছে, শূন্ত ছাদে বসে তাদের কথা ভেবেই গোল্ড-ফ্লেকের টিন শূন্তগর্ভ করেছে।

আজ সে কথা স্মরণে আসে না পঞ্চাননের।

স্মরণে আসে না মালতীর কথা।

অথচ সুনীল খাম আর সুন্দর রাইটিং প্যাড তার জন্তই তো সর্বপ্রথম তার জীবনে এল।

আর দুজনের কি চিঠি!

কার্মাটারের ডাকঘরের ছাপমারা প্রথম অধ্যায়ের চিঠি—তার মধ্যে কি আকুলতা। পাতার শেষে গোল দাগ দিয়ে একটা বিশেষ অংশ থাকত। তার চারপাশে লেখা, এখানে আমার ওষ্ঠের প্রীতি রয়েছে তুমি সহানুভূতি দিও।

আর শেষ অধ্যায়ের চিঠি। দু ফোঁটা বালতীর জল ছিটোনো কালি ঝাপসানো চিঠি। তার মর্মার্থ, বন্ধু, আমার অকৃত্রিম চোখের জলের ছাপ রইল এই চিঠিতে। বন্ধু তোমার জয় হোক। আমি সামান্ত মেয়ে, আরও পাঁচটি মেয়ের মত আমি চললাম শ্বশুরালয়ে। আমাদের পথ হল ভিন্ন। মনের তারে কিন্তু বেসুরো ঝঙ্কার তুলো না।

আরও নানা কথা।

সুন্দর অথচ মিথ্যে!

মহাকালের ডায়েরীতে লেখা আছে ওদের নেপথ্যের অনেক কথা। স্বামীর কাছে মালতী বলেছে, যে তার মত কাউকে সে কোনও দিন ভালবাসেনি। তবে পঞ্চানন এর পূর্বে তাকে ভালবেসেছিল বোধহয়। কিন্তু তাও কোনও দিন দেহালুতার পর্যায়ে আসেনি।

মহাকাল হাসেন।

তাঁর ডায়েরীতে লেখা আছে অনেক মাঠে বেড়ানোর কথা। অনেক বন্ধে

বসে দুজনের ছবি দেখার কথা, অনেক হোটেলের রুদ্ধ গৃহে কিছুক্ষণের অজস্র উচ্ছল হাসি আর নিবিড় বাহুবন্ধনের কথা। আরও কত কি?

সেদিন, যেদিন এত কিছুর পরেও মালতীর শেষ চিঠি এল, সে-মুহূর্তে পঞ্চাননের চোখের সামনে সমস্ত কিছু ঝাপসা হয়ে গেল। পৃথিবী আর সবুজ রইল না, গাছে আর ফুল ফুটল না।

চিঠির জবাব দিলে না পঞ্চানন।

কি জবাবই বা দেবার আছে?

প্রথম মনে হল সে মদ খাবে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে, গলায় দড়ি দেবে। তারপর তার মনে হল মালতীকে অতখানি প্রাধান্য দেওযার কি অর্থ হয়। সে যখন তাকে ভুলে গেছে বাসি খবরের কাগজের মত, তখন সেই বা তাকে স্মৃতিলোকে বরণীয় করে রাখবে কেন? সে দেখিয়ে দেবে মালতী ছাড়াও তার জীবন চলতে পারে? হ্যাঁ, চলতে পারে খুব ভালভাবেই, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে নয়, মন্থর গতিতে নয়।

মালতী, পঞ্চানন আবিষ্কার করল, অতি সাধারণ মেয়ে। অতি—অতি সাধারণ! আশ্চর্য, তাকে নিয়ে এতকাল সে কবিতা লিখেছিল কি করে? টেলিফোন তুলে সে মালতীকে এই নূতন খবরটা না দিয়ে পারল না। এক্সচেঞ্জে লাইন পাবার পরই মালতীর গলা ভেসে এল।

: কে? তুমি! তুমি আমায় ক্ষমা কর···আমি অতি সামান্য মেয়ে।

: আশ্চর্য! আমি সেই কথাটাই তোমাকে বলতে যাচ্ছিলাম।

: কী?—মালতীর গলায় অকৃত্রিম বক্রতা আর ঝাঁঝ।

: আজকে আবিষ্কার করলাম, তুমি কিস্যু'নও··

: ধন্যবাদ···

: আর শোনো; লাইনটা অত তাড়াতাড়ি কেটো না···আমি হয়ত আবার ফোন করতে পারি। তখন ফোনটা হয়ত অন্য কেউ ধরতে পারেন। এর পরে সেই নতুন গলার তোষামোদ শুনে আমার গলাটা ভুলে যেও···

মালতীর স্বরের বক্রতায় আবার লাবণ্যের জোয়ার। বলল সে, 'তুমি রাগ করেছ মহুয়া, কিন্তু সত্যিই আমার এতে মত না দিয়ে উপায় ছিল না।'

: ব্যাপারটা এত দূর গড়িয়েছিল না কি?

: তার মানে?

: তার মানে তুমি আমার কাছে সতী আর অপরের কাছে 'সুইটি' হচ্ছিলে আর কি ?…শুনছ… শুনছ…

মালতী ফোনটা রেখে দিয়েছে। পঞ্চানন দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে খানিক পরিক্রমণ শুরু করল। আরে ছিঃ…এ সে করল কি ? এতে তো মালতী বুঝবে তাকে হারিয়ে পঞ্চানন একেবারে পাগল হয়ে গেছে। অর্থাৎ পঞ্চানন যত জোরে মালতীকে তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে ততই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে মালতী মস্ত কিছু। যে কিছু নয় তাকে উপেক্ষা করে লোকে বক্তৃতা দেয় কি ? কিন্তু মালতী সত্যই কি উপেক্ষার ? পঞ্চাননের চোখ জলে ভরে এল—

সন্ধ্যার স্বপ্নের রঙে বৃন্ত হতে খসে পড়া
সেই ইতিহাস,
বলুক বাতাস।
বলুক সে বাণী
যে বাণীর মধুটুকু খরচের খাতায় তা জানি।
তবু ভাল লাগে
বিষণ্ণ নিঝ্ঝুম এই সায়াহ্নের শুদ্ধ রক্ত রাগে
সেই গান খানি,
সেই হাসি খানি,
ফুল হাতে দুয়ারেতে তব মুখ খানি।
নিরূপমা রাণী।

না মালতী সুখে থাক। সন্ধ্যার অস্পষ্টতা ঘুচিয়ে নেবে এল পূর্ণিমার আলোক-প্রস্রবণ। সামনের মালির চালাঘরের টিনের তরঙ্গের ওপর পিছলে যাচ্ছে জ্যোৎস্নাধারা। লনের পাশের সুপরি গাছের পাতায় কি ঝিকিমিকি ! ঝাঁকড়া ঝাউ গাছের শীর্ণ শাখায় কি মাতন !

না সুখে থাক মালতী…সুখে থাক।

আত্মপীড়নের একটা আনন্দ আছে। জিনিসটা অনেকটা নেশার মত। এ নেশায় ধরলে সহজে ছাড়ান পাওয়া কঠিন। এ নেশা আফিংয়ের চেয়ে শক্ত আর মধুর…মদের চেয়ে ঝাঁঝালো আর বিস্মৃতিকর। সমস্ত মন ভরে ওঠে

দৈন্যে, মনে হয় কিছু নয়, আমি কিছু নয়। আমি হীন, আমি দীন, আমি অপদার্থ। আমি সবাইকে দুঃখ দিয়েছি। ওগো বিধাতা তুমি আমাকে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে ফেল, কেটে খান খান কর, ভেঙে চুরমার কর।

পঞ্চানন সারা রাত ভাল করে ঘুমুতে পারল না। ঘরের ভেতরকার সব আলোগুলো জেলে সে বড় আয়না দুটোর সামনে দাঁড়াল। না বড় আয়নাতে তাকে খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে না, কিন্তু ছোট আয়নাতে তার মুখখানা অতি বীভৎস···অতি ভয়াবহ লাগছে। মাথাটা একটুখানি নীচু করে কপালটা আয়নার কাছে আনবার চেষ্টা করল। বিশ্রী, মাথায় টাক্ দেখা দিয়েছে। থুত্‌নিটা পুরোভাগে এনে চোখ দুটো আয়নাতে নিয়ে গেলে, তলা থেকে মুখটা দেখায় কদর্য। ঠোঁটগুলো কি বিচ্ছিরি মোটা ··জঘন্য। প্রফাইলে দেখল, হাফ-প্রফাইলে দেখল। নাকটা অত্যন্ত ছোট তার চেহারাকে কদাকার করে তুলেছে। এই মদনমোহন রূপে সে পাবে কি করে মালতীকে ?

তার রূপেয়া হয়ত কিছু আছে···কিন্তু রূপ নেই। আর মালতী যাকে গ্রহণ করেছে পতিরূপে, তার গায়ে কন্টিনেন্টের গন্ধ এখনও ভুর ভুর করছে··· তার দামী ক্যাডিলাকখানা চক্‌চক্ করে উঠল মনের সামনে। সে কিছু না—কিস্যু না।

সমস্ত রাত্রি সে নানা কল্পনায় নিজেকে দুঃখ দিল। দুঃখজাত করুণ রসের আনন্দে সে ডুবে রইল। ভাবল সে বিধাতার শ্রেষ্ঠ অপকীর্তি···চরমতম কুৎসিত। আর প্রার্থনা করল মালতীরা সুখে থাক···এবং সে যেন সেই নিঃসঙ্গ মাঝরাত্রির অশ্রুসিক্ত মালিশে মাথা রেখে চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা উঠে সে রাত্রির কথা ভেবে ক্লৈব্য অনুভব করল, ছিঃ সে ভীষণ ভাবপ্রবণ হয়ে উঠেছে···মড্‌লিন। ভীষণ রাগ হল মালতীর ওপর। সে কেবল তাকে পঙ্গু করেনি তার মেরুদণ্ড নষ্ট করেছে। সে মরে গেছে। ভীষণ রাগ হল পঞ্চাননের। হ্যাঁ মরে গিয়েও সে মরেনি—সে ভূত হয়েছে। তার অশরীরী দেহে প্রাণ আছে; সেই প্রাণের প্রভাব সে দেখাবে। অনেক রাত্রে যখন মালতী ক্লান্ত হয়ে থাকবে বিস্রস্ত বেশে নতুন পুরুষোত্তমের বিচ্ছিরি ঘুমের ঘড়ঘড়ানির পাশে, তখন সে অশরীরী দেহে প্রবেশ করবে সেই বদ্ধ ঘরে। আলো নিবু নিবু নীল হয়ে আসবে। মালতীর ক্লান্ত চোখ ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠবে। এ্যাস্‌পেন্ পাতার মত ঠক্ ঠক্ করে সে কাঁপবে! গলা দিয়ে স্বর বার করতে পারবে না···ঘুমের ঘড়ঘড়ানির পাশে ভয়ের ঘড়ঘড়ানি শুরু হবে।

আর তখন সে হাসবে মেহের আলির হাসি। 'দশন ছটাছট হাস'। হঠাৎ পঞ্চাননের খেয়াল হল সে এতক্ষণ হো হো করে হাসছিল। ভীষণ ভয় হল তার···মাথায় গণ্ডগোল হচ্ছে না তো? মালতী কি তার জীবনের মূলে বাসা নিয়েছে, তাই এই ভুল। দিন কতক মালতীকে অসাধারণ ভাবে ভোলবার চেষ্টা করল। দিন কতক যৌগিক প্রক্রিয়ার শ্বাসরোধ ও ত্যাগের নানা কায়দা অভ্যাস করে পৃথিবীটাকে ভোলবার চেষ্টা করল। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বৈরাগ্যপ্রকরণটা আয়ত্ব করার চেষ্টা করল। সত্যিই তো মনের জন্তই জগৎ রয়েছে, মন না থাকলে জগৎ থাকে না। অতএব চিত্তবৃত্তিনিরোধ।

দিন কতক দরজা জানলা বন্ধ করে মনটাকে সেই স্বয়ম্ভূ কবি মনীষী শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের ধ্যানে নিযুক্ত করল। গভীর ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করল যে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত তিনি আছেন। তিনি আছেন ঘরের অন্ধকারে কৃষ্ণতায় কৃষ্ণরূপে। তিনি আছেন কার্পেটের আসনে, তিনি আছেন ঘরের রুদ্ধ হাওয়ায়। প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁকে সে স্পষ্ট অনুভব করতে লাগল।

ব্রহ্ম হলেন করতল আমলকবৎ···তার কাছে এত স্পষ্ট···এত স্থূল···যে সে ব্রহ্মকে জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে দিতে পারে সামনের লনে। আর ব্রহ্ম পাক খেতে খেতে গড়িয়ে যাবে। আর সেই দৃশ্য দেখে হেসে গড়িয়ে পড়বে মালতী।

মালতী?

মালতীর চিন্তা কেন আসে তার মাথায়? নাঃ, এই ঘরে বসে বসে সে কেবল মালতীর চিন্তাই করছে। ব্রহ্মের আসনে কখন মালতী এসে বসেছে তার খেয়াল নেই। এমনি ভাবে দোর জানলা বন্ধ করে মালতী-কাম ব্রহ্মের চিন্তায় সে পাগল হয়ে যাবে, ভীষণ পাগল। অতএব মনের চিকিৎসার প্রয়োজন। দরকার মনকে ছড়িয়ে দেওয়া আনন্দে। শ্রেষ্ঠ আনন্দের জন্ত নারীদেহের প্রয়োজন। দিন কতক ঘুরল বাইরে বাইরে, ভাড়াটে মেয়েবন্ধুর মহলে···কাটাল স্বাধিকারমত্ততায়। তার কিছুদিন বাদে ঘরে ঢুকল সে···ঢুকে দেখল বাইরের আনন্দঘূর্ণিতে মনের বেদনাটা শুকনো পাতার মত উড়ে যায়নি। মন ক্লীন স্লেট ত হয়ইনি বরঞ্চ ঢুকল ভয়···রোগের ভয়। সুখের সন্ধানে গিয়ে অসুখে পড়বে না তো? ইট্, ড্রিঙ্ক এণ্ড বীমারী। চোখটা লাল হয়েছে···শরীরটাও কেমন কেমন লাগছে।

ঃ হাঙ্ক

ঃ আজ্ঞে

: নাড়ীটা দেখত

: নাড়ীটা ঠিক আছে বাবু…বেচাল হয়নি তো…

: বেচাল হয়নি ! কি জানিস্ তুই নাড়ীর ! এ পাড়াতে ডাক্তার আছে… ডাক ত ? ডাক্তার এলেন…বুক দেখলেন নাড়ী দেখলেন…রক্ত পরীক্ষা করালেন তারপর কিছুই হয়নি, মন্তব্য করলেন। পঞ্চানন বিশ্বাস করল না ডাক্তারকে…ডাক্তার না গোরু !

দীর্ঘ কয়েক বছর বাদে মালতী এল দেখা করতে। দুজনে দেখা হোলো আর একবার ! প্ল্যাট্‌ফর্মে নয় ··ট্রেনের কামরায় নয় · একেবারে বাড়িতে। মালতী দেখা করতে এসেছিল। বলতে এসেছিল,'ছিলে প্রিয়,বন্ধু হও। বন্ধু হও আমার স্বামীর। মনে কোন সঙ্কোচ রেখ না। তুমি হও আমার সত্যিকার বন্ধু।'

এসে দেখল মালতী লনের পাশের অনেক দিনকার রজনীগন্ধা গাছে আবার চারা গজিয়েছে। আবার ফুল ফুটেছে। হারুর যত্নের অভাব হয়নি। আকাশ ভরে পূর্ণিমার চাঁদ তার অপরিমিত জোৎস্নাধারা উজ্বল করে দিয়েছে। বলতে এসেছিল 'বন্ধু হও' কথাটা বলতে বাধল…এই রাত্রির একটা মাদকতা আছে।

লঘু পদে সে পঞ্চাননের লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকল। পঞ্চানন চুপ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে। মালতীকে দেখে সে একটুও আবেগ দেখাল না, দেখাল না কোনও আকুলতা। বিস্ময় প্রকাশ না করে সে বলল : দেখত আমার চোখটা লাল হয়েছে কি না ?

: কই না তো ?

: হয়েছে। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না।

চোখ বন্ধ করে সে সোজা হয়ে বসে রইল। চোখের রক্ত নামাবার সবচেয়ে জোরালো প্রক্রিয়া।

মালতী অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল তার দিকে। বাইরে আকাশ ফেটে জ্যোৎস্না এসেছে। হয়ত স্বামী তার জন্য প্রতীক্ষা করছে এই চাঁদনী রাতে বেড়াতে যাবার জন্য… ত.র কিন্তু কিছুই ভাল লাগল না।

পঞ্চাননের মানসলোকে মরে গেছে মালতী আর পঞ্চানন মরে গেছে বাইরের জগতের কাছে। চকিত বিদ্যুতের আলোয় যেন সমস্ত অতীতটা এক মুহূর্তে ঝলসে উঠল তার মনে। পঞ্চাননের চোখ থেকে রক্ত নামছে। নামছে কি ? বোঝা গেল না। ..কিন্তু মালতীর চোখ দিয়ে [illegible] উঠল।

দে গরুর গা ধুইয়ে

ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং· ·

ফোন বাজিয়া চলিয়াছে।

সল্ট লেক সিটির এই অঞ্চলে কর্পোরেশন জল সরবরাহ বিভাগের একটি ছোট অফিস এই সেদিন খোলা হইয়াছে। সহরের সম্প্রসারণের ফলে এদিকে সুন্দর বাড়ী, পার্ক, স্কুল হসপিট্যাল, জয়হিন্দ ডেয়ারী ফার্মের বিরাট কারখানা প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতেছে।

ওয়াটার ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের কাজ ভোর বেলা হইতে সুরু হইয়াছে। এখন সকাল ছ'টা। লম্বোদর চক্রবর্তী টেলিফোনের ধারে বসিয়া প্লাম্বার নবীন মিত্রের সহিত কথা বলিতেছিল। টেবিলের উপর চায়ের কাপটি এখনই শেষ হইয়াছে। চোখে এখন ঘুমের আমেজ। হাতে কাজ বিশেষ নাই। টেবিলের উপরে রাখা পিন-কুশনটি মাঝে মাঝে টিপিতেছিল।

নবীন মিত্র হাসিয়া বলিল: পিন-কুশনটার বারোটা বাজল যে।

লম্বোদর খোঁৎ খোঁৎ করিয়া বলিল: পীন-পয়োধর বল—

ফোনটা তখনও বাজিতেছিল। অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে ফোনটা তুলিয়া লইয়া বলল: রং নাম্বার···

ফোনটা নামাইয়া দুইজনে আবার গল্পে মাতিল। লম্বোদর টাইপিষ্ট মালতী ঘোষালের শূন্য চেয়ারটির দিকে তাকাইয়া বলিল: এখনও ঘুম ভাঙেনি দেখছি।

নবীন মিত্র কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ফোনটা আবার বাজিয়া উঠিল।

: জ্বালাল দেখছি। রাগত ভাবে লম্বোদর ফোনটা তুলিয়া বলিল, হ্যাঁ, ওয়াটার ওয়ার্কস, কি বললেন? একদম জল যাচ্ছে না? কত নম্বর ওয়ার্ড? সাতচাল্লিশ? আচ্ছা দেখছি···

টেলিফোন নামাইয়া লম্বোদর বলিল: সাত চল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডে জল যাচ্ছে না! এই সাত সকালে তা নিয়ে ঝামেলা, নবীন দেখত ব্যাপারটা!

গান গাহিতে গাহিতে নবীন মিত্র বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ বাদে মালতী ঘোষাল আসিলেন। লম্বোদর হঠাৎ খুব আঁটসাট হইয়া বসিল।

চমৎকার চেহারা মালতী ঘোষালের। সদ্য স্নান করিয়া আসিয়াছেন, ভারী ভাল লাগিতেছে। লম্বোদর উঠিয়া মালতী ঘোষালকে আপ্যায়িত করিতে যাইবে এমন সময় ফোনটা আবার বাজিয়া উঠিল। মালতী উসখুস করিয়া বলিলেন: এত সকালে আমাকে কেউ ফোন করবে না ত?

লম্বোদর গদগদ ভাবে ফোনটা তুলিয়া লইল। বলিল, দেখি। ফোনের অপর প্রান্ত হইতে কঠোর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল: কি হোলো জল আসছে না যে।

: একদম আসছে না?

: না আসার মতই ·

: গরম কালে জলের প্রেসার ·

: থামুন। জলের প্রসারের কথা আর শোনাবেন না। এদিকে জল না পেয়ে আমাদের সর্বনাশ হবে যাচ্ছে আর আপনি শোনাতে এলেন গরম কালে জলের প্রেসারের কথা। শীগগির ব্যবস্থা করুন—

লম্বোদর মুচকি হাসিয়া ফোনটা রাখিয়া দিল।

মালতী প্রশ্ন করিলেন: কি হোলো, হাসি কিসের?

: মেজাজে আগুন লেগেছে। জলের দরকার—মাতাল বোধ হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যে ফোনটা আবার বাজিয়া উঠিল। এবার লম্বোদর উঠিল না। কিছু বাদে মালতী উঠিয়া ফোন ধরিলেন। লম্বোদর খবরের কাগজ দেখিতে লাগিল। কিছু বাদে মালতীর ফোন ছাড়িয়া দেওয়ার শব্দে লম্বোদর নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

মালতী বলিলেন: কাউন্সিলার ফোন করেছিলেন ৪৭নং ওয়ার্ডে জল যাচ্ছে না বলে—আপনি একটু দেখুন না, লম্বোদরবাবু।

: গেল যা!

লম্বোদর বিরক্তভাবে বাইরে ইঞ্জিনিয়ারের ঘরের দিকে আগাইয়া গেল। মালতী ব্যাগ হইতে ছোট আয়না বাহির করিয়া মুখখানা একবার দেখিয়া লইলেন। খুট্ করিয়া ব্যাগ বন্ধ করিয়া টেবিলের উপর জমা কাগজ দেখিতে লাগিলেন।

নবীন মিত্র ভিতরে প্রবেশ করিল। লম্বোদরকে কোথাও দেখিতে না পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মালতীর চেয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

: এত সকালেই কাজ নিয়ে বসলেন! কাজ ত রয়েইছে; আসুন না আর এক কাপ চা খাওয়া যাক।

: বেশ ত লম্বোদরবাবু আসুন—

লম্বোদর! লম্বোদরের আবার লিভারের অসুখ। পটে একটু চা আছে! দু'জনের হবে বোধ হয়!

ফোনটা আবার বাজিয়ে উঠিল। মালতী ভুরু কুঁচকাইয়া ফোনের শব্দ শুনিতে লাগিলেন। নবীন ফোন ধরিয়া 'রং নাম্বার' বলিতে যাইতেছিল অপর প্রান্ত হইতে গম্ভীর গলা শুনিয়া সে কথা বলা হইল না।

: ৮৭নং ওয়ার্ডে জল যাচ্ছে না, খবর পেয়েছেন?

: সকাল থেকে অনেকবার খবর পেয়েছি।

: কিন্তু কাজ কিছু হয়েছে কি?

: আপনি কে জানতে পারলে—

: থামুন আপনি। ইঞ্জিনিয়ারকে এখুনি খবর দিন, বলুন মেয়র ফোন করছেন।

: বলছি স্যার।

টেলিফোন নামাইয়া নবীন বিরক্তভাবে বলিল: না, চা খাওয়া আর হোলো না দেখছি। মেয়র ফোন করছেন জ্বালাতন।

দ্রুতপদে নবীন বাহিরে চলিয়া গেল।

মালতী ঔৎসুক্যের সঙ্গে ফোনের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। মেয়র কি আর একবার ফোন করিবেন?

লম্বোদর ফিরিয়া আসিল। টেবিলের উপর চা দেখিয়া বলিল: বাঃ, আমার জন্য চা যে ঢেলে রেখেছেন দেখছি। তা অপেক্ষা করার কি দরকার ছিল।

চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়া লম্বোদর বলিল: চমৎকার হয়েছে—আর হবে নাই বা কেন? কার হাতের চা দেখতে হবে ত?

মালতী মুচকি হাসিয়া বলিলেন: হ্যাঁ, নবীনবাবু করেছেন—

: নবীন? নবীন দু'কাপ চা একসঙ্গে খাচ্ছিল?

: না। এক কাপ আমার জন্যে, আর এক কাপ নিজের জন্য করেছিলেন।

বোমা ফাটার মত ফাটিয়ে লম্বোদর কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়

ফোনটা আবার বাজিয়া উঠিল। লম্বোদর গম্ভীর গলায় বলিল : বাজুক ফোন, আমি ধরব না।

মালতী দ্রুতপদে ফোনের নিকট আগাইয়া আসিলেন। মেয়র কি আবার ফোন, করিতেছেন? লম্বোদরের দিকে ফিরিয়া বলিলেন : না না, আপনি চা খান, আমি ধরছি—

: আমি চাও খাব না—

লম্বোদরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া, কণ্ঠস্বরে যথাসাধ্য ন্যাকামির ভাব আনিয়া মালতী ফোনের চোঙে মুখ দিলেন : হ্যালো, হাঁ, আমি মিস্ মালতী ঘোষাল—হ্যাঁ স্যার—আমরা চেষ্টা করছি—হ্যাঁ স্যার—কিন্তু সমস্ত ৪৭ নং ওয়ার্ডে এখনই জল পাঠান কি ক'রে সম্ভব হবে স্যার—ঠিক কোন জায়গায় বিশেষ দরকার জানলে, এখনই লোক পাঠাচ্ছি স্যার—

ফোন রাখিয়া মালতী হতভম্ভ হইয়া রহিয়া গেলেন।'

লম্বোদর বিরস মুখে বলিল : কি হোলো?

: স্বয়ং মিনিষ্টার ফোন করছিলেন। বললেন, ব্যাপারটা খুব গোপনীয় এবং জটিল—কোন জায়গায় বিশেষ ক'রে দরকার তা বলা যাবে না। সমস্ত ওয়ার্ডে এখনই জলের প্রেসার বাড়াতে হবে নইলে গভর্ণমেণ্টের ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে—

'গভর্ণমেণ্টের ক্ষতি—সে কি?' লম্বোদর দাঁড়াইয়া পড়িল।

সেই মুহূর্তে ইঞ্জিনিয়ার প্রবেশ করিলেন : কি ব্যাপার লম্বোদরবাবু, জোর তলব কেন?

: স্বয়ং মেয়র এবং মিনিষ্টার ফোন করছিলেন।

: কেন?

: ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডে ওয়াটার-প্রেসার ঠিক হচ্ছে না—

: তাতে বিচলিত হবার কি আছে। এত সারা সহরের কমপ্লেন—

: কি জানি—

ঘড়িতে সাতটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা আর একবার বাজিয়া উঠিল। অপর প্রান্ত হইতে আকুল আর্তনাদ শোনা গেল : জল পাঠান মশাই—প্রতি মিনিটে প্রায় একশ টাকা লোকসান হয়ে যাচ্ছে—

: সে কি? কার লোকসান হচ্ছে?

: লোকসান গভর্ণমেণ্টের হচ্ছে, আমাদের হচ্ছে, দেশের হচ্ছে, দশের

হচ্ছে। শীগ্‌গির জল ছাড়ুন নইলে মারা যেতে বসেছি—

: কি ব্যাপার বলুন তো?

: দশ হাজার লোক হল্লা করছে আমরা সাপ্লাই দিতে পারছি না।

: কিসের সাপ্লাই? আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন—

: সেমি-গভর্ণমেণ্ট এণ্টারপ্রাইজ শেষ হয়ে গেল—বাজারে গুডউইল নষ্ট হয়ে গেল—লোকে বুঝবে আপনাদের জল না হ'লে আমাদের জয়হিন্দ ডেয়ারী ফার্ম অচল হয়ে যাবে।

: আরে হোল কি?

: হবে আবার কি? যা না-হবার তাই হোলো। আপনারা প্রতিদিন সাহায্য করেন বলেই ত সবাইকে দুধ সাপ্লাই করতে পারি। আজ সকাল থেকে কেবল খাঁটি দুধ বাইরে চলে যাচ্ছে—আর দশ মিনিটে সব দুধ শেষ হয়ে যাবে। তখন লোককে দেব কি? একটু দয়া কি হবে না আপনাদের—

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আপ্রাণ চেষ্টায় বেলা সাড়ে আটটায় সময় ডেয়ারী ফার্মে তোড়ে জল আসিবার ব্যবস্থা হইল। বাহিরে তখন দুধের অভাবে ক্রেতারা চিৎকার করিতেছে। ম্যানেজার দুধের বিরাট শূন্য পাত্রগুলির দিকে চাহিয়া গুম হইয়া বসিয়া আছেন। এখনও দু'হাজার ক্রেতা দুধ পান নাই। বাজারে দুধের ঘাটতির কারণ কি তাহা লইয়া আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় কোম্পানী টিকিলে হয়। এমন সময় একজন আসিয়া বলিল: খুব তোড়ে জল এসেছে—কিন্তু এক ফোঁটা দুধও নেই। কি ক'রব?

ভগ্ন কণ্ঠে ম্যানেজার বলিলেন: দে গরুর গা ধুইয়ে!

মহানগরার মহানিবাস

একান্নবর্ত্তী পরিবার নহে একাশ্রয়বর্ত্তী পরিবারব্যূহ। গোদাবরী তীরের বিশাল শাল্মলীতরুতে আশ্রয় নিয়েছে নানা দিক্ দেশের পাখি-মানুষ। শতসহস্র কণ্ঠকাকলি। দুটো কল আছে বাড়ীতে, অথচ জল পাবার এক বিন্দু সুযোগ নেই। আবার অনবরত জল পড়ে পড়ে কলের পাশের ঘরগুলোতে নোনা লেগেছে। গরম কালে ঘরগুলো ভারী ঠাণ্ডা থাকে। মানুষগুলো কিন্তু সব সময়েই উত্তপ্ত। অজস্র কণ্ঠস্বর, অনন্ত উনুনের ধোঁয়া আর দুটি কলের অনিবার ছড়্ ছড়্ শব্দ।

একদিন সকাল বেলা।

অন্যদিনের মতই সকাল হয়েছে। ছড়্ ছড়্ শব্দের সঙ্গে ভেসে আসছে গোবিন্দবাবুর কথাগুলি: আরে ধর ধর, গোপালটা পড়ে এক্ষুনি খুন হয়ে যাচ্ছিল কাপড় কই কাপড় হে হে হে হে অর্দ্ধেক চান করছে আর অর্দ্ধেক কাপড় নিয়ে আসছে, একেই ত বলে অর্দ্ধাঙ্গিনী।

গোবিন্দবাবুর স্ত্রী পুলকিত হাস্যে মাথায় আধ ঘোমটা টেনে দিয়ে কলতলা এবং প্রাঙ্গন পেরিয়ে রোয়াকটুকু অতিক্রম করে নিজের ঘরে আসন পাততে গেলেন চটের আসন, এনামেলের থালা আর টিনের গেলাস। গোবিন্দবাবু খেয়ে এক্ষুনি আপিসে বেরিয়ে যাবেন। আজ শনিবার ফিরতে রাত হয়ে যাবে—এসেই মেজাজ খারাপ ক'রে শুয়ে পড়বেন। যাবার সময় দ্বিগুণ হাসিমুখে আদর ক'রে যাবেন। তারই সূচনা হোলো সকালের রসিকতা। হেমাঙ্গিনী জলের ছিটে দিয়ে আসন আর থালা পাতলেন, তারপর ছোট্ট একটি খুন্তি কোরে কতকগুলো ফুটন্ত চাল এ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি থেকে নামিয়ে মাটিতে রেখে তাদের শক্তি পরীক্ষা কোরতে লাগলেন। এখনও ভাত হয় নি। হাঁড়ির ভিতর খুন্তে কোরে ভাতগুলো আবার ফেলে দিলেন। খুন্তি আর হাঁড়ির মিলন শব্দ উঠল ঠক্ ঠক্। তারপর খানিক পরে ছোট হাঁড়ির উচ্চতাকে অতিক্রম কোরে গরম ফ্যান আগুনের ভিতর লাফিয়ে পড়ল। ঘর ভর্তি একটা বিশ্রী গন্ধ আর টগ্‌বগ্ শব্দ।

উনানে বাতাস ক'রতে ক'রতে পায়ের শব্দ পেয়ে হেমাঙ্গিনী পিছনে না ফিরেই বল্লেন: ভাত হ'তে একটু দেরী আছে। ততক্ষণ কাপড় জামা পরগে

যাও। আঃ কি করছ হি হি হি হি · দেখ দেখি, এরকম ক'রলে বাজার ক'রব কি করে? হি হি-

: দাদা আছেন না কি?

এক মুহূর্তে সরে গিয়ে গোবিন্দবাবু কাপড পরতে পরতে উত্তর দিলেন: এস, এস, তোমার কথাই ভাবছিলাম এতক্ষণ।

সামনের অংশে একটা ঘর নিয়ে সুমন্ত্র থাকে। বছর আঠার তার বয়স। গোবিন্দবাবু সুমন্ত্রেতে অনেকটা হরিহর আত্মা। সুমন্ত্রও রেস খেলে তবে মাঠে গিয়ে নয় প্রাইভেটে। সুমন্ত্রের পিঠ থাবড়ে গোবিন্দবাবু বল্লেন: আজ সিওর টিপ্…ক্লাবের বাবুর্চির কাছ থেকে পেয়েছি।

: গতবারের মত ত?

: আরে ছ্যাঃ "সিভিক-গার্ড" কি একটা ঘোড়া নাকি? ছেলেমানুষ, ঘাস খেতে শেখেনি এখনও। ষ্টার্ট হবার আগে বেটা যেন চরকীর পাক ঘুরছে পন্ পন্ পন্ পন্। দে গুঁতো দে গুঁতো ক'রে মুখ যখন ফিরল তখন ষ্টার্ট হয়ে গেছে। আর কি তখন পারে?

: আর লাফসুইলি?

: হুঁ, লাফসুইলি! ঘোড়া বটে লাফসুইলি—যেন কুচো চিংড়ি মাছ তিড়িং তিড়িং করছে। বেড়াগুলো ঝ্যানদেনিয়ে পেরিয়ে যায়, তা যে ক্লামেন্ট হোক যে হ্যাণ্ডিকাপেই হোক—

: আমি আজ ঠিক করেছি প্রিন্স ফেলিক্স আর লাফসুইলি দিয়ে ডবল কোরব। হবে না?

: বিলকুল। প্রিন্স ফেলিক্স হোলো বেতো রুগী, তার ওপর হাঁপানি হচ্ছে ধুঁকতে ধুঁকতে লাষ্ট হয়। সে তোমার বাজী জিতবে—হুঁঃ, ওসব বুদ্ধি ছাড় আমার টিপ্ নাও—

গোবিন্দবাবু প্রাইভেট 'বুকি'র খবর রাখেন, মাঝে মাঝে ভাল খবরও আনেন, সেই সূত্রে সুমন্ত্রর সঙ্গে গভীর হৃদ্যতা। সুমন্ত্র তাঁর হাত দিয়ে নেপথ্যের 'বুকি'র কাছে দশ আনা পাঁচসিকে ফি শনিবার পাঠিয়ে দেয়। কোনও শনিবার বিশেষ কিছু পায়না তবু আশা ছাড়েনি। গোবিন্দবাবুর নেপথ্যের 'বুকি'ও গোবিন্দবাবু স্বয়ং। সুমন্ত্রের পয়সাগুলি সংগ্রহ কোরে হাত মুখ ধুয়ে অপিস যাবার আগে হেমাঙ্গিনীকে একটু আদর ক'রে বল্লেন: দশটা টাকা দেবে?

: কেন ?

: আমাদের আপিসের বড়বাবু চেয়েছেন, বলছেন পরশুই ফেরৎ দেবেন ডবল কোরে। বড়বাবুর কথার ওপর 'না' বলতে পারি না; বলতে হোলো, আচ্ছা স্যার, কালকে বউয়ের কাছ থেকে নিয়ে আসব। হেমাঙ্গিনী কিছুই বল্লেন না, দশটি টাকা এনে দিলেন। গোবিন্দবাবু মনে মনে লজ্জিত হ'লেন নিজের মিথ্যা কথাটিতে। গরীবের সংসার, দশটি টাকা দিয়ে দিল, পরশু যদি ফেরৎ দিতে না পারেন। নাঃ মন খারাপ করার কোনও মানে হয় না। সিওর টিপ্ এবার নিশ্চয়ই পাবেন।

সামনের অংশে আর একঘর ভাড়াটে থাকেন। কর্তা মন্মথবাবু "কার্ডিয়াক রিউম্যাটিজ্‌মে" ভুগছেন—বাঁদিক ফিরতে প্রাণান্ত। এখন সামান্য ভাল আছেন। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। একটি বড় মেয়ে—বছর ষোল সতেরর, আর তাঁর স্ত্রী 'শ্রীমতী'কে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার।

মেয়ে অনুভা সামনের মহলের মালতীর সঙ্গে কথা কইছিল। মন্মথবাবু কোনওক্রমে বাজার ক'রে ফিরে এলেন, কাছেই বাজার তবু একপা যেতে তাঁকে সাতবার বসতে হয়। হাঁপাতে হাঁপাতে বুকটা ধরে বাজারের থলিটা আস্তে আস্তে মাটিতে রেখে বল্লেন : পাখা করত একটু—

অনুভা সরে এসে বাতাস করতে লাগল। মনে মনে একটু বিরক্তির ভাবও যে না ছিল তা নয়। মালতীর সঙ্গে এতক্ষণ যে ধরণের কথাবার্তা হচ্ছিল তার মাঝখান থেকে উঠে এসে বাবাকে বাতাস ক'রতে কোনও মেয়ের ভাল লাগার কথা নয়। মন্মথবাবু একটু ঠাণ্ডা হোতেই মালতীর কাছে সরে এল মালতী গলা খাটো ক'রে বল্লে : প্রশান্তের ফেরার সময় হোলো ·

: তাতে আমার কি ?

: প্রশান্ত কি আর এমনি এমনি গল্প করতে আসে, না তুমিই কি আর শুধু শুধু স্বর্ণ মাসীমার (প্রশান্তর মা) কাছে যাও ! মাথা নাড়লে আমি শুনব না কি। আমি কি আর কিছু বুঝি না—

: না ভাই সত্যিই কিছু হয়নি, তবে একদিন—

: তবে একদিন ও তোমায়—কথাটা আস্তে আস্তে শেষ করল মালতী।

: ধেৎ তুমি বড় ফাজিল হয়েছ। কে শুনতে পেয়ে যাবে—

: আচ্ছা বলব না গো বলব না, কিন্তু সত্যি ক'রে আমায় বলত খুকুমণি, খোকামণি তোমায় কখানা চিঠি দিয়েছে বা—

: চুপ! কে আসছে।

গুন্ গুন্ করতে করতে সুমন্ত্র হাজির হল। বারান্দা পার হবার আগে আড চোখে অনুভাদের দিকে চট ক'রে তাকিয়ে মন্মথবাবুর পাশে গিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল: এমন ক'রে বসে কেন? শরীরটা ভাল লাগছেনা মামাবাবু!

: আর বল কেন? প্রাণ রাখতে প্রাণান্ত, বাজার করতে গিয়েছিলাম। বাজারটাও ক'রে দেবার কেউ নেই, অথচ শরীর আর বয় না।

: আমায় দেবেন মামাবাবু, আমি নিয়ে আসব। এটুকু উপকার যদি আর ক'রতে না পারব তাহ'লে আর মানুষ হয়েছি কেন —কথা শেষ না করে সে একবার অনুভাদের দেখে নিল।

হা:— একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ছাডলেন মন্মথবাবু।

: কি হোলো?

: কিছু নয় —এরককম হয় মাঝে মাঝে।

: বুকে একটু হাত বুলিয়ে দেব।

তার আন্তরিকতার উদ্দেশ্যটা অনুভার অজানা নেই। কথাগুলো যে তাকেই শোনানো হচ্ছিল তা সে বিলক্ষণ জানে। মন্মথবাবু ক্লান্তিবোধ করছিলেন কোনও উত্তর দিলেন না। সুমন্ত্র অনুভার দিকে বিশেষ একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে চলে গেল। হেসে মালতী বল্লে: আছ বেশ' বাঁযাও চাই, তবলাও চাই, তা নইলে জমবে কেন?

হাসল অনুভা। সুমন্ত্রটা কি ফাজিল। প্রশান্ত কিন্তু ভারী লাজুক কিছুতেই এগুতে চায় না। প্রশান্তের মনটা কিন্তু আরও ভাল।

ফাল্গুন মাসের দুপুর। রৌদ্র ছায়ায় সমস্ত আঙ্গিনাটা ভরে উঠেছে। চারিদিকের নিঝুম নীরবতার সঙ্গে আসছে বারান্দায় খেলাগাড়ী টানার ঝড্ ঝড্ শব্দ, মাঝে মাঝে গোপালের কান্না আর হেমাঙ্গিনীর ধমকানি। মালতীদের ওখানে তাদের হারজিতের চেঁচামেচি উঠছে। নীচের বাড়ীর শ্রীমতী দেবী বাসন মাজতে বসেছেন। ধূ ধূ করেছে সারাটা দুপুর। কাদের বাড়ীর কল খুলে দেওয়া আছে, তার মধ্যে বাতাস ঢুকে শব্দ হচ্ছে শ্, শ্, শ্, শ্ ।

মন্থর দ্বিপ্রহর।

প্রশান্ত কলেজে গেছে। স্বর্ণময়ী ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেন প্রশান্ত বড হয়েছে, বড লোক হয়েছে, এতদিনের দুঃখ দারিদ্র ঘুচছে। আপিস থেকে

ফিরে মায়ের পায়ের কাছে টাকা রাখে চকচকে রূপোর টাকা। সেগুলো বাজে ঝন্ ঝন্ ঝন্। সুখোজ্জ্বল দুটি প্রাণী, হাসেন তিনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে, এইবার একটি বৌ করতে হবে। ছোটখাট, মোটা-সোটা ধবধবে, গোলগাল একটি বউ। সংসারের কাজ করবে, তাঁর কাছে বসে ঘর কন্না শিখবে। তার ছেলে হবে—নাতি। তাঁকে নাতি ডাকবে : দিদ্দি, ও দাদ্দি।

তিনি বললেন : আমার সোণারে, আমার মটুরে, আমার বাবলুরে।

রামধনু রংয়েতে রাঙা স্বপ্ন। যাবার সময় ঝি ডেকে দিয়ে গেল। উঠলেন বামনী আলস্যের অবসাদটুকু কাটিয়ে। কলে জল এসেছে শব্দ হচ্ছে চৌবাচ্চা ভরার। ঝি উনুনে আগুন দিয়ে গেছে। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো লাইন টেনে রেখেছে। ছাদে খানিকটা আলো আর বেশীর ভাগ ছায়া। হাই তুলে উঠলেন তিনি—বেলা অনেক হয়ে গেছে, এইবার প্রশান্ত এসে পড়বে। মাদুরটা গুটিয়ে একটু মাটিতে ঠুকে দেওয়ালের কোণে রেখে দিলেন।

খানিক বাদে কলেজ থেকে ফিরল প্রশান্ত। নিচের বারান্দায় একা বসে আছে অনুভা। মন্মথবাবু বেরিয়েছেন শীতৌ দেশী কাজে। প্রশান্ত স্মিত দৃষ্টিতে তাকাল অনুভার দিকে—বেশ, বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। উপরে রোদ নীচের অংশে শুধুই ছায়া সেই ছায়া হতে কেমন একটা স্নিগ্ধতা এসে তাকে আরও লোভনীয় করে তুলেছে। চোখাচোখি হতেই সে মুখ নীচু করে ওপরে পালিয়ে যাচ্ছিল অনুভা বল্লে : দাঁড়ান।

এক মুহূর্তে আর সবে মুখ নীচু করে জামার ভিতর হতে অনুভা বার করল একটি ফুল। তারপর তাড়াতাড়ি প্রশান্তের হাতে দিয়ে বল্লে: রেখে দেবেন কাউকে দেবেন না।

অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ঘটনা। এক মুহূর্ত কাটল প্রশান্তের অদ্ভুত ভাবহীন অবস্থাতে। তারপর ফুলটা পকেটে রেখে কোনও দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এল। অনুভাকে আদর করতে তার ভারী ইচ্ছা করছিল কিন্তু অপরিসীম লজ্জায় সে কিছুতেই করতে পারল না।

অনুভা হাসল।

একদিনকার বিকেল।

অন্যদিনের মতই বিকেল হয়েছে। সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। মন্মথবাবু

একটা বালতিতে দুধ নিয়ে ফিরলেন। গোবিন্দবাবুর ছেলে চেঁচামেচি সুরু করেছে। স্বর্ণময়ী পুজোয় বসেছেন। প্রশান্ত পড়ছে। নিচে অনুভা রান্না করতে করতে গুণগুণিয়ে গান গাইছে। সামনের মহল নিস্তব্ধ—পিছনের মহ'লর টুকরো শব্দগুলো উচ্চারণের তারতম্যে প্রাধান্য লাভ করছে।

: এই গোপাল, মারব বলছি -আবার। আচ্ছা দাঁড়াও উনি আসুন তারপর টেরটা পাবে।

: বুকটা কেমন করছে অনুভা, একটু বাতাস কর ও—হাঃ

হঠাৎ একটা চীৎকার।

তারপর মন্মথবাবুর কণ্ঠস্বর আর শুনা গেল না। আশপাশের সমস্ত ঘরগুলো থেকে লোক ছুটে এল—সবাই নির্ব্বাক কেবল মন্মথবাবুর মেয়ে আর স্ত্রী ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে সুরু করলেন। প্রশান্ত পড়া বন্ধ ক'রে নিচে নেমে এল। সদ্য আনা দুধের বালতির ওপর মুখ রেখে মন্মথবাবু পড়ে আছেন। সবাই এগিয়ে এল—সবাই কি রকম এক রকম হয়ে গেছে। সুমন্ত্রর চোখে সে দৃষ্টি নেই, প্রশান্তের সে ভাবুক ভাব নেই, গোবিন্দবাবুর স্নেহ-প্রাণতা নেই।

মন্মথবাবু মারা যান নি। উঠিয়ে দেবার পর সকলের দিকে তাকিয়ে অনেক পরে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন 'হা '—

জীবনের জাগরণের অংশটুকু অসংসম্পূর্ণ নব স্বপ্নের অংশ বাদ দিলে। তাই অনেক রাত্রে বিধাতা স্বপ্ন পাঠিয়ে দেন ঘুমন্ত চোখের পাতায় পাতায়। স্বপ্ন না কি বিফল বাসনায় সফল রূপ। অনুভার চোখের সামনে ভেসে এল সুমন্ত্র আর প্রশান্তের মুখ। প্রশান্তের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে আর তার দেওর হয়েছে সুমন্ত্র। প্রশান্ত স্বপ্ন দেখল পরীক্ষার—পকেটে ফুল গুঁজে সে পরীক্ষা দিতে চলেছে। গোবিন্দবাবুর ট্রিপলের কাটলেগ, সুরু হোলো কি হল কে জানে ?

যার জীবন নেই তার স্বপ্নও নেই। মন্মথবাবু বারান্দায় ঠায় বসে রইলেন। বাঁদিকে ফিরতে কিছুতেই পারেন না। রাত্রি গভীর হলো—টং টং ক'রে দুটো বাজল। ভাল ক'রে তাকালেন ঘরের দিকে। অনেক কালের অনেক স্মৃতি নিয়ে ভরা রং চটা তোরঙ্গগুলি ঘর ভরিয়ে রেখেছে। তাদের ওপর

মায়া জমে গেছে। ঘরের তাকে গাদা গাদা বই। ফোঁটা ফোঁটা রক্তের কালিতে তাদের অক্ষর—কত প্রিয়, পরিচিত বন্ধু।

কত সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার খোরাক জুগিয়েছে, কত আনন্দ দিয়েছে, কত জ্ঞান দিয়েছে, প্রাণের মধ্যে এদের বাসা। তবু, তবু এদের ছেড়ে যেতে হবে।

শ্রীমতী দেবী ঘুমুচ্ছেন। কেমন একটা ক্লান্তি এসে আচ্ছন্ন ক'রেছে তাঁকে। তাঁকে সুখ দেন নি জীবনে, না অর্থের, না সংসারের। তবু তাঁর গঞ্জনা, তাঁর বীতরক্তি সব কিছু কুড়িয়েও তিনি একে একে তাঁর গহনা খুলে দিয়েছেন হাসিমুখে। মন্মথবাবুর চোখ জলে ভরে এল—আর কটা দিন তাঁর হাতে আছে কে জানে?

নিঃসীম আকাশ ভরা অনন্ত নক্ষত্র দপ্‌ দপ্‌ ক'রে জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল। আকাশের গায় নূতন আলোর স্পর্শ লাগল যেন। স্বপ্নের জীবন শেষ হোলো আর জাগরণের জীবন সুরু হোলো। সেখানে কোনও গভীর বৈচিত্র্য নেই কেবল দৈনন্দিন একঘেয়েমী।

অগ্নিশীলে

হরপ্রসাদ বাবু ছিলেন কুসুমপুরের মস্ত রাশভারী দারোগা। যেমন চেহারা তেমনি গড়ন তেমনই গম্ভীর গলার আওয়াজ। মাথায় ছ ফুট লম্বা, রং মিশ্‌মিশে কালো, দেহ অসাধারণ ব্যায়ামপুষ্ট আর চোখ দুটি সব সময় থাকত জবাফুলের মত লাল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে অথচ চুলে একটুও পাক ধরেনি। সেই শক্ত বলিষ্ঠ চেহারার ভীতিপ্রদ দুটি লালচোখে এবং গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরের "তেওয়ারী আসামীকো লাগাও সাত বেত" উচ্চারণের ভিতর এমন একটা সাংঘাতিক কিছু থাকত যে কেবল যে আসামীই ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপত তা নয়, অনেক সময় তেওয়ারীও কেঁপে কেঁপে উঠত।

একমাত্র ছেলে সুশোভন—চলন চালনে, কথায় বার্ত্তায় এমন একটা বিনয়মিশ্রিত কুণ্ঠা জড়ানো থাকত যে সেই সুশোভনের ভবিষ্যৎ সবাই নির্দ্দিষ্ট ক'রে রেখেছিল কোনও অফিসের নিস্তরঙ্গ জীবনের ভিতর। হরপ্রসাদ বাবু ছেলেকে ভাল ক'রে দেখবার জন্যে কোনও আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। ছেলে আছে থানার পাঁচ সাতটা কুকুর বেরালের মত—খাবার সময় খাও, পরার সময় পর, আমাকে কোনও সময় বিরক্ত কোরোনা—এই ছিল তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। সরকারী নিমকের মর্য্যাদা ছিল তাঁর জীবনের চরম লক্ষ্য। সরকারী নিমকের মর্য্যাদা রাখতে তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন—তাঁর এলাকাতে কোনওদিন 'বন্দেমাতরম্' শুনতে পেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই দেশদ্রোহের শাস্তি বিধানের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। ছেলেকে সব সময় বিদেশী পতাকাকে সম্মান ক'রতে বলতেন, আর বলতেন দেশের লোকেরা স্বদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী নয়, বিদেশীরাই হিতাকাঙ্ক্ষী।

ছেলে সুশোভন চুপ ক'রে থাকত, হ্যাঁ কি না কিছুই বলত না।

একদিন বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসার কথা শুনলেন হরপ্রসাদ বাবু। সুশোভন দেশ দেশ ক'রে পাড়ায় পাড়ায় কি সব চেঁচামেচি ক'রে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যায় সুশোভন ফিরতে তাকে কড়া বক্তৃতা শুনিয়ে রাত্রে অভুক্ত অবস্থায় ঘরে বন্ধ ক'রে রাখলেন। বিলিতি নিমকহালালত্বের ষোল আনা নিদর্শন দেখানো হোলো মনে ক'রে পুলকিত হোলেন হরপ্রসাদ বাবু।

এক এক ধরণের মানুষ থাকে যারা মনে করে মানুষের উদরটাই সব। সুশোভনকে হাতে না মেরে ভাতে মেরে যে শিক্ষাটুকু তিনি দিলেন তাই তাঁর মতে হোলো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় পুত্রের বোধোদয়ের পক্ষে। কিন্তু তাঁর একটু ভুল হোলো—নরমকে আঘাত করলে সে আরও নরম হয় না, হয় শক্ত। যারা মাটির হাঁড়ি সরা গেলাস গড়ে তারা জানে এ কথা। তাই নরম কাদার মত মাটির তাল পিটে পিটে শক্ত করে তার। হরপ্রসাদ বাবু ভাবলেন সুশোভন নরম, বিলক্ষণ নরম, তাকে আঘাত দিলে সে আরও নরম হবে। আর একদিন যখন খবর পেলেন যে সুশোভন মাঠে গিয়ে পতাকা উত্তোলন করেছে, তখন সমস্ত দিন অভুক্ত রাখলেন সুশোভনকে, তারপর অভুক্ত অবস্থায় ছেলেকে তাঁর মুখোমুখি দাঁড় করালেন পরের দিন।

বল্লেন : আর ও রকম কোরবে ?

সুশোভনের মেজাজ ছিল গরম হয়ে। সারা রাত্তির কিছু খায়নি, ক্ষিদের জ্বালায় ঘুমও হয়নি ভালো করে। জীবনে এই প্রথমবার বিদ্রোহ ক রে বল্লে : একবার নয় একশো বার করব—

: বটে। স্তম্ভিত হোলেন হরপ্রসাদবাবু। এ ধরণের উত্তর তিনি প্রত্যাশা করেন নি।

তেওয়ারীকে দিয়ে বেতটা আনালেন, তারপর সেটা একবার মাটিতে ঠুকে সুশোভনকে প্রশ্ন করলেন : এটার দ্বারা কি হবে জান ?

: জানি।

: তবে এগিয়ে এসো।

হাতটা বাড়িয়ে দিলে সুশোভন। সপাং ক'রে একটা আঘাত দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন : কেমন লাগল ?

তিক্ত হাসি হেসে সুশোভন বল্লে : অন্য লোকের যেমন লাগে আমারও ঠিক সেই রকম লেগেছে।

ব্যঙ্গটুকু ধরতে পারলেন হরপ্রসাদ বাবু। রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে আঘাতের পর আঘাত ক'রে চললেন। চার দিক থেকে সবাই হাঁ হাঁ ক রে ছুটে এল। কিন্তু হিন্দুস্থানী 'কনিষ্ঠবলেরা' গরিষ্ঠবল দারোগার কথায় কথা বলতে পারে না, বিশেষতঃ এটা আবার পিতাপুত্রের ব্যাপার এবং হরপ্রসাদবাবু অত্যন্ত বদ্‌রাগী লোক। কি কোরতে কি হয়ে যাবে ভেবে কেউই প্রথমে এগিয়ে আসতে সাহস পেল না। শেষে কিন্তু তেওয়ারী আর থাকতে পারল না।

আঘাতে আঘাতে সুশোভন অচেতন হ'য়ে পড়েছে—একটা বিশ্রী গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে। সেই অচেতন দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তেওয়ারী দুহাত বাড়িয়ে। তার পিঠের উপর দু একটা আঘাত হানার পর হরপ্রসাদ বাবুর হুঁস হোলো। গম্ভীর ভাবে বল্লেন ; সরে যাও সামনে থেকে।

তেওয়ারী নড়ল না, জড়িয়ে রইলো সুশোভনকে। বল্লে : আপনি কি খোকাবাবুকে মেরে ফেলতে চান ?

হরপ্রসাদ বাবু সুশোভনের অবস্থা দেখে কি করবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না আরক্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন তার দিকে, তারপর বল্লেন : আজ থেকে আমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই তোমার খোকাবাবুর। জ্ঞান হোলে সে যেন বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

তেওয়ারী কোনও কথা বাড়াল না। হরপ্রসাদ বাবুর রাগটা সমস্ত মরে যায় নি, এই বাধা পড়ায় মনটা খিঁচড়ে উঠেছিল। তাঁর ঘরে ঢোকার পর এক এক জোরে চেয়ার টেবিলগুলো শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে মাটিতে পড়ার শব্দ শোনা গেল। কনষ্টেবলরা কেউ সেদিকে গেল না, তারা খোকাবাবুর চৈতন্য বিধানের চেষ্টা করতে লাগল।

হর প্রসাদ বাবু ভেবেছিলেন রাগটা কেবল তাঁরই থাকতে পারে। আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলেন জিদ্ সুশোভনেরও কম নয়। বাড়ী ছাড়ার কথা সুশোভনকে বলেছিলেন কেবল রাশভারি মেজাজের চড়া রাগ বশতঃ। ওটাকে হুমকি বা ধমক পর্য্যায়ভুক্ত করা উচিত। কিন্তু আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখলেন যে রাগ যখন তাঁর পড়ে এল, ছেলের রোখ তখন চড়ে উঠল। একদিন সন্ধ্যা বেলায় প্রণাম ক'রে সুশোভন বল্লে : চল্লাম।

প্রশ্ন করলেন : কোথায় ?

সুশোভন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে গেল, কোনও জবাব দিলো না। অপমানিত বোধ ক'রে হরপ্রসাদ বাবু চেঁচিয়ে উঠে বল্লেন : কোনওদিন ফিরে এস না। আমার দরজা বন্ধ হয়ে গেল তোমার কাছে।

সুশোভন কোনও জবাব দিলো না। চারদিক থেকে একটা নীরবতা এসে সমস্ত আবহাওয়াটাকে থম্‌থমে ক'রে তুলল। তেওয়ারীর দল চেঁচিয়ে কথা বলা যেন ভুলে গেল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে মাটি মেখে কুস্তি করাটাও বন্ধ রইল দিন কতক। হরপ্রসাদ বাবু নিজেও যেন কি রকম এক রকম হয়ে গেলেন। চারদিক থেকে

একটা সর্বগ্রাসী শূন্যতা এসে তাঁর এতদিনকার জীবনের তলদেশে ঠিক যেন সর্ব্বগ্রাসী পদ্মা নদীর মত লোল-জিহ্বা প্রসারিত করলে। ওপরটা আপাততঃ টলল না বটে কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখা গেল তাতে অস্পষ্ট ফাটল ধরেছে।

একমাস গেল, দুমাস গেল, একবছর গেল—সুশোভন ফিরল না। সুশোভন ফিরল না বটে, হরপ্রসাদ বাবুর মন ফিরল। নদীর এক কূল ভাঙল অন্য কূলে জেগে উঠল চর। তাঁর মনে হোলো সেদিন সুশোভনকে এই কথা বলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে, "যেকোনও দিন তুমি ফিরে এস, আমার দরজা চিরকাল খোলা রইল তোমার কাছে।" বিরক্তির স্থানে এল আক্ষেপানুরক্তি। যা বলেছেন তার চেয়ে যা বলা হয়নি, যা করেছেন তার চেয়ে যা করা হয়নি—তারই বেদনা বুকে বাজতে লাগল।

সুশোভন—সে কি আর ফিরে আসবে না? ক্রমশঃ পুলিসের কাজই যে কেবল খুব খারাপ লাগল তা নয়, বিদেশী শাসনের শ্রেয়োবোধও কমে আসতে লাগল। বরঞ্চ তাঁর মনে হোতে লাগল যারা দেশের কাজ করতে যায় তারা সত্যিই দেশের কাজ করতে চায়। পুলিস সম্প্রদায় অনাচার দূর করতে চায় বটে কিন্তু অত্যাচার বেশী করে। ক্রমশঃ মনে হোলো সুশোভন বীর, সত্যকার বীর। সে দুঃখ বরণ করে নিল দেশের জন্য। তার তুলনায় তিনি কত....কত ছোট।

সুশোভন কিন্তু আর ফিরল না। গোপনে খবর এল যে সে টেরোরিষ্ট হয়েছে। হরপ্রসাদবাবুর কিছুই ভালো লাগতে লাগল না, চাকরীতে ইস্তফা দিলেন। অনেকদিন বাদে চাকরী ত্যাগ করার পর তাঁর নিজেকে নিতান্ত নিঃস্ব মনে হতে লাগল। উঠে এসেই গুরু গম্ভীর কণ্ঠের "তেওয়ারী" আর সুদীর্ঘ "হু—জু—র" শব্দ নিয়ে যেমন করে সকালটি সুরু হত···দ্বিপ্রহরের আধ নিদ্রা আধজাগরণমণ্ডিত কর্ত্তব্যচেতনা ও আলস্যবোধের মধুর অভ্যাসটুকু·সন্ধ্যাবেলায় হিন্দুস্থানী পালোয়ানদের কুস্তিচর্চ্চার আস্ফোট—রাত্রিবেলায় অস্পষ্ট হিন্দুস্থানী গান এতদিনের নির্জ্জন নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতাভরা জীবনকে সুন্দর অনুভূতির সরু পাড় দিয়ে ঘিরে রেখেছিল; আজ থানার বাইরে এসে সমস্ত পৃথিবী যেন বিস্বাদ তিক্ত মনে হতে লাগল। কেউ নেই তাঁর কেউ নেই। ক্রমশঃ তিনি এক সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে পড়লেন। গোপনে গোপনে গান্ধীজী এবং অরবিন্দের ধর্ম্ম ও রাজনীতি মেশানো উপদেশামৃত পাঠ কর্ত্তে লাগলেন।

একদিন বন্ধুরা এসে দেখল দরজায় খদ্দরের পর্দা ঝুলছে, পরণে তাঁর খদ্দর, দেয়ালের গায়ে দেশনেতাদের অনেকের ছবি। তারা আশ্চর্য্য হয়ে চলে গেল—ব্যাঙাচির ল্যাজটুকু খসে গেছে আজ তিনি একেবারে নতুন মানুষ।

স্বপ্নেতে আসা-যাওয়া শুরু করলে সুশোভন। সুশোভন এখন কত সুন্দর হয়েছে। পিতাপুত্রের মাঝখানে আজ কর্ত্তব্যরক্ষায় কোন পাঁচীল উঠে এল না। তাকে বিহ্বল ভাবে তাঁর বিশাল বক্ষে আশ্রয় দিলেন হরপ্রসাদবাবু। বিস্মিত ভাবে তিনি তাকিয়ে থাকলেন তার দিকে।

: কী দেখছ বাবা?

: দেখছি তোকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে; কিন্তু বুড়ো বাপকে তোর এতদিন বাদে মনে পড়ল?

: উপায় ছিলনা বাবা; তোমাদের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আসা ত সোজা নয়।

: জানি জানি, কিন্তু তুই আমাকে ক্ষমা করেছিস ত!

: কী যে বল বাবা, তুমি দিনে দিনে কী রকম হয়ে যাচ্ছ! তুমিই আমাকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছ একথা কি ভুলতে পারি?

চুপ করল সুশোভন।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন হরপ্রসাদবাবু।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজে সংবাদ পেলেন যে কোথাকার কে ম্যাজিষ্ট্রেট খুন হয়েছে এবং এই হত্যাব্যাপারে সুশোভন অংশ নিয়েছিল পুলিশ কিন্তু তাকে ধরতে পারেনি, সে গা-ঢাকা দিয়ে পালিয়েছে। খবরটা পড়ে হো হো করে হেসে উঠলেন নিস্তব্ধ ঘরে হরপ্রসাদবাবু। দেয়ালের গায়ে বিলম্বিত দেশ নেতাদের ছবির ভিতর একটি ছবি স্থানচ্যুত হল এবং সুশোভন সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করল।

এইবার সুশোভন তাঁর কাছে রাত্রে এবং দিনে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করল। রাত্রি একটু নিস্তব্ধ হলেই সুশোভনের সাড়া পেতেন, দুপুর নিঝুম হলেই সুশোভন ঘরে ঢুকত।

হরপ্রসাদবাবু ভয়ে শিউরে ওঠেন। বলেন: কী সাহস তোর?

: আই হেট্‌, কাওয়ার্ডস, মরতে ত সবাইকেই হবে।

জানলা দরজাগুলো ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে হরপ্রসাদবাবু বল্লেন: জামাটামা-গুলো এবার খুলে ফ্যাল্‌না।

: না, বাবা, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

আশ্চর্য্য! সুশোভন এখনও সেই ছোট্ট ছেলেটিই আছে—ওর গালে একটা চুমো খেতে ভীষণ আগ্রহ হল হরপ্রসাদবাবুর।

খবর পেয়ে দূর বিদেশ থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা ছুটে এলেন। শ্যালক বিদেশে ছিলেন—একদিন দুপুরবেলা আচমকা এসে হাজির হলেন। হরপ্রসাদ-বাবুর ঘোলাটে চোখ এবং বিহ্বল দৃষ্টি লক্ষ্য করে বল্লেন: জামাইবাবু, কয়েকদিন চলুন না, আমাদের ওখান থেকে ঘুরে আসবেন। শরীরও ভাল থাকবে, মনটাও। এখানে একা একা কি ভাল লাগে, চলুন না।

: না ভাই, আমার যাওয়া হয় না—

: কেন বলুন ত?

ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকিয়ে বল্লেন: সুশোভন যদি আসে, যদি এসে ফিরে যায়?

আর একজন আত্মীয়—ডাক্তার, তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, সুশোভন কখন আসে, কেমন আছে সে। তারপর প্রশ্ন করলেন: রাত্রে আপনার ভাল ঘুম হয়না, না?

: কী করে হবে বলুন, ও যদি এসে ফিরে যায়। আমার স্মৃতিশক্তি কী রকম দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে, আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি না ও কখন আবার আসবে বলে গেল। কী বলে গেল কী করে গেল সমস্ত কিছুই অস্পষ্ট মনে হয়।…এমন কি সময় সময় ও যে এসেছিল এই কথাটাও ঝাপসা হয়ে ওঠে। আচ্ছা ও কি সত্যিই আসেনা? আমি ঠিক বুঝতে পারিনা।

: আসে বৈ কি।

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলেন একটা ওষুধের লম্বা ফর্দ্দ করে এবং হরপ্রসাদ বাবুর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের নির্দ্দেশ দিলেন যেন তারা তাঁকে সব সময় গল্পে আনন্দে ঘিরে রাখে। আত্মীয়স্বজনেরা দিন কতক আপ্রাণ চেষ্টা করলে হরপ্রসাদবাবুকে ভুলিয়ে রাখতে, তারপর হঠাৎ তাঁকে কি জানি কেন খবরের কাগজ পড়ে শোনানো বন্ধ করল তারা। সুশোভনের প্রসঙ্গ উঠলে সকলে একে একে চুপ করে থাকত, নতুন কথা কিছুই বলত না। কয়েকদিন পরে আত্মীয়-স্বজনেরা একে একে বিদায় নিল কাজের চাপে। হরপ্রসাদবাবু আবার একা হলেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার একদিন নিঃসঙ্গ নির্জ্জন প্রত্যুষে খবরের কাগজটি তুলে নিলেন…তারপর হাত থেকে তাঁর কাগজখানা পড়ে গেল! খবরের কোন অর্থই তিনি করতে পারলেন না। সুশোভন ধরা পড়েছে। আর শুধু ধরাই নয়—সেই ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার ব্যাপার সুশোভন, তাঁর বীর সুশোভন হয়েছে রাজসাক্ষী।

অনেক রাত্রে আশেপাশের বাড়ীর চারদিক থেকে লোক ছুটে এল। হরপ্রসাদবাবুর বাড়ী ভিতর থেকে বন্ধ, ভিতরে আগুন লেগেছে। শুধু বাড়ীতে নয় মনেতেও।

সেই অগ্নিশিখার লেলিহান নৃত্যের মাঝখানে, সেই নিস্তব্ধ গৃহের শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায় দাঁড়িয়ে, হরপ্রসাদবাবু এক এক করে পুড়িয়ে চলেছেন সুশোভনের যা আছে—তার টুকিটাকি ঘটনার খাতা, তার চিঠিপত্র, তার প্রিয় বই, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র। চোখের দৃষ্টি তাঁর একেবারে ঘোলাটে। দেয়াল থেকে নামিয়ে ফেলেছেন সুশোভনের ছবিটা·· হাতে একটা বেত···গায়ে খাকী জামাপরে দাঁড়িয়ে···সেই স্ফুলিঙ্গের স্ফুরণপ্রয়াসের সামনে আপনমনে বলে চলেছেন: আই হেট কাওয়ার্ডস্; তেওয়ারী, আসামীকো লাগাও সাত বেত।

এই কাহিনীর ঘটনাকাল পরাধীন ভারতবর্ষের।]

বিপর্য্যয়

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গল।

অনেক কষ্টে চোখ মেলে দেখলাম। না ঠিক দেখলাম না। কারণ কিছুই দেখতে পেলাম না। চোখ মেলে বুঝতে পারলাম আমার পায়ের কাছে নরম কি যেন একটা পড়ে আছে। সন্দেহ হোলো মাড়োয়ারীই ত? পা দিয়ে একটু নাড়া চাড়া ক'রলাম—কোনও উত্তর নেই। পদাঘাত ক'রলাম, নিরুত্তর।

মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছিল, আবার ঝিমিয়ে পড়লাম। বেশ মনে পড়ল আমি খানিকক্ষণ আগে চলেছিলেম সামান্য একটি কাঠের পাটাতনে ভর ক'রে শূন্য প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে। আমার গতিবেগ ছিল চল্লিশ মাইল প্রতি ঘণ্টায়। মাড়োয়ারীটি আমার সঙ্গেই ছুটে চলেছিল আমার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে, সমান গতিবেগে। অর্থাৎ আমি ছিলাম একটি ট্রেণের সেকেণ্ড ক্লাস কামরার উপরের বার্থে নিচের বার্থে শুয়ে'ছল লোকটি। আলোয় যতক্ষণ দেখেছি ততক্ষণ তাকে বেশ শাঁসাল বলেই মনে হয়েছে। মাঝ রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড শব্দে আর প্রচণ্ড আঘাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে চাইলাম—কামরাটা অন্ধকারে ভরে গেছে। গাড়ীটা উল্টে গেছে—লোকটা কাঠের তলায় চাপা পড়েছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি বিশেষ আহত হইনি। ওপরের বার্থ থেকে ছিটকে পড়েছিলাম হয়ত তার বিরাট দেহে, তারপর আমি আর মাড়োয়ারী দুজনেই ভাঙ্গা কাঠের স্তূপের ভিতর পাশাপাশি পড়ে আছি। না ঠিক পাশাপাশি নয়। ও পড়েছে কাঠের স্তূপে চাপা, আমি রয়েছি ওকে চেপে।

মাড়োয়ারীটি কি মরেছে?

নড়ে চড়ে ঘোরবার চেষ্টা করলাম। অনেক কষ্টে খানিকটা কাঠের স্তূপ সরিয়ে মাথাটা বার ক'রলাম। ছেঁড়া গদির ভেতর তীব্র বেগে একটা কাঠের প্রায় বারো আনা অংশ ঢুকে গেছে। কাঁচের বালবের টুকরো ওর চোখের ভেতর ভীষণ ভাবে ঢুকে গেছে। সার্সির কাঁচগুলোও ওর বুক পিঠের উপর নির্ম্মমভাবে ঝরে পড়েছে। লোকটির বুকের স্পন্দন তখনও থামেনি—কিন্তু

থামতে বিশেষ বিলম্ব আছে বলে মনে হ'ল না।

কাঠের স্তূপ খানিকটা সরে যাওয়ার ফলে একটু অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না কামরাটিকে স্বপ্নালোকিত করে তুলেছিল। সেই স্বপ্নালোকে সেই বীভৎস দৃশ্যের মাঝখানে মৃত্যুপথযাত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার কোন দুঃখ এলনা, কোনও উঁচু ধরণের চিন্তায় চিত্ত ভরে উঠল না। বরঞ্চ আনন্দ হোলো লোকটি মারা যাচ্ছে ভেবে। আনন্দ হ'ল আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবো বলে। সন্ধ্যাবেলায় কামরায় যখন আলো ছিল তখন লক্ষ্য করেছি লোকটা অনেকগুলো কাঁচা টাকা বারে বারে নাডাচাডা করছিল, আর একটা চিঠি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে পড়ছিল।

দৃশ্যটি মনে পড়তেই বিধাতাকে ধন্যবাদ দিলাম। আমার স্ত্রী অনেকদিন ধরে রোগে ভুগছে—ডাক্তারেরা নির্দেশ দিয়েছে তার স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানপরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজন। টাকা নেই আমার অত' অথচ চোখের সামনে দেখ'তে হচ্ছে সুন্দর ক্রমশঃ পাণ্ডুর হয়ে চলেছে, সুস্থতা ক্রমশঃ শীর্ণতায় আচ্ছন্ন হয়েছে।

সেই অস্পষ্ট আলোয় এগিয়ে এসে নির্মম ভাবে লোকটার পকেটে হাত দিলাম। হাতে একটা ছোট টেলিগ্রাম আর তার সঙ্গে একটি চিঠি উঠে এল। কিন্তু যে জিনিষটা খুঁজছিলাম তার কোনও চিহ্ন পেলাম না। বাঁদিকের পকেট, ডানদিকের পকেট, বুক পকেট সব কিছু হাতড়ে সামান্য মাত্র কয়েক আনা পয়সা সংগ্রহ ক'রলাম। মনে মনে বিরক্ত হ'লাম, আমি কি কুলি। বিশ মিনিট পরিশ্রম করে মাত্র কয়েক আনা পয়সা।

এইবার স্বল্পতম মমতাও মনে রইল না। জামাটা তুলে ধরে লাল রংয়ের একটা ফতুয়া বার করলাম। সেখানেও কিছু মিলল না। তারপর কাপড়ের ভেতর হাতটা ঢুকিয়ে ফেললাম। মোটা একটা থলি বার করল ম। সেখানেও কিছু মিলল না। তারপর কাপড়ের ভেতর হাতটা ঢুকিয়ে ফেললাম। মোটা একটা থলি বার হোলো। তার মধ্যে হাজারটা প্রায় দশটাকার নোট, এ ছাড়া একশো টাকার নোট রয়েছে গোটা চল্লিশেক।

খুসী চিত্তে সেগুলি গ্রহণ ক'রে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। কে জানবে আমার এই চুরীর ইতিহাস। ধনী মাত্রেই ত চোর, তাদের প্রত্যেকেরই জীবনের ইতিহাসে এই ধরনের কত শত কলঙ্ক কাহিনী রয়েছে—কে জানে তার কথা?

আমি কি কিছু অন্যায় করছি। এক এক করে নোটগুলি গুণে নিয়ে পকেটে ভরলাম। এতক্ষণে খোঁজাখুঁজি স্নরু হয়েছে এক্ষুণি লোক এসে পড়ল বলে। সহসা একটা অসীম কৌতূহল হ'ল লোকটি বেঁচে আছে ত, তাহ'লে ওর মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু জেনে যাক। হাতটা ধীরে ধীরে বুকের উপর রাখলাম। হৃৎপিণ্ড চলছে ধীরে, অতি ধীরে। অকস্মাৎ ভয়ে আমার রক্ত চন্ চন ক'রে উঠল। মনে হ'ল লোকটা যদি বেঁচে ওঠে। যদি ভাল হয়ে আমার খোঁজ করে। যদি কেন, নিশ্চয়ই ত কোরবে। আর সেকেণ্ড ক্লাসের বার্থ রিজার্ভ করা ভদ্রলোকের খোঁজ পাওয়া ত অত্যন্ত সহজ কাজ। তখন ? তখন আমার মান-সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি থাকবে কোথায় ?

একটা বিশ্রী চিন্তা মাথায় ভেসে এল। অচেতন দেহের ভিতর জীবনের শেষটুকু নিভিয়ে দেবার জন্য দ্বিধা থরথর ডান হাতটা প্রসারিত ক'রলাম ওর গলার দিকে। থেমে যাক কণ্ঠনালীর মধ্যপথে ওর নিঃশ্বাস গ্রহণের ক্লান্তিকর প্রয়াস।

ছি ছি এ কি করছি।

হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। আমার হাতটা তখন সম্পূর্ণ আমার বশের বাইরে। নার্ভে নার্ভে অসীম উত্তেজনা সঞ্চারিত হওয়ার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ছাগদেহের ন্যায় শিউরে শিউরে উঠছে। অনন্ত আকাশ আর অনন্ত নক্ষত্রের পরিচয়বিহীন সেই অস্পষ্ট রাত্রির শীর্ণ জ্যোৎস্নারেখায় অপরিস্ফুট সেই মাড়োয়ারীটির দেহের সামনে আমার বীভৎস হাত থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। সাপ যেমন ক'রে ছোবল মারার আগে ফণা তুলিয়ে লক্ষ্যবস্তুর উপর ঝাঁপ দেবার উপক্রম করে তেমনি আমার দ্বিধা-কম্পিত দক্ষিণ হস্তের করতল মৃত্যুপথ যাত্রীর কণ্ঠদেশের দিকে এগুতে লাগল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল, কণ্ঠতালু এল শুকিয়ে, আর একটু হোলেই শেষ করে ফেলেছিলাম।

বাইরে থেকে কে যেন ডাকল। খোঁজাখুঁজি চলছিল। আমাদের কামরার ভাঙ্গা কাঠের স্তূপের নীচে কেউ পড়ে আছে কিনা জানবার জন্য খানিকক্ষণ লোকগুলি চীৎকার করলে। ভয়ে নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে রইলাম। মৃত্যু নীরবতায় সমস্ত কামরাখানা ভরে উঠল। কোন সাড়া না পেয়ে বাইরের লোকগুলি চলে গেল।

এইবার হাতটা একটু বশে এসেছে। ওর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকুনি কমিয়ে দেবার জন্য আমার হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌ধুকুনি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

পেশীতে শক্তি সঞ্চারিত ক'রে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলাম ওর গলা তারপর সব চুপ।

খানিকপরে ভাবলাম, ওর যে কাগজপত্রগুলো আমি সংগ্রহ করেছি সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দি। সেই টেলিগ্রামখানা আর চিঠিখানা বার ক'রলাম তারপর ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে বাইরে ফেলে দেবার আগে সেই ভাঙ্গা কাঠের মাঝখান দিয়ে উঁকি মারা ঈষৎ চাঁদের আলোয় সেগুলির মর্ম্ম উদ্ধার করবার জন্য একটু চকিত দৃষ্টিপাত ক'রলাম। টেলিগ্রামখানা এসেছে কোনও এক ছক্কনলালের কাছ থেকে। লিখছে সে চমনলালকে উদ্দেশ্য ক'রে যে চমনলালের স্ত্রী মৃত্যু-পথ যাত্রী। তার সঙ্গে শেষ দেখা করতে চায়। যত শীঘ্র পার, এস; চিকিৎসার জন্য কাঁচা টাকা নিয়ে। পত্রখানি হিন্দীতে লেখা, রুক্মী লিখছে তার স্বামীকে। কিছুদিন আগেকার চিঠি; বোধহয় দিন সাতেক হবে। লিখছে অনেক স্নেহ জানিয়ে, অনেক প্রীতি জানিয়ে। তাকে যেন একবার দেখতে আসে ছক্কনলাল! শরীর তার উত্তরোত্তর খারাপ হয়ে চলেছে। ডাক্তার আশা দিলেও তার মনে হচ্ছে যে আর বেশী দিন বাঁচবে না। "জলদি গিগ্ গির এস ছক্কনলাল যদি তোমার রুক্মীকে দেখতে চাও।"

চিঠিটা আর টেলিগ্রানখানা আমার হাত থেকে পড়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে এল এক দূর বিদেশে মৃত্যুপথযাত্রিনী একটি নারীর ক্লান্ত পাণ্ডুর, মুখ। উদগ্র প্রতীক্ষায় চোখ দুটি উজ্জ্বল। আমার স্ত্রীর কথা আর ভাবতে পারলাম না। নোটগুলো আর লেখাগুলো ওর পকেটেই ফেরৎ দিলাম। তারপর সেই প্রান্তরের স্বল্পালোকিত ভগ্নস্তূপের মধ্য হ'তে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে অদৃশ্য বিধাতার চরণপ্রান্তে নিবেদন করলাম, "হে ভগবান তুমি লোকটিকে বাঁচিয়ে তোল।" বাইরে একদল লোক এসেছে খোঁজাখুঁজির জন্য। আমি যথাসম্ভব শক্তিসঞ্চয় ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলাম—"ডাক্তার·· ডাক্তার।"

অমৃত প্রেমের মৃত্যু

দৃশ্য হয়েছে অদৃশ্য।

অদৃশ্যকে দৃষ্টিপ্রদীপ বরণ ক'রে নিয়েছে।

মেঘে মেঘে বাঙ্গা আলোর লুকোচুরি চলেছে। জলেতে লেগেছে রাঙ্গা আলোর পরশ, বসেছে ঝিকিমিকির মেলা। শীর্ণ পাতা ঝরছে টুপ্ টাপ্, সেই ঝরা পাতার বুকে লেগেছে অপরাহ্নের ক্ষীণ রক্তাভা।

অনুপমের দৃষ্টি অতিক্রম করেছে দৃশ্যকে।

আজ সে আসছে, সে—তার বীণা। যার হাসি শুনে মনে হত একদিন জলতরঙ্গের টুং টাং · ঝর্ণার ঝর্ঝর · ম্লান অন্ধকারে শিউলি ঝরার মৃদু করুণ শব্দ। সেই বীণাই আসছে। কিন্তু সেই বীণাই কি আসছে? মানুষ ত একই, কিন্তু মানসলোক ত এক নয়। আজ অনুপম রোগী, তার প্রতি অনুকম্পা নিয়ে আসছে দেখতে। আজ বীণা পরম সংসারী, পতিব্রতা, পরস্ত্রী।

আর মাত্র কটি ঘণ্ট, তারপরেই অনেকদিনের অদর্শনের বিরাট যবনিকাটা উঠে যাবে। কিন্তু নতুন রঙ্গমঞ্চে পুরোনো দিনের নায়ক নায়িকার স্থান কোথায়? সাতটার গাড়ীর শব্দে মনটা তার অতীতে হ'তে বর্তমানে ফিরে এল। জানালা দিয়ে মুখ বার ক'রে অনুপম বাগানের দিকে তাকাল। ওদিকে সাজগোজের বিপুল আয়োজন চলেছে। টেনিস লনের উঁচু নীচু ঘাসগুলোকে সমান ক'রে দেওয়া হচ্ছে। কতকগুলা আগাছা জন্মেছিল ধারে ধারে সেগুলোকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। এপাশ ওপাশের ফুলগাছ হ'তে ফুল সংগ্রহের বিরাট ব্যাপার চলেছে।

ঘরে এসে নায়েক ঢুকল। মুখটা যতদূর সম্ভব অপ্রতিভ ক'রে বল্লে: আজ্ঞে ভাল মালা পাওয়া গেল না।

বিকৃত মুখে অনুপম উত্তর দিলে: পাওয়া গেল না মানে? মধুপুর বাজারে মালা পাওয়া গেল না।

: আজ্ঞে পাওয়া যে যায়নি তা নয়, তবে বড্ড বেশী দাম চাইছে।

ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বসে অনুপম বল্লে: তা সেইজন্ত কি মালা আনা হবে না নাকি? যত সব—

নায়েক হাসিমুখে বেরিয়ে গেল।

খানিক বাদে ছোটভাই পুলক এসে ঘরে ঢুকল। হাতের ডাক্তারী ব্যাগটা টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বল্ল : কেমন আছ দাদা, জ্বরটা কমেছে ?

সে কথার জবাব না দিয়ে অনুপম বল্লে : ওদিকের কাজ হোলো ?

: হচ্ছে।

: হচ্ছে, ব'ল ব্যাপারখানা কি ? সাড়ে আটটায় গাড়ী আর এখনও হচ্ছে। ঘরটা সাজান হোলো কিনা দেখগে—

পুলক চলে গেল। টেবিলের ওপর ব্যাগটা পড়ে থাকে। আবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুপম বাগানের কাজ দেখতে থাকে। কতকগুলো উঁচুনীচু জায়গাকে সমতল করা হচ্ছে। সূর্য্য ডুবে গেছে, শুধু একটা অস্বচ্ছ আলোয় ভূতের মতন বিরাট মাথা শিরীষ গাছটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এই রকম সময়েই ত কতদিন তারা হাত ধরাধরি করে বেড়িয়ে ফিরেছে

একটা ট্রেণ চলে গেল।

অনুপম আবার ফিরে এল বর্ত্তমানে।

নিঃশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল কতকগুলো তারা ঠিক কম্পাউণ্ডটার ওপর জলজ্বল ক'রে জ্বলছে। আর দূরে · বহুদূরে একফালি হলদে চাঁদ কাল আকাশের আড়াল থেকে উঁকি মারছে।

হঠাৎ খুট্ ক রে একটা শব্দ পিছনে ফিরে দেখল খাস চাকর শিবনাথ মালা আর আলো নিয়ে ঘরে ঘরে ঢুকেছে। টেবিলের ওপর টেবল-ল্যাম্পটা রেখে সে প্রশ্ন করল : আমায় ডাকছিলেন বাবু ?

: হ্যাঁ, পেট্রোম্যাক্সগুলো জ্বালান হয়েছে ?

থতমত হ'য়ে শিবনাথ উত্তর দেয় : আজ্ঞে ওরা সব জ্বালতিছে। ধমকে উঠে অনুপম বল্লে : ওরা সব জ্বালতিছে। যাও পেট্রোম্যাক্সগুলো শীগ গির জ্বালিয়ে ফেল।

শিবনাথ চলে গেল।

রাত্রি আরও গভীর হ'তে থাকে। গ্যারেজ থেকে মোটরটা বার করার শব্দ শোনা যায়। তারপর নিকট হ'তে বহুদূরে চলে গেল মধুকণ্ঠ কুকুরের ডাক —আর শোনা গেল না। সমস্ত পৃথিবী নিঝ্‌ঝুম হয়ে উঠল···ঐকান্তিক প্রতীক্ষায় সমস্ত বাড়ীটা স্তব্ধ। অনুপমের মন তখন এত বিভোর যে ঘড়িটার টক্ টক্ শব্দ পর্য্যন্ত অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে বাজতে লাগল। এইবার, এইবার নিশ্চয়ই গাড়ীটা ষ্টেশনের ধারে পৌছেচে। ট্রেণ কি এসেছে।

প্রথমে কি প্রশ্ন করবে বীণা? চিত্তটা কৌতূহলে ভরে গেল। হাত দিয়ে মালাগুলি শক্ত ভাবে অনুভব করতে লাগল অনুপম। বহুদূর হ'তে আবার ভেসে আসছে কুকুরের ডাক, আর ঘরঘর শব্দ। ক্রমশঃ সামনের লনের পাশের লাল শিবঠাকুর ছড়ানো পথে কুরকুর শব্দ শোনা গেল। এক নিমেষে বাড়ীর সকল লোক হৈ চৈ ক'রে উঠল।

অনুপম ধড়্মড়্ ক'রে উঠে বসতে গেল। ওদের পায়ের শব্দ ক্রমশঃই এদিকে আসছে। একটি মুহূর্ত। তারপর শক্ত আঘাত খেয়ে হাতের মালাটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে শ্রান্ত হ'য়ে শুয়ে পড়ল অনুপম। সুন্দর একটি লোকের হাত ধরে বীণা এগিয়ে আসছে। গভীর আবেগে ওরা দুজনে কথা কইছে।

চুপ ক'রে চোখ বন্ধ করল অনুপম।

সে-বীণার মৃত্যু ঘটেছে, সে-অনুপমেরও আজ মৃত্যু ঘটল।

বিবাহের বিশেষ বিবরণ

অমলেন্দু পেসেন্ট-প্রত্যাশী ডাক্তার। প্রাচীন পটলডাঙ্গায় মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া হাটখোলায় দীর্ঘদিন ডাক্তারখানা খুলিয়াছে বটে কিন্তু ভাগ্যফল শুভ নহে। অকারাদিক্রমে কয়েকজন রোগীর ভবযন্ত্রণা চিরতরে শেষ করিয়া সে পটলডাঙ্গার যশে হাটখোলা এমনই মুখর করিয়া ফেলিয়াছে যে রোগী বড় একটা ঘেঁষে না। এখন সে শূন্য ডাক্তারখানায় 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ' গান গাহিযা, ঠ্যাং নাচাইয়া, খবরের কাগজ পড়িযা দিন কাটাইয়া দেয়।

সেদিনও সকালে অমলেন্দু বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল এমন সময় ডাক্তারখানার সম্মুখে একটি মোটর থামিল। গাড়ী হইতে একজন প্রৌঢ় আসিয়া ডাক্তারখানায় প্রবেশ করিলেন। অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যে অমলেন্দু সোজা হইযা বসিল। আগন্তুক প্রৌঢ় বটে কিন্তু স্থবির নহেন। বেশভূষা আভিজাত্য-চিহ্নিত ও মার্জিত। চেহারার মধ্যে একটি শ্রী আছে অথচ কিসের যেন অভাবও আছে। হাত তুলিযা নমস্কার করিলেন এবং পরিষ্কার বাংলায় আগন্তুক বলিলেন যে ডাক্তারবাবুর সহিত তাঁহার গোপন আলোচনা আছে।

কথার টান দেখিযা অমলেন্দু বুঝিল আগন্তুক বাঙালী না হইলেও বাংলা মুল্লুকে দীর্ঘদিন বাস করিতেছেন। অমলেন্দু নড়িযা বসিল। মক্কেল নিঃসন্দেহে শাঁসাল।

একটু হাসিযা আগন্তুক বলিলেন: চিকিৎসাবিদ্যায় আপনার অদ্ভুত নৈপুণ্যের কথা জানিয়া আপনার নিকট আসিযাছি।

অমলেন্দু নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত রাখিল। ভদ্রলোক আবার বলিলেন: শুনিয়াছি দুই একটি অবাধ্য রোগী ব্যতীত সকলেই আপনার ডাক্তারীবিদ্যার গুণকীর্তনের জন্য স্বর্গে গিয়াছেন! ভরসা করিয়া তাই আপনার নিকট আসিলাম।

অমলেন্দু বিরক্ত ও বিস্মিত হইল।

: আমার ইচ্ছা আপনি আমার স্ত্রীর চিকিৎসাভার গ্রহণ করুন।

: আপনার স্ত্রীর কি হইয়াছে?

: বিশেষ কিছুই হয় নাই। কিন্তু আমি চাই তাঁহার কিছু একটা হউক। আপনার যেরূপ হাত-যশ আমার আশা পূর্ণ হইতে পারে।

: আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—

: আপনি দয়া করিয়া আমার সহিত চলুন। আমি সব বলিব।

অমলেন্দু ডাক্তারী ব্যাগ লইয়া গাড়িতে উঠিল। চারিদিকে তাকাইল কেহ দেখিতেছে কি·· নাঃ কেহ দেখিতেছে না। কি দুর্ভাগ্য।

গাড়ীতে প্রৌঢ় বলিলেন : ডাক্তারবাবুর বোধহয় বিবাহ হয় নাই।

কপালকুণ্ডলার ন্যায় অমলেন্দুর মুখ দিয়া বাহির হইল : বি-বা-হ।

: হয় নাই তো? ঠিক ধরিয়াছি। 'বিবাহ' হইল সারাজীবন ধরিয়া বিব্রতভাবে বহন করা।

: সেকি?

: ত্রিতাপ জ্বালা কথাটা জানেন নিশ্চয়ই?

: শুনিয়াছি

: আমি ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলিতেছি। আধা-দৈবিক দুর্ঘটনা অর্থাৎ বিবাহ জ্বালায় স্ত্রী জ্বালাইতেছেন। আধা-ভৌতিকভাবে জ্বালাইতেছে নমিতা—সে সম্পূর্ণ ঘাড়ে বসিতে পারিতেছে না। আর আধা-আত্মিক জ্বালায় নিজেই জ্বলিতেছি। ডাক্তারবাবু, আমার আসক্তি যে পরিমাণ আছে শক্তি সে পরিমাণ নাই।

: নমিতা? নমিতা কে?

: আমার স্ত্রীর নাম। বাঙ্গালী। তরুণী। শিক্ষিতা।

: কিন্তু নমিতা আপনাকে জ্বালাইতেছে কিভাবে বুঝিলাম না।

প্রৌঢ় হাসিলেন।

বাঁধানো দাঁতগুলি হাসিয়া উঠিল। বলিলেন : দরিদ্রের কুটিরে আপনি আসিয়া গিয়াছেন। এইবার পায়ের ধূলি দিয়া আমার গৃহ পবিত্র করুন। সব কথা বুঝিতে পারিবেন।

দীনের কুটির অর্থাৎ সাত মহলা প্রাসাদ। অমলেন্দু গাড়ী হইতে নামিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। মাথা উঁচু করিয়া দেখিল, তিনতলার ঝুল বারান্দায় সার্কাসের একটি বিপজ্জনক অথচ মনোরম ভঙ্গিতে একটি যুবতী নিচের জনারণ্য দেখিতেছিল। জনারণ্যে ব্যাঘ্র জাতীয় জীব কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া যুবতীটি হয়ত মনে মনে ভাবিতেছিল 'হরিহে পার কর'। এমন সময়

ডাক্তারের নজর সেই দিকে পড়িল। প্রৌঢ় এক গাল হাসিয়া বলিলেন : কি সুন্দর দেখিলেন তো? নমিতা অদ্ভুত সাহসী…অদ্ভুত সেবাপরায়ণা…অদ্ভুত সুন্দরী! আমার স্ত্রীর অসুস্থ শরীরের দিকে যত্নের সীমা নাই। অথচ আমি যে মরমর…সে দিকে…

ভদ্রলোক চুপ করিয়া গেলেন।

সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া দুইজনে তিনতলায় আসিলেন। নমিতা আগাইয়া আসিয়া অভ্যর্থনা করিল। ঘরের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক শুইয়াছিলেন। বৃদ্ধ পরিচয় করাইয়া দিলেন : ডাক্তারবাবু, আপনার পেসেণ্ট…

অমলেন্দু দেখিয়াই বুঝিল ভদ্রমহিলা শরীরের ভারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। আর তাঁহার পাশে যৌবনোচ্ছল নমিতাকে দেখিয়া প্রৌঢ়ের মনের ব্যথা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। নমিতাও এক দৃষ্টে অমলেন্দুকে দেখিতেছিল। সে ভাবিল এই আয়তলোচন ছাগশিশুটি নাগালে যখন আসিয়া পড়িয়াছে তখন তাহাকে খুঁটায় বাঁধিয়া রাখিতে দোষ কি? বিধবারা অসঙ্কোচে মাছ মারিয়া থাকেন, প্রকাশ্যে খান না। আমিও না হয় তদ্রূপ আচরণ করিব।

রোগী দেখিবার পর ভদ্রলোক অমলেন্দুকে পাশের ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে বলিলেন : কেমন দেখিলেন?

: আপনার স্ত্রী মেদভারে একেবারে অথর্ব হইয়া গিয়াছেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভদ্রলোক বলিলেন : আমার অশান্তির কারণ আমার গৃহ ও আমার দেহ। নমিতা আমার স্ত্রীর জন্ম আমাকে বিশেষ আমল দিতেছে না। এছাড়া আমার শরীরও আমার বিরুদ্ধে। ডাক্তারবাবু, আপনি কি অসম্ভবকে সম্ভব করিবেন?

অমলেন্দু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল : ডাক্তারীতে সম্ভব অসম্ভবের সীমারেখা টানা বড় কঠিন। অজ্ঞান যাহাকে অসম্ভব বলে বিজ্ঞান তাহাকে সম্ভব করে। কিন্তু প্রবাদ আছে, বিনা ঘুষে কর্পোরেশনের কার্য অসম্ভব, বিনা পরিচয়ে পত্রিকায় লেখক হওয়া অসম্ভব, বিনা বক্তৃতায় মন্ত্রিত্বরক্ষা অসম্ভব। অতএব যে কার্যে যাহা অবশ্যকরণীয় তাহা করিতেই হইবে।

ভদ্রলোক এক গাল হাসিয়া বলিলেন : নিশ্চয়ই। বিনা মাইকে বারোয়ারী পূজার ন্যায়, বিনা ডিম্বনিক্ষেপে বিধান সভার ন্যায়, আমার জীবন লে-হালুয়া হইয়া গিয়াছে। আপনি আমাকে সামর্থ দিন, আমি আপনাকে অর্থ দিব। আপনি নিশ্চয়ই আমাকে কর্মজগৎ হইতে অবসর লইতে বলিবেন না?

: মোটেই না। যে বয়সে সাধারণ লোক পেন্সন লয় সে-বয়সে অসাধারণ ব্যক্তিরা মন্ত্রীর কাজ সুরু করেন।

: শাস্ত্রকার যে বলেন পঞ্চাশের উপরে বনে যাইতে হয়।

: সে বন সাধারণ বন নহে, বৃন্দাবন। আমি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম করিতে পারি।

: থাকুক সে কথা। আপনি আমাদের দুইজনের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন।

: করিলাম।

কিছু দন চিকিৎসা চলিবার পর ভদ্রমহিলাকে শেষ ঔষধ দিবার ব্যবস্থা হইল। তাই অমলেন্দুকে মাঝে মাঝে আসিতে হইত। অবশেষে একদিন নমিতাকে দুইজনের ঔষধ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। প্রৌঢ় চান তিনি তাড়াতাড়ি চাঙ্গা হইয়া উঠুন ও স্ত্রীর পঙ্গুভাব তাড়াতাড়ি বাড়িয়া চলে।

নমিতা প্রশ্ন করিল : বুড়ো কি সত্যিই জোয়ান হইবে?

অমলেন্দু হাসিয়া বলিল : তাহা কিসেয়...

: আর জোয়ান কি চিরকাল বুড়ো থাকিবে...

: অর্থাৎ...

: অর্থাৎ আপনি কি চিরকাল -

: শাস্ত্রে বলে সিনেমায় ধূমপান, যৌবনে বিবাহ এবং লেডিস সীটে উপবেশন যথেষ্ট বিপজ্জনক

: আর জীবন্ত মানুষের প্রাণান্ত করা বিপজ্জনক নহে

: পাগল নাকি? আমি কি অমানুষ।

: আপনি তাহলে রুগী হাতে রাখিতেছেন, বুড়োকে বলিয়া দিব। নমিতা হাসিল।

অমলেন্দু হাসিয়া উত্তর দিল, আপনিও ডাক্তারকে হাতে রাখিতেছেন, তাহাও বলিয়া দিব।

দুজনে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

পরের দিন ডাক্তারখানায় নমিতা নিজেই আসিল। অমলেন্দু চমকিয়া বলিল—একি আপনি।

: ঔষধ খাওয়ানোতে একটু ভুল হইয়া গিয়াছে...

: কি ভুল?

: বৃদ্ধের চাঙ্গা হইবার ঔষধ বৃদ্ধপত্নী খাইয়া ভীষণ যৌবনচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। আপনাকে দেখিতে চাহিতেছেন।

: কি সর্বনাশ! আর বৃদ্ধ?…

: তিনি স্ত্রীর ঔষধ খাইয়া বিছানা লইয়াছেন…

অমলেন্দু হাসিল। বলিল : বুঝিতেছি, এ আপনার কাজ। কিন্তু ঔষধ দুটি উল্টাপাল্টা করিয়া আপনার কি লাভ হইল?

: বৃদ্ধের হাত হইতে বাঁচিলাম, আর আপনাকে পাইলাম!

: আমাকে পাইলেন—এ কথার অর্থ?

নমিতা হাসিয়া বলিল : আমি বোকা নহি। আপনার মারাত্মক ঔষধের সামান্য মাত্রা সেবনেই বৃদ্ধ কাবু হইয়া গিয়াছেন। বাকী ঔষধ আমার নিকট আছে। আপনি বিবাহ করিতে অস্বীকার করিলে তাহা লইয়া পুলিসের নিকট যাইব।

: আমিই যে ঔষধ দিয়াছি তাহা কে বলিবে?

: বৃদ্ধ! তিনি তো অজ্ঞান হন নাই।

অমলেন্দু স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ বাদে বলিল : এখন কি করণীয়?

নমিতা হাসিয়া বলিল : বিবাহ এবং আমাকে। টাকার জন্য ভাবিবেন না। বৃদ্ধ আমাকে প্রচুর টাকা দিয়াছেন। চাপিয়া ধরিলে কেলেঙ্কারীর ভয়ে আরও দিবেন। এখন আপনি রাজী হইলেই আমার একটি হিল্লে হয়।

নমিতা আর কথা না বলিয়া অমলেন্দুর হাত ধরিল। অমলেন্দু বুঝিল ইহাকেই পাণিগ্রহণ বলে। সে হাত খুলিবার চেষ্টা করিল না।

পরের গল্পগুলি "পরকীয়া কহানী" অর্থাৎ মূল হিন্দী, উর্দু, ওড়িয়া হোতে অনুবাদ।

পাতালপুরী

প্রেমচন্দ অবলম্বনে (হিন্দী গল্প)

'ভক্তমালা' পড়তে পড়তে কখন চোখে ঘুম এসেছে জড়িয়ে।

ভক্তমালে কত মহাত্মার কাহিনী। তাঁদের কাছে ভগবৎপ্রেমই সব কিছু, ভগবৎপ্রেমেই তাঁরা মগ্ন। এ ধরণের গভীর ভক্তি কেবল কঠোর তপস্যাতেই লাভ করা যায়। আমি কি পারি না এমন তপস্যা কোরতে? এ সংসারে আমার আর আছে কি? গয়না? লোকের ভাল লাগতে পারে কিন্তু আমার চোখে জ্বালা ধরে। ধন-দৌলত? যারঁ প্রিয় তার থাক। আমার ত ধন-দৌলতের নামে গায়ে জ্বর আসে।

পাগলী সুশীলা! কত উচ্ছ্বাসেই না কাল আমাকে সাজিয়েছিল, কত অনুরাগেই না আমার কালো চুলের ভিতর ফুল দিয়েছিল গুঁজে। বারণ করলাম কত! মানা শুনল না সুশীলা! যা ভয় কোরেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হোলো। দু'জনে যত হাসি হেসেছিলাম তার চেয়ে বেশী কোরেই কাঁদতে হ'ল। স্ত্রীর সাজসজ্জা দেখে স্বামী আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে, সংসারে এ ধরণের স্ত্রী বোধ হয় বেশী নেই। শুনলাম, 'তুমি আমার পরলোকটি নষ্ট কোরবে, আর কিছু নয়। তোমার চালচলন হাবভাব সে কথাই বলছে।' স্বামীর কাছ থেকে এ কথা শুনে কোন নারী না বিষ খেতে চায়? ভগবান! সংসারে এমন লোকও আছে?

অবশেষে নীচে এসে ভক্তমাল পড়তে সুরু কোরলাম। পড়তে পড়তে মনে হ'ল আর কিছু না। এবার বৃন্দাবনকুঞ্জবিহারীর চরণ-সেবাতেই বাকী দিনগুলি দেব কাটিয়ে, তাঁকেই দেখাবো আমার বেশ-বাস। তিনি ত আর বিরক্ত হবেন না? আমার মনের কথা ত আর তাঁর অগোচরে নেই?

ভগবান! নিজের মনকে বোঝাব কি কোরে? তুমি ত অন্তর্যামী! আমার মনের আনাচে-কানাচের সকল খবরই তো তোমার জানা! ভাবি একবার, স্বামীকে মনে কোরব ইষ্টদেবতা, তাঁর চরণের সেবা কোরব, তাঁর কথা মতই চলা-ফেরা কোরব। তাঁর কোনও কথায়, কোনও ব্যবহারে অণুমাত্র দুঃখ

হবে না। তাঁর ত কোন দোষ নেই! কপালে যা ছিল তাই হয়েছে! এর জন্যে তাঁরই বা কি অপরাধ, আমার মা-বাবারই বা কি অপরাধ? অপরাধ আমার পোড়া কপালের। কিন্তু যখনই স্বামীকে আসতে দেখি আমার মনের উৎসাহ কোথায় যেন উবে যায়, মুখের উপর মৃত্যুকালিমা যেন বিস্তীর্ণ হয়ে যায়, মাথা ভারী হয়ে আসে। তাঁর চেহারাও দেখতে ইচ্ছে করে না, সামান্য কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। কোনও শত্রুকে দেখেও বোধ হয় কারুর এত ক্লান্তি বোধ হয় না। স্বামীর আসার সময় বুকে হাতুড়ি পিটতে থাকে। দু'-এক দিনের জন্যেও স্বামী যদি বিদেশে যান, আমার মনের ওপরকার ভারী বোঝাটা যাদুমন্ত্রবলে কোথায় যেন চলে যায়। আবার হাসতে থাকি, গল্প-গুজব করতে থাকি। জীবনে আবার রং ধরে। আবার তাঁর ফিরে আসার খবর পেলেই চারি দিক অন্ধকার বলে মনে হয়।

মনের অবস্থা কেন যে এমন হয় জানি না! বোধ হয় আমাদের দু'জনের মধ্যে পূর্বজন্মে শত্রুতা ছিল। সে শত্রুতার শোধ নেবার জন্যই তিনি আমাকে বিয়ে করেছেন, আর আমার মনেও জন্মান্তরের সেই পুরোনো ভাব গভীর প্রভাব বিস্তার কোরেছে। নইলে, তাঁকে দেখলেই আমার শরীর রী-রী করে ওঠে কেন? আমাকে দেখলেই বা তাঁর গায়ের জ্বালা সুরু হয় কেন? বিয়ের ইচ্ছাটা না হোলেই হোত! বাপের বাড়ীতে আমি এর চাইতে অনেক সুখেই ছিলাম এবং বোধ হয় জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত থাকতেও পারতাম। কিন্তু তা হোলো কই? বিয়ে! যে সমাজ-প্রথার নামে কত নারীর চোখে জল আসে! কত আশায় ভরা কোমল হৃদয় এই প্রথার চরণতলে নিষ্পেষিত।

স্বামী! নারীর কত কল্পনার ধন! 'স্বামী' কথাটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে আসে, পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তমের, পুরুষ-শ্রেষ্ঠের, সুরূপ মানুষের সজীব মূর্ত্তি। কিন্তু আমার কাছে এই দু'টি অক্ষর কি বাণী বহন করে আনে— হৃদয়ের শূল, দেহের কাঁটা, চোখের জ্বালা, মর্মভেদী বজ্রবাণ।

সুশীলা সব সময় হাসিখুশি! দারিদ্র্যের প্রতি তার কোনও অনুযোগ নেই। তার গয়না নেই, কাপড় নেই। সামান্য একটি ভাড়ার বাড়ী। ঘরের সকল কাজ সে নিজে হাতেই করে। কিন্তু কোনও দিন তাকে কাঁদতে দেখিনি। আমার যদি হাত থাকত তাহ'লে আমার ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তার দারিদ্র্য বদলে নিতাম। হাসতে হাসতে তার স্বামীকে ঘরে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সুশীলার দরিদ্র জীবনের সকল জ্বালা যাদুমন্ত্রে কোথায় চলে যায়। আনন্দে

তার বুক ফুলে উঠে। সে প্রেমালিঙ্গনে কত আনন্দ! কত সুখ। ত্রিলোকের সকল ঐশ্বর্য্য বিলিয়ে দিতে পারে সে-সুখের জন্ত।

আজ নিজেকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।

শুধালাম: আমাকে তুমি বিয়ে করেছিলে কেন?

এই প্রশ্ন দীর্ঘদিন আমার মনে জেগেছে। এত দিন কোন রকমে জোর করে চেপে এসেছি। আজকে পেয়ালা উছলে উঠল।

প্রশ্ন শুনে তিনি হতবুদ্ধির মত চোখে গেলেন, পলায়নের পথ খুঁজতে লাগলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন: ঘর আগলাতে! ঘরের ভার ছেড়ে দিতে। নয়ত কি? ভোগবিলাসের জন্তে। গৃহিণী না হলে ঘর হানাবাড়ী বলে মনে হয়। চাকর-বাকর ঘরের সম্পত্তি ফাঁক করে দিত। যেখানে জিনিস পড়ে থাকত সেখানেই পড়ে থাকত, কেউ তার দেখবার লোক ছিল না।

বুঝতে পারলাম আমাকে আনা হয়েছে ঘরের চৌকি দেবার জন্তে। আমাকে সম্পত্তি রক্ষা কোরতে হবে আর ভাবতে হবে ধন্ত আমার ভাগ্য, এ সকল আমারই। সম্পত্তিই হোলো স্বামীর কাছে মুখ্য, আমি কেবল চৌকিদারণী। এই ঘরে আজই আগুন লাগুক। এত দিন ত এ সব না জেনেই ঘরের কাজ করে এসেছি। হয়ত স্বামী যা চাইতেন ততখানি করতে পারি নি কিন্তু আমার বুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয়ই করেছি।

কিন্তু আজ থেকে আর কোনও জিনিস ছোঁব না, এই দিব্যি করছি। অবশ্য ঘরের চৌকি দেবার জন্তেই পুরুষ স্ত্রীকে ঘরে আনে না, একথা আমার জানা এবং আমার স্বামী আমার ওপর রাগ কোরেই একথা বলেছেন। তবে সুশীলার কথাই ঠিক বলে মনে হয়। খাঁচায় পাখী না দেখলে খাঁচা যেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকে সে রকম ঘরে স্ত্রী না থাকলে আমার স্বামীর কাছে ঘর ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকত। সে জন্তেই তাঁর বিয়ে! স্ত্রীলোকের এই বরাত!

আমার ওপর এত সন্দেহ কেন তাঁর?

যেদিন থেকে আমার কপাল এখানে আমাকে টেনে এনেছে সেদিন থেকে

বরাবর তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে দেখেছি। কিন্তু কেন? একটু চুল বেঁধে বসে থাকলেই বা তাঁর এত ঠোঁট কামড়ান কেন? কোথাও যাওয়া আসা করি না, কারুর সাথে কথাও বলি না, তবু এত সন্দেহ কেন? এ অপমান আমার অসহ্য। আমার আব্রু কি আমার নিজের কাছে প্রিয় নয়? আমাকে এত ছোট কোরে ভাবেন কেন? আমার ওপর সন্দেহ কোরতে তাঁর লজ্জাও করে না? যে লোক কানা সে কাউকে হাসতে দেখলেই ভাবে তাকে নিয়ে সবাই হাসাহাসি কোরছে। বোধ হয় এঁর মনেও এই ধরণের ভুল ধারণা হয়ে গিয়েছে যে আমি তাকে ব্যঙ্গ করছি। নিজের অধিকারের বাইরে কাজ করার ফলে বোধ হয় আমার মনেও এই ধরণের প্রবৃত্তি জেগে যায় ভিক্ষুক রাজসিংহাসনে শান্তিতে ঘুমাতে পারে না। চারিদিকে সে দেখে শত্রু আর শত্রু। মনে হয় সকল বুড়ো বরের বুঝি একই অবস্থা।

সুশীলার কথায় চলেছিলাম দেবদর্শনে। সবাই জানে যে মলিন বেশে রাস্তায় বেরোন মানে নিজেকে হাসির পাত্র করা। হঠাৎ কোথা থেকে সে সময় স্বামী আবির্ভূত হোলেন। তিরস্কারপূর্ণ চোখে আমাকে দেখে তিনি বললেন, এত সজ্জা করে চলেছ কোথায়?

বললাম: একটু ঠাকুর দেখতে চলেছি।

কথাটি শোনা হতে না হতেই রাগতভাবে বললেন: তোমার যাবার কোনও দরকার নেই। যে স্ত্রী স্বামীর সেবা করে না, দেবদর্শনে তার পুণ্য না হয়ে পাপ হয়। আমার কাছ থেকে উড়তে চলেছ? মেয়েছেলেকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

অবর্ণনীয় ক্রোধ আমার চিত্তকে অধিকার কোরল। তৎক্ষণাৎ কাপড় বদলে ফেললাম আমি। পণ করলাম দেবদর্শনে আর কোনও দিন যাবো না। এ সন্দেহের কি কোনও কালে শেষ নেই? ও-কথার জবাব ছিল সেই মুহূর্তে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান, আর দেখা স্বামী কি কোরতে পারেন? কিন্তু কি জানি কেন চেপে গেলাম।

আমি উদাস আর আনমনা হোয়ে থাকলে তাঁর আশ্চর্য্য লাগে। মনে ভাবেন আমি অকৃতজ্ঞ। তাঁর বিচারে তিনি আমাকে বিয়ে কোরে বোধ হয় কৃতার্থ করেছেন। এত সম্পত্তি এত ঐশ্বর্য্যের মালিক হয়ে আমার তাঁর প্রতি বিমুখ না হওয়াই উচিত ছিল। অষ্টপ্রহর তাঁর যশোগান করাই উচিত ছিল। এ-সব কিছু না কোরে আমি উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে

থাকি। কখনও কখনও বেচারার ওপর দয়াও হয়! এ কথা তাঁর জানা নেই যে, নারীজীবনে এমন কিছু আছে, যা হারালে নারীর কাছে স্বর্গও নরকতুল্য হয়ে যায়।

তিন দিন হল স্বামীর অসুখ কোরেছে।

ডাক্তার বলছে জীবনের কোন আশা নেই, নিউমোনিয়া হয়ে গিয়েছে। আমার কিন্তু তাতে কোনও দুশ্চিন্তা নেই। এত নিষ্ঠুর আমি আগে ছিলাম না। কি জানি এখন আমার সে কোমলতা কোথায় চলে গিয়াছে। রোগীর চেহারা দেখে আমার মন আগে কত করুণায় ব্যাকুল হয়ে যেত। কারুর কান্না আমি সইতে পারতাম না। সেই আমিই তিন দিন ধরে আমার পাশের কামরাতে আমার স্বামীর কাতরানি শুনতে পাচ্ছি! কিন্তু চোখের জল ফেলা ত দূরের কথা, একবারও দেখতে যাই না। ভাবি, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা কি? লোকে আমাকে পিশাচিনী বলে বলুক, বলুক কুলটা! কিন্তু এ কথা বলতে আমার লেশমাত্র সঙ্কোচ নেই যে, তাঁর অসুখ দেখে আমার এক ধরণের ঈর্ষাময় আনন্দ বোধ হচ্ছে। আমাকে তিনি কারাবাস দিয়ে রেখেছেন। 'পবিত্র বিবাহ', এ নামে আমি একে অভিহিত করতে চাই না। কারাবাস ছাড়া এ আর কি? এতখানি উদার আমি নই যে, যে আমাকে বন্দী করে রেখেছে তাকে আমি পূজা কোরব, আমাকে যে লাথি মারে তার চরণ চুম্বন কোরব। মনে হল, ঈশ্বর তাঁকে তাঁর পাপের শাস্তি দিচ্ছেন।

এ কথা বলতে আমার কোন সঙ্কোচ নেই যে, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। কারুর গলাতে কোনও মেয়েকে জোর করে ঝুলিয়ে দিলেই কি সে, তাঁর স্ত্রী হয়ে যায়? সেই মিলনই তো সত্যিকার বিবাহ যখন অন্ততঃ একবারও চিত্তে প্রেম জাগে। শুনতে পাচ্ছি স্বামী তাঁর কামরায় পড়ে আমাকে গালমন্দ কোরছেন। রোগের সমস্ত বিষ আমার ওপর ঢেলে দিচ্ছেন, কিন্তু আমার তাতে বয়েই গেল! যার খুসি সে তাঁর সম্পত্তি নিক, ঐশ্বর্য্য নিক, আমার এ সবের কোনও প্রয়োজন নেই।

আজ তিন মাস আমি বিধবা, অন্ততঃ লোকে তাই বলে। যার যা খুশী তাই বলুক, আমি নিজেকে অন্য রকম ভাবি। চুড়ি আমি খুলে ফেলিনি, কেনই বা ফেলব? সীঁথিতে সিঁদুর আগেও দিই নি, এখনও দিই না। বুড়ো বাপের সকল কাজ তাঁর সুপুত্রের হাতে হোল। আমি কাছেই যাইনি! ঘরে আমাকে নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। কেউ আমার মাথার খোঁপা দেখে নাক সেঁটকায়, কেউ আমার গয়না দেখে চোখ মটকায়। আমার কিন্তু কোন চিন্তাই নেই। তাদের জালিয়ে দিতে রং-বেরংয়ের শাড়ী পরি, আরও সাজগোছ করি। আমার সামান্য দুঃখও নেই। আমি তো কারায় বাইরে এসেছি।

ক'দিন হোল সুশীলার ঘরে গিয়েছিলাম। ছোট ঘর। কোনও ঘর সাজাবার জিনিষ নেই, চৌকি পর্যন্ত নেই। সুশীলার কিন্তু কত আনন্দ রয়েছে।

তার আনন্দ দেখে আমার মনেও নানা রকম ইচ্ছা জেগে ওঠে। সে কল্পনাকে কুৎসিত কেন বলব? আমার মন তাকে কুৎসিত বলে না। জীবনে কত রং! চোখ দুটি তার হাসছে, ঠোঁটের ওপর চাপা হাসির খেলা চলেছে, মনের মধ্যে বয়ে চলেছে অনুরাগের সুধাস্রোত।

এ আনন্দ ক্ষণিক হোলেও জীবনকে সফল করে দেয়। সে কথা অনেক দিন কেউ ভুলতে পারে না। সে স্মৃতি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত যথেষ্ট। সে মেজরাবের আঘাতে হৃদয়তন্ত্রী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সুরে কাঁপতে থাকে।

একদিন সুশীলাকে বলি: তোর স্বামী যদি বিদেশে যায়, তাহ'লে তুই কেঁদে কেঁদে মরে যাবি।

গম্ভীর ভাবে সুশীলা উত্তর দিল, না ভাই, মরব না। তাঁর স্মৃতি আমার মনকে আনন্দে রাখবে, যত দিন তিনি বিদেশে থাকুন না কেন?

এই প্রেমই ত আমার কাম্য। এরই জন্য আমার মনে এত ব্যাকুলতা। এমন স্মৃতিই আমি চাই যার দ্বারা আমার হৃদয়ের তার বাজতে থাকবে চিরকাল, যার নেশা আমাকে আজীবন আচ্ছন্ন কোরে থাকবে।

রাত কাটে কেঁদে কেঁদে। মনের মধ্যে কিসের ব্যথা? জীবনের সামনে বন্ধুর পথ। সে পথে রয়েছে অশান্তির ঘূর্ণি হাওয়া। সবুজের শ্যাম সমারোহ কোথায়? ঘর আমাকে চিবিয়ে খাচ্ছে। মন বলছে, পাখীর মত কোথায় উড়ে চলে যাই। ভক্তি-গ্রন্থের দিকে তাকাতে আজকাল আর ইচ্ছে করে না। বেড়াতে যেতেও ভাল লাগে না। মন আমার কি যে চায় আর কি যে চায় না, নিজেই বুঝি না। আমার যা জানা নেই আমার প্রতি অণু-পরমাণুর কাছে কিন্তু তা জানা। নিজের ভাবনাকে প্রকাশ কোরে চলেছি আমি। অন্তরের বেদনায় প্রতি অঙ্গের কি আর্তনাদ। 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।'

চিত্তের চঞ্চলতা আমার সেই স্তরে এসে পৌঁছেচে, যে স্তরে মানুষের নিন্দাতে কোনও লজ্জা বা ভয় থাকে না। যে লোভী স্বার্থপর পিতা-মাতা আমাকে কূয়াতে হাত-পা বেঁধে ফেলে দিয়েছে, যে পাষাণহৃদয় আমার সীঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে, তাদের প্রতি আমার নানা কুচিন্তা জাগতে থাকে। তাদের মুখ আমি পুড়িয়ে দেব। নিজের মুখে কালি দিয়েও তাদের মুখে কালি দেব। নিজের প্রাণ দিয়েও তাদের ফাঁসির ব্যবস্থা কোরব। নারীত্ব এখন আমার অবলুপ্ত। জেগে উঠছে আমার ভীষণ জ্বালা।

ঘরের সবাই ঘুমিয়ে। নিঃশব্দে নীচে নামলাম। দ্বার খুলে বাড়ীর বাইরে আসি। গরমে ব্যাকুল হয়ে কোনও প্রাণী যেন বেরিয়ে খোলা জায়গার দিকে চলেছে। ঘরে বদ্ধ হয়ে যেন আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিলো।

রাস্তায় নিস্তব্ধতা।

সারি সারি দোকান বন্ধ।

হঠাৎ দেখি একটি বুড়ী আসছে এদিকে।

ভয় কাকে বলে কোনও দিন জানিনি।

আমার দিকে বুড়ী এগিয়ে এল। আপাদমস্তক দেখে বললে: কাকে খুঁজছ বাছা?

ব্যঙ্গ করে বললাম: যমকে।

: জীবনের অনেক সুখভোগই তোমার বয়াতে এখনও বাকী আছে। অন্ধকার রাত শেষ হয়েছে, আকাশে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে।

হেসে বললাম: অন্ধকারেও তোমার চোখের এমন তেজ যে, আমার কপালের লেখা পড়ে ফেলচ!

: চোখ দিয়ে পড়ছি না বাছা, বুদ্ধি দিয়ে পড়ছি; পাকা মাথার বুদ্ধি। খারাপ দিন তোমার চলে গিয়েছে, আসছে ভাল দিন। হেসোনা বাছা, এ কাজেই এত বছর আমার গিয়েছে। যে এক দিন ডুবতে যাচ্ছিল সে এই বুড়ীর দৌলতেই আজ ফুলের শয্যায় শুয়ে আছে। এক দিন যে বিষের পেয়ালা খেতে যাচ্ছিল সে আজ দুধের কুল্লি করছে। আমার দ্বারা যদি কোনও অভাগিনীর উপকার হয় সেই জন্তেই আজ এত রাত্রে বেরিয়েছি। কারুর কাছে কিছুর প্রত্যাশী নই আমি। ঈশ্বর যা দিয়েছেন তা আমার ঘরেই আছে। কেবল এই আমার ইচ্ছে কি, যত দূর সম্ভব লোকের উপকার কোরব। আমি লোককে এমন মন্ত্র বলে দিই যার ফলে যার ধনের কামনা তার ধন, যার সন্তান কামনা তার সন্তান লাভ হয়।

আমি বলি: আমার টাকা চাই না, সন্তান চাই না। আমার যা চাই তা দেবার ক্ষমতা নেই।

হাসল বুড়ী। বললে: বাছা, তুমি যা চাইছ তা আমার অজানা নেই। তুমি চাইছ সে জিনিষ যা সংসারের হোলেও স্বর্গীয়, যে জিনিষ দেবতার বরদানের চাইতেও আনন্দপ্রদ। চাইছ তুমি আকাশকুসুম, ডুমুরের ফুল, অমাবস্যার চাঁদ। কিন্তু আমার আছে সেই মন্ত্র যা অসম্ভবও সম্ভব করাতে পারে। প্রেমের পিয়াসী তুমি। তোমাকে আমি চড়িয়ে দিতে পারি প্রেমের তরণীতে। সেই প্রেম-তরণী প্রেম-সাগরের প্রেম-তরঙ্গে নাচতে নাচতে তোমাকে কূলে ভিড়িয়ে দেবে।

উৎকণ্ঠিত হয়ে বললাম: তোমার বাড়ী কোথায় মা?

: নিকটেই বাছা! যদি তুমি যেতে চাও তাহ'লে আদর কোরে নিয়ে যাই।

বৃদ্ধাকে মনে হোলো কোনও স্বর্গের দেবী। তাঁর পিছনে পিছনে আমি চলতে থাকলাম।

হায় রে।

যে বুড়ীকে ভেবেছিলাম স্বর্গের দেবী দেখলাম সে নরকের ডাইনী। আমার শেষ সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। 'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।' ছিলাম স্বচ্ছ প্রেমের পিপাসী, পড়েছি দুর্গন্ধ বিষাক্ত নালাতে। সে দুর্লভ বস্তু আগেও পাইনি, এখনও না। সুশীলার মত আমি সুখ চেয়েছিলাম, বেশ্যার বিকৃত বিষয়-বাসনা নয়। কিন্তু জীবন-পথে একবার ভুল করলে আর ভুল শোধরানো যায় না।

কিন্তু আমার অধঃপতন কার জন্য? এ দোষ আমার নয়! এ দোষ আমার মা-বাপের আর ঐ বৃদ্ধের, যে আমার স্বামী হোতে চেয়েছিল। আমি এ সব লিখতাম না, কিন্তু লিখছি কেবল আমার আত্মকথা শুনে লোকের চোখ ফুটবে বলে।

আবার বলি, নিজ মেয়ের জন্য ধন দেখো না, বিষয় দেখো না, বংশ দেখো না, দেখো কেবল সুপাত্র। উপযুক্ত পাত্রের হাতে যদি মেয়েকে তুলে দিতে না পার তাহ'লে মেয়েকে কুমারী রেখে দাও, বিষ দিয়ে মার, গলা টিপে দাও, কিন্তু কোনও বুড়ো বোব্বলের সঙ্গে তার বিয়ে দিও না। মেয়েছেলে সব কিছু সহ্য কোরতে পারে। সহ্য করতে পারে প্রবলতম দুঃখ, গভীরতম বিপদ। কিন্তু সহ্য করতে পারে না যৌবনের আনন্দমত্ততার কণ্ঠরোধ।

'আমার কথাটি ফুরোলো'।

'এবারের মত বসন্তগত জীবনে'। আর জীবনে আমার কোনও আশা নেই। তবু যে অবস্থা থেকে আমি চলে এসেছি এই জঘন্য অবস্থায়, তার সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন আর আমি চাই না।

পেটেণ্ট মেডিসিন

ফকীরমোহন সেনাপতি (ওড়িয়া গল্প)

গৃহিণীর কড়া হুকুম—রাত্তির ত রাত্তির দিনের বেলাও ঘর থেকে এক পা বাইরে যাওয়া চলবে না। "কোথা যাবে? কি দরকার? যা করবে ঘরে বসে কর। লেখ..পড়·কিন্তু খবরদার বাইরে যাওয়া হবে না।" কর্তার অনেক বলা কওয়ায় হুকুম হয়েছে—সকালে সিকি ঘণ্টা বাড়ীর সামনের রাস্তায় পায়চারি করা চলবে—বেশী দূর যাওয়া চলবে না—কপাট ফাঁক ক'রে তাকালে যেন দেখা যায়।

সকাল প্রায় সাতটা। বাবু চন্দ্রমণি পট্টনায়ক সদর রাস্তায় পায়চারি করছেন। হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন বেশ খানিকটা দূরে একটা লোক দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাঁকে দেখছে। তাঁর দৃষ্টি সেদিকে পড়া মাত্র সে হাত নেড়ে ডাকল। ভাল করে দেখলেন তিনি—ওহো, এতো সেই ভদ্রকের ছোকরাটা। মনে মনে ভারি খুশী হলেন তিনি—কাছে আসার জন্য হাত নেড়ে ইসারা করলেন। নিজেও বাড়ীর দরজার দিকে তাকিয়ে একটু একটু এগিয়ে চললেন। ছোকরার কাছে হাজির হওয়া মাত্রই দরজার দিকে মুখ ক'রে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। ছোকরাটা তাঁর হাতে একটুকরো চিঠি গুঁজে দিয়ে দ্রুত প্রস্থান করল। কিছুক্ষণ তিনি কাগজের টুকরোটা হাতেই চেপে থাকলেন—পড়লেন না। তারপর দরজার কাছে এসে ফাঁক দিয়ে ভাল ক'রে দেখে চিঠিটা পড়লেন তিনি। পড়ার পর টুকরো টুকরো ক'রে বাতাসে উড়িয়ে দিলেন।

বাড়ীর ভিতরে এসে খুব সোহাগভরে, খুব কোমলভাবে, ডাকলেন, "ওগো, ওগো, শুনছ না।—একটু শুনে যাও না।"

ভিতর থেকে মোটা গলা শোনা গেল,—"আহা, আজ যে ভারী প্রেম সম্বোধন। কি ব্যাপার? আমার ত ভারি ভাগ্যি দেখছি—কি বলছ বল?"

কর্তা বললেন, "শুনছ, দিন চার হোল রোজ রাত্তিরে মাথা ঘুরছে·· পেট কন্ কন্ করছে। শরীরটা বড় ঝিম্ ঝিম্ করছে···বড় কষ্ট হচ্ছে, ভারী কষ্ট।"

গৃহিণী বললেন, "হবেই ত। আর একটা প্রেমের ঠেলা আর কি? সেই যে গাঁজা, মদ, চরশ কত ছাইপাঁশ খেয়েছিলে তার ফল। নেশার জ্বালা কি কম? দুনিয়াভোর রোগ ত শরীরে। তিন জায়গায় চাকরি হোল·· গেল। লোকে কত

ছি ছি করছে…কত টাকা উড়ে গেল। তা যা'ক চাকরি, যা'ক টাকা, যা হবার তা হ'ল…এখন শরীরটা ভাল করে সারুক। চার মাস জেগে জেগে একটু ভাল ক'রেছিলাম—নেশাগুলো ছেড়ে একটু ভাল ছিলে—আবার তার কোন্ পুরোনো ফ্যাসাদ সুরু হ'ল।"

চন্দ্রমণিবাবু বললেন,—"না গো না, সে কথা নয়। আজ সকালে মাধব্যাচার্য গণকঠাকুরের সংগে দেখা হ'যেছিল। তিনি আমার কুষ্টি দেখে বললেন, আমার কর্কট রাশির সংগে বৃশ্চিক রাশি শনি-সপ্তম হয়েছে। এটা তারই ফল—কিছু পুণ্য কার্য করলে সব গ্রহদোষ কেটে যাবে।"

গৃহিণী প্রশ্ন করলেন, "কি পুণ্য কাজ করার কথা গণকঠাকুর বললেন ?"

চন্দ্রমণিবাবু উত্তর করলেন, "আমি তিন দিন ধরে ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, উদয়গিরিতে যত মহাদেব আছেন সব দেবতাকে দর্শন করব। কিছু টাকা নিযে ব্রাহ্মণদের দেব, তাতে তাঁরা শত শত হাঁড়ি, না না হাজার কুম্ভ, থুড়ি সহস্র কুম্ভ পূজা করবেন। তাতে সব দোষ, সব গ্রহবৈগুণ্য একেবারে কেটে যাবে। শরীর খুব ভাল হয়ে যাবে আর নেশা-টেশা করার ইচ্ছে হবে না।"

গৃহিণীর মনে একটু সন্দেহের ছায়াপাত হল। বললেন, "গণকঠাকুর এলেন আর আমি জানলাম না।"

কর্তা উত্তর করলেন, "না না তিনি আসেন নি, তাঁর ছেলে এসেছিল।'

গৃহিণী প্রশ্ন করলেন, "তাঁর ছেলে আবার কোত্থেকে এল ?"

কর্তা উত্তর করলেন. "না না, তাঁর চাকরের হাত দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন।"

গৃহিণী কর্তার মুখের দিকে ভাল ক'রে তাকালেন। বুঝলেন সব মিছে কথা। তিন দিনের জন্য বাইরে গিযে মাতালদের সঙ্গে মদ খাবে, নইলে অন্ত কোথায় যাবে। কষ্ট ক'রে একটু ভাল পথে এনেছি, চোখের আড়াল হ'লেই কি ক'রে বসবে। খুব গম্ভীরভাবে বললেন, "না, না, তুমি ভুবনেশ্বর টুবনেশ্বর কোথাও যেতে পারবে না, ঘরে বসে থাক।"

কর্তা বললেন, "ঠিক ! ঠিক কথা ! তিন দিন ধরে বাইরে কোথায় থাকব ? আচ্ছা আমি এক্ষুনি যাচ্ছি, ধবলেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করে সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসব ?"

গৃহিণী বললেন, "না, না, তা হবে না।"

কর্তা বললেন, "আচ্ছা না হবে ত থাক, গোটা কয়েক টাকা দাও, এই কটক শহরেই যত মহাদেব আছেন, সবাইকে পুজো ক'রে আসি।"

গৃহিণী বললেন—"বেশ, মক্রা চাকরটাকে বল, একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আসুক। দুজনে গিয়ে ঠাকুর দর্শন করে পূজো দিয়ে আসি।"

কর্তা নিঃশ্বাস চেপে চলে গেলেন। এক জায়গায় বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। আরে ভাল ফিকির মনে হয়েছে। বাহবা। চমৎকার হবে। "ওগো শুনছ? আমার শরীরটাও ভাল নেই বাইরে বাইরে ঘুরলে রোগে পড়ে যেতে পারি। গণকঠাকুর এ কথাও বলেছেন, "কোথাও না গিয়ে বাড়ীতে বসেই মহাদেবের ধ্যান করলে, সব রোগ সেরে যাবে?"

গৃহিণী প্রশ্ন করলেন, "সে ধ্যান কি রকম?"

: রকম আবার কি? জ্যোতিষে বলেছে পূরো পাঁচ প্রহর কাল—ধর পাঁচ প্রহর থেকে এই রাত নটা পর্যন্ত একটা বড় কম্বলে আপাদ-মস্তক ঢেকে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। তারপর আর কোনও কথা মনে না এনে পৃথিবীর যত ঠাকুর দেবতা আছেন, সবাইকে ধ্যান করতে হবে।"

গৃহিণী প্রশ্ন করলেন, "তাহ'লে সব গ্রহদোষ কেটে যাবে?"

কর্তা মনে মনে খুশী হযে বললেন, "হ্যাঁ, গণকঠাকুর বলেছিলেন, তাহ'লে সব গ্রহশান্তি হবে। তিনি আর একটি কথাও বারে বারে বলে দিয়েছেন। দশটা টাকা ঠাকুরের নামে মানত করে রেখে শরীর সম্পূর্ণ সেরে গেলে সেই টাকায় মাসখানেক বাদে ঠাকুর-পূজা আর ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব ভোজন করাতে হবে।"

গৃহিণী প্রশ্ন করলেন, "আজ কিছু কি খাবে না?'

কর্তা বললেন, "রাম, রাম, ঠাকুর দেবতার ধ্যানের সময কেউ কি কিছু মুখে দেয়? সমস্ত দিন উপোস—এক ফোঁটা জলও না।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে গৃহিণী বললেন, "আচ্ছা, তবে ধ্যান কর।"

কর্তা বললেন, "আর একটা কথা, ধ্যান বাড়ীর মধ্যে হবে না, পবিত্র স্থান দরকার। ঘরে মাছ রান্না হয়, তার ধোঁয়া ঢুকে···অপবিত্র হয়ে গেছে ঘর। অন্য দেবতা নন, একেবারে সাক্ষাৎ হর-পার্বতীর কথা। রাস্তার ধারে বাইরের দিকের ঘরটা, সে ঘরটা নিরালা, সে-ঘরটা পবিত্র। খুব সাবধান। সে ঘরে স্ত্রীলোকের ছায়া পড়লে বা শব্দ শোনা গেলে ধ্যান ব্যর্থ হয়ে যাবে। সাবধান। সেদিকে স্ত্রীলোকের ছায়া যেন না পড়ে···গলাও যেন না শোনা যায়।"

গৃহিণী কর্তার কৃচ্ছ্রসাধনার কথায় ব্যথিত হয়ে বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন। বামুন ঠাকুর এসে প্রশ্ন করল, "আজ কি রান্না হবে?"

গৃহিণী বললেন, "আজ বাবুর উপোস, আমি আর কি খাব? রান্না-বান্না সব বন্ধ।"

ঠাকুর মুচকি হেসে চলে গেল। ভাবল সে গিন্নী-মা বড় অদ্ভুত ধরণের স্ত্রীলোক। স্বামীর উপর ভক্তির সীমা নেই, কর্তার সামান্য অসুখ করলে, নিজে না খেয়ে-দেয়ে দিন-রাত কাছে বসে সেবা করবে। আর রাগলে রক্ষা নেই—সামনে লাঠি পড়ুক, ঝাঁটা পড়ুক যা' হাতে পড়বে তাই নিয়ে মারতে ছুটবে—যা নয় তাই বলে গাল দেবে। তবুও গিন্নী-মা বড় ভাল লোক, বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ, মনও সেই রকম—কেবল সামান্য রাগী আর মুখটা বড় কর্কশ।

ওদিকে কর্তা মক্রা ছোকরাকে বাইরের ঘরে আড়ালে ডেকে খুব আস্তে, খুব নরমভাবে, বললেন, "শোন্, বাবা মকরু, আমার জন্য একটা কাজ করবি? এই কম্বলটা আগাগোড়া ঢাকা দিয়ে চুপ ক'রে কপাটটা ভেজিয়ে শুয়ে থাকবি। রাত একটা নাগাদ আমি ফিরে আসব, ততক্ষণ তুই শুয়ে থাকবি। খবরদার, ঘর থেকে বেরুবি না।"

মক্রা—"আজ্ঞে না, সে আমি পারব না! গিন্নীমা গাল দেবেন, রাগ করবেন।"

কর্তা রাগ করে বললেন, "পাজি, দুষ্টু, ভূত! শুনবি না আমার কথা? মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দেব না?" খানিক পরে বললেন, "না-রে মকরু, নারে, আমি মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছিলাম। দেখ মকরু তুই যে বলেছিলি যে কেন্দ্রাপড়ায় মামার বাড়ী যাবি, বেশ কাল যাবি। চারদিন ছুটি দিলাম। আর এই নে চারটে টাকা, খরচ করবি—আর কাল তোকে একটা কাপড় কিনে দেব।"

ছোকরা আর কোনও কথা না বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপ ক'রে ধ্যানে শুয়ে পড়ল।

এদিকে গৃহিণীর মনে শান্তি নেই। গা ধুয়ে এসে শোবার ঘরে এক খণ্ড আসন পেতে বসলেন। যত ঠাকুরদেবতার নাম মনে পড়ল, কর্তার গ্রহ-শান্তির জন্য সকলের কাছে প্রার্থনা করলেন। পঞ্চামৃত মানলেন ধবলেশ্বর মহাদেবের কাছে। মনে মনে বললেন, 'হে মা কটকের চণ্ডী দেবী, কালীগলির কালী-মা, বাবুর শরীর ভাল করে দাও মা, আমি জোড়া কাল কস্তা শাড়ী, জোড়া কাল পাঁঠা বলি দেব।' এভাবে ঠাকুরদেবতাদের কাছে প্রার্থনায় তিন

প্রহর কেটে গেল। মনে হল—কর্ত্তা ধ্যান থেকে উঠে খাবেন কি? ভাত ত খাবেন না, ফলাহার করবেন নিশ্চয়ই। পাকা কলা, নারকোল, ছানা, দুধ, দই সব সাজিয়ে ঘরে রেখে দিলেন। বারে বারে বাইরের দিকে তাকালেন—আর ঘণ্টা দুই বেলা আছে—দেখতে দেখতে রোদ্দুর উঠে গেল চালের ওপরে। হাতে আর কিছু ঘর-সংসারের কাজ নেই। ঘরে-বাইরে ছটফট করছেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে দরজার দিকে এগুলেন তিনি। কর্ত্তা বলেছেন কোথাও স্ত্রীলোকের ছায়া পড়বে না। নীচের দিকে ভালো করে তাকালেন, না, ছায়া ত পড়েনি। হয়তো মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে পড়বে তাই, মুখে শাড়ীর কাপড়টা গুঁজে নিলেন।

অল্প একটু কপাট ফাঁক ক'রে দিলেন। ঘরের ভিতরটা ভাল দেখা যাচ্ছিল না, অন্ধকার—কর্ত্তা স্থির হয়ে ধ্যানে রয়েছেন। "হায় হায় বাবুর কতই না কষ্ট হচ্ছে! হে ঠাকুর, হে দেবতা, বাবুর শরীর ভাল ক রে দাও। দেবতারা সত্যই আছেন, সত্যই তাঁরা দুঃখীর প্রার্থনা শোনেন, আমি কত প্রার্থনা করলাম—বাবুর নেশা ছাড়িয়ে দাও। মা কালী, বাবুর শরীর ভাল করে দাও, মা। একটা কাল পাঁঠা, আর একটা কাল মোরগ বলি দেব।"

মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বারে বারে প্রণাম করলেন তিনি। তারপর দরজাটা অল্প ফাঁক করে ভেতরে পা বাড়ালেন। অন্ধকারে কম্বল ভাল দেখা যাচ্ছিল না, সরাসরি বাবুর মাথায় পা লাগল। জিভ কামড়ে পিছনে সরে এলেন তিনি। কেঁদে ফেলেন তিনি আকুলভাবে, ছি ছি কি অপরাধই না হয়ে গেল। ঠাকুর-দেবতাদের উদ্দেশ্যে বারে বারে প্রার্থনা করলেন। তারপর ভাল ক'রে তাকিয়ে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। কর্ত্তার জোড়া পায়ে তিন তিনবার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন, করলেন প্রার্থনা। প্রার্থনাকালে কম্বলটা একটু ফাঁক হয়ে গেল। কর্ত্তার পায়ে হাত ঠেকতেই হাত ঘামে ভরে গেল। হায় হায় কর্ত্তা একেবারে ঘামে জবজবে হয়ে গেছেন। শাড়ী দিয়ে পা পিঠ ভাল করে মুছিয়ে দিলেন। মুখ মোছাতে হাত বাড়ালেন এবার। এ কি? হাতে গোঁফ ঠেকল না কেন? এ আবার কি? কর্ত্তার গোঁফ কোথায় গেল? দুবার তিনবার হাত বুলোলেন তিনি···না, গোঁফ ত নেই, গেল কোথায়? ভীষণ সন্দেহ হ'ল তাঁর। কপাটটা ভাল ক'রে ফাঁক ক'রে দিয়ে দেখলেন। ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কম্বলটা। ভীষণ রাগে পিছে হটে গর্জন ক'রে বললেন, "অলপ্পেয়ে,

হারামজাদা, মক্রা, তুই এখানে কি করছিস্ হতভাগা?"

মকরা আর কি বলবে? চোরের মত দেওয়ালের দিকে সরে গিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

গৃহিণী কিছুক্ষণ তর্জন-গর্জন ক'রে ক্লান্ত হ'যে পড়লেন। এছাড়া মনে ভাবলেন গোলমাল করলে ভাল হবে না। আসল কথাটা কি জানতে হবে? মকরাকে হাতে রাখতে হবে। ধীরে ধীরে কোমল কণ্ঠে বললেন, "মকরু, তুই কাল মামার বাড়ী যাবি বলেছিলি, যা কাল যাবি—এই নে চারটে টাকা, রাস্তায় খরচ করবি—খাজা কিনে খাবি। কাল তোকে একটা কাপড় কিনে দেব, পরবি। এখন যা কোন গোলমাল করিসনি, রান্নাঘরের কোণে গিয়ে চুপ করে বসে থাক্‌গে।"

মকরা ভেবেছিল গৃহিণী পিটবেন। কিন্তু তা'র বদলে এ আবার কি? নগদ সঙ্গে সঙ্গে চার টাকা, আবার এক জোড়া কাপড় পাওয়া যাবে। মনে আনন্দ আর ধরে না—কর্তার দেওয়া টাকাগুলো কোমরে গোঁজা ছিল, তা বার করে এই টাকার সঙ্গে মিশিয়ে দুবার তিনবার গুনল। আটটা টাকা ভাল ক'রে কোমরে গুঁজে রান্নাঘরে লুকিয়ে রইল। গৃহিণী এদিকে চুপ করে মকরার জায়গায় ধ্যানে বসে রইলেন কম্বলে আগাগোড়া শরীরটাকে ঢেকে!

গভীর রাত্রে চন্দ্রমণিবাবু আস্তে আস্তে চুপিসাড়ে দরজায় হাজির হলেন। পুরো নেশা। চলতে গেলে পা টলে যাচ্ছে, মুখে শব্দ হচ্ছে আধবোল। দুম ক'রে কপাটটা খুললেন তিনি। মকরা ধ্যানে মগ্ন। ভারী খুশি হয়ে তিনি নেচে নেচে গান ধরলেন—

'বাহবা মজাদার।
গাঁজা মদের গুণ যে জানে
সেইত সমজদার।'

"ওঠ্, ভাই মকরু! সাবাস বাবা মকরু! মেরা দোস্ত মক্রাম! শোন্ মকরু, ওঠ ওঠ্। এবার কোন শা-কে ভয়? তোর খ্যাকশিয়ালী গিন্নীমা দু'মাস আটকে রেখেছিল—মুখ মেরে দিয়েছিল। দুমাসের মজা একদিনে কাবার। আর সে কি আজকের কথা? তার সঙ্গে তিন বছরের দোস্তি—পীরিত। সেই যে গোপালবাবুর বাড়ী নাচতে এসেছিল, সেই দিন থেকে ভাব। সাবাস মজাদার। তার নাম জানিস? তোর গিন্নীমার নাম সুলোচনা…সুল-চুনা। সুল কিনা পুকুরে হয়, আর চুনা চাকলী পিঠে। ছি ছি

কি নোংরা নাম। তার নাম আশমানতারা। জিতে রহ মেরী আশমানতারা। তার নামও যেমন গুণও তেমনি। গুণ ত গুণ আশমানতারা—কি মজাদার! দেখ ত মক্রাম্‌। তার কত বুদ্ধি, কত দয়া। পুরোণো পীরিত ভুলতে পারেনি। কাল সেই কটকে পদার্পণ করেছে অমনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। আমি তাকে দেখে হারানিধি পেলাম—সে ত আনন্দে ঢলে পড়ল। বিছানায় বসেছি কি না লাগল মালের ধুম। সব ঠিকঠাক করে সাজিয়ে রাখা…সব রকম…নেশার জিনিস·· ফুর্তির সব কিছু…সব ঠিক! আগে খোলা হল মদের বোতল। সে ··বাবা তালের রস নয়, আসল বিলিতী নম্বর ওয়ান। গ্লাসে ঢাললে মজা বুঝবি। আমরা দুজন ত সঙ্গে সঙ্গে বোতল খালি ক'রে দিলাম। খালি র, নিছক-র এক ফোঁটা জলের ভেজাল নেই। তোর গিন্নীমা রোজ নিজে তৈরী করে পুরী, সরভাজা, ক্ষীর। আরে ছিঃ, সেগুলো তো বেড়ালে খায়। সে যে ক'রে রেখেছিল নোস্তা ছোলাভাজা, মালের সঙ্গে মজাদার, …দিলাম সাবাড় করে। দে মজাদার। তোর গিন্নীমাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে দশ টাকা নিয়ে গিয়েছিলুম। সে সব ফুর্তির জায়গায় খালি হাতে কি কেউ যায়? তার সামনে টাকা যেই রাখলাম একটু চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল। আমি চতুর ব্যক্তি…তোর গিন্নীমার মত হাবা নই। বুঝলাম পছন্দ হল না। আরে পছন্দ কেমন ক'বে হবে রে? এক রাত্তির মুজরো করলে শত শত টাকা পায়। বলে এসেছি কাল একশ টাকা দেব। সে হেসে বলল, টাকা কি হবে। তুমি আসবে। সত্যি সত্যি·· সে কি টাকা চায়? চায় ফুর্তি। তার কি টাকার অভাব? তা হলেও আমি কেন মিথ্যেবাদী হব। কথা দিয়েছি ত টাকা দিয়েছি। মরদ কী বাত হাতী কা দাঁত। জানিস কাল কোত্থেকে একশ টাকা আনব। হো-হো-হো ভারী মজা। তোর গিন্নীমা লাটকিস্তির টাকা সেই বড় সিন্ধুকে রেখেছে। একটা লোহার কাঁটা দিয়ে সিন্দুকটা খুলে আচ্ছা করে ভোগা দেব। দুতিনবার টাকা সরিয়েছি। তোর গিন্নীমা দূরে থাক তার বাপেও বুঝতে পারবে না। সিন্ধুকে ঢের টাকা রয়েছে। আমার হাতে পড়লে কটকে ফুর্তির বান ডাকিয়ে দিতাম। তোর গিন্নীমা যদি গেলাসে মদ টানত ত বুঝত মজা কত? সে মজা বুঝেছে আশমানতারা। গিন্নী তো কাঠের পুতুল। আজ মালের সঙ্গে এ্যাসা চাট চালিয়েছি। তোর গিন্নীমার বাপ শালাও সাত জন্মে দেখেনি!"

গৃহিণী কম্বলটিকে পাঁচ হাত দূরে ছুঁড়ে লাফিয়ে পড়লেন। ভীষণ

গর্জন করে বল্লেন: "কি বলসি, কি বললি মাতাল মিনসে। আমার বাপ তোর শালা। কিরে…দিনভর কোন চুলোয় ছিলি? হ্যাঁ, কি, আশমানতারা।"

কর্তা ত ভয়ে কাঁটা। চঞ্চল হয়ে বললেন, "না না, আমি কোথাও যাইনি। বাইরে একটু পেচ্ছাব করতে গিয়েছি মাত্র, তুমি রাণী, তোমার মাথা ছুঁয়ে বলছি—"

গৃহিণী ক্রোধে অজ্ঞান। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার মাথায় হাত দিয়ে সাবাড় করার মতলব—"

ঘরে পড়েছিল একটা ঝাঁটা। সেটা তুলে নিয়ে দে মার—দে মার—দে মার। মাথায় পিঠে হাতে যেখানে পড়ুক। সামলাতে পারলেন না কর্তা… দে দৌড়। নেশার ঝোঁকে পা টলমল করছে…ভুম্ করে পড়ে গেলেন তিনি… তার ওপর শিলাবৃষ্টির মত বর্ষণ চলল……

কিছু বাদে ক্লান্ত হয়ে গৃহিণী সাড়ীর ভিতরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রাগ পড়ে এসেছে কিছুটা। চোখের জলের ধারা বয়ে চলল। কেঁদে কেঁদে সব ঠাকুর-দেবতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আমার দেবতা স্বামীকে মেরেছি, বড় অপরাধ করেছি, ক্ষমা কর আমায়…আর আমার স্বামীকে সুবুদ্ধি দাও।

রাতটা কাটল। গৃহিণীর রাগটা পড়ে গেল। ধীরে ধীরে গিয়ে দেখলেন কর্তা মাটিতে পড়ে রয়েছেন। নেশা কেটে গেছে। ভোরের বাতাসে ঘুম এসেছে। নাক ডাকছে। ভাল করে দেখলেন গৃহিণী। পিঠ, হাত, পায়ের জায়গা জায়গা ঝাঁটার ঘায়ে ফুলে গেছে। স্থানে স্থানে রক্ত পড়ে শুকিয়ে গেছে, কালশিরে পড়ে গেছে। দেখে ব্যাকুল কান্নায় ভেঙে পড়লের তিনি। ছি ছি কি কাণ্ড করলাম! স্বামী দেবতাকে ঝাঁটা পেটা করলাম। হায় হায় আমার কি দশা হবে। আর একবার ডাকলেন, ঠাকুর, আমার দোষ ক্ষমা কর। দুচোখ দিয়ে ঝর ঝর জল ঝরছে। গ্যাঁদা পাতার রস ফুলো জায়গায় ঘসে দিলেন, সারা শরীরে বুলিয়ে দিলেন। ঘণ্টা দুয়েক বাদে বাবুর ঘুম ভাঙল। মিটিমিটি চেয়ে দেখলেন গৃহিণী কাছে বসে আছেন। মনে ভীষণ ভয় ঢুকল—কি জানি আবার ঝাঁটা পেটা করবে কি না কে জানে? আর ঘুম নেই, চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলেন। ধীরে ধীরে দেখলেন গৃহিণীর রাগের চিহ্ন নেই। দুচোখ দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে পায়ে তেল

মালিশ করে দিচ্ছেন। গৃহিণী বুঝলেন কর্তার ঘুম ভাঙল। চার ঘড়া জল এনে শোবার জায়গায় রাখলেন। তারপর বাবুর হাত ধরে উঠিয়ে বসালেন। মাথায় দেহে জল ঢেলে ভাল করে স্নান করিয়ে দিলেন। নেশার খোঁয়ারিতে তাঁর শরীরটা জলছিল। জল পড়ে ভারী আরাম হোল। চোখ বুজে ঠাকুরের মত স্থির হয়ে বসে রইলেন। গৃহিণী শুকনো কাপড় পরিয়ে দিলেন। ঠাকুর ভাত দিয়ে গেল। গৃহিণী আস্তে আস্তে দুমুঠো খাওয়ালেন। তারপর ভাল করে বিছানা পেতে কর্তাকে শুইয়ে দিলেন। কাল থেকে গৃহিণীর উপবাস। আজও জল-স্পর্শ নেই। স্বামীর পায়ের তলায় হাত বুলোতে লাগলেন। সমস্ত দিনে চোখের জল শুকোল না। মনে মনে কেবল ঠাকুর-দেবতার কাছে প্রার্থনা— হে প্রভু, আমার দোষ ক্ষমা কর, স্বামীকে সুবুদ্ধি দাও। সারাদিনে স্বামী স্ত্রী কারোর মুখে কোনও কথা নেই, ঘরে ঝি-চাকর পর্যন্ত চুপচাপ। স্বামী স্ত্রী কেউ কারোর মুখের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছেন না। পরস্পর আপন আপন দোষ মনে করে পরস্পরকে সাধ্যানুসারে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছেন। কর্তার মনে দৃঢ় সঙ্কল্প আজ হতে সব নেশা গোরক্ত—বিষ্ঠা।

দুমাস গেল, চারমাস গেল, ছমাসও কেটে গেল। আত্মীয় প্রতিবেশী বন্ধুবান্ধব সবাই দেখলেন চন্দ্রমণিবাবুর যে বাড়ীতে সকাল সন্ধ্যায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি লেগেই থাকত সেখানে কিছু গোলমাল নেই। দুজন এক জায়গায় বসে হেসে হেসে কথাবার্তা কইছেন, বই পড়ছেন। 'উৎকল সাহিত্য', 'মুকুর', 'দীপিকা', খবরের কাগজ নিয়ে দুজনে মশগুল। কর্তা হ্যাণ্ডনোটে বিস্তর টাকা দেনা করে বসেছিলেন, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আধাআধি শোধ হয়ে গেল। কর্তা ঘর হ'তে বেরোন না—নাচ-গানের নেমন্তন্ন এলে, গৃহিণী বললে বা পেড়াপেড়ি করলেও কোথাও যাওয়া নেই। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় দুজনে ঘোড়ার গাড়ী চেপে শহর বেড়িয়ে আসেন।

শহরের লোক বন্ধুবান্ধব দেখে শুনে আশ্চর্য। আরে কি ব্যাপার! কর্তার পিতা জমিদার শ্যামবাবু মাষ্টার রেখে ছেলেকে পড়িয়েছিলেন। স্কুলেও বিদ্যাভ্যাস হয়েছিল। কিন্তু এত পড়ার ফল কি হয়েছিল? কুসঙ্গে পড়ে ভারী নেশাখোর হয়ে গেলেন। কেবল রাত-দিন বদখেয়াল, চরিত্র উচ্ছন্নে গেল— রাত্তির বেলা খারাপ জায়গায় ঘোরাঘুরি—যত মাতাল দুলোকের সঙ্গ। পাঁচজন ভাল লোক বলেছিলেন, ছেলের বিয়ে হলে চরিত্র শুধরে যাবে। রামকৃষ্ণবাবুর পরমা সুন্দরী গুণবতী কন্যা দেখে জমিদার শ্যামবাবু তাকে পুত্রবধূ ক'রে

এনেছিলেন। কিন্তু কোথায় কি? ছেলে শুধরোলো না। ঘরের টাকা চুরি করে উড়িয়ে দেওয়া, পাঁচ টাকার দেনা করে কুড়ি টাকার হ্যাণ্ড নোট লিখে দেওয়া—এসব চলতে লাগল। এদিকে বাড়ীর কথা, জমিদারীর কথা, কিছুই খেয়াল নেই। শ্যামবাবু দেখলেন আর হবার নয়, কুলাঙ্গারটা সব বিষয়-সম্পত্তি উড়িয়ে দেবে। পুত্রবধূ শ্রীমতী সুলোচনা দেবীর নামে স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলেন। বাবা কত বোঝালেন, কিছুতেই কিছু হল না।

সেই লোক হঠাৎ রাতারাতি বদলে গেল কি করে?

গোপীবাবু রসিক লোক। তিনি হেসে হেসে বললেন, সে রাত্তিরে গিন্নী যে ঝাঁটা বৃষ্টি করেছিল এটা তারই ফল। নেশা, বদখেয়াল, যত উৎকট রোগ, ঝাঁটপেটা ওষুধে সব রোগ ছাড়ে।

শ্যামধনবাবু হেসে হেসে বললেন, আয়ুর্বেদ বা ডাক্তারী বইয়েতে এ রোগে এ ওষুধের ত কোথাও ব্যবস্থা নেই।

গোপীবাবু বললেন—অবে তুমি বুঝলে না এটা গিন্নীর আবিষ্কার—পেটেণ্ট মেডিসিন।

পূর্ব দুষ্কৃতির ফলে যদি কোনও সুন্দরীর 'উঁন' অর্থাৎ 'স্বামি' এই ধরণের রোগগ্রস্ত হন তাহলে লেখকের বিনয়পুরঃসর নিবেদন—এই পেটেণ্ট মেডিসিনটা একবার প্রয়োগ করে দেখবেন।

মূল লেখক—ফকীরমোহন সেনাপতি।

মূল ভাষা ওড়িয়া।

মূল গল্পের নাম -পেটেণ্ট মেডিসিন।

গল্পটি ওড়িয়া হ'তে সরাসরি অনূদিত।

গল্পটি ওড়িয়াতে মৌলিক বলে পরিচিত হ'লেও আসলে এটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কৌতুক নাটিকা 'নিদিন সেন'-এর ওড়িয়া গল্পরূপ। একথা ড সুধাকর চট্টোপাধ্যায়ের "অমর অনুবাদক সত্যেন্দ্রনাথ" (প্রকাশক এ মুখার্জি) গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

সেদিনের গন্ধ বিধুর সুমিরণে

[মূল উর্দু গল্প 'বু' ঃ মূল লেখক ঃ সাদাৎ হোসেন 'মিণ্টো']

[উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত গল্পলেখক সাদাৎ হোসেন "মিণ্টো" তাঁর অপূর্ব "বু" গল্প লিখে অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ভুল বলে স্বীকৃত হয়েছিল। সমালোচকদের মতে গল্পটি অসাধারণ, বিশেষতঃ টেকনিকের বিচারে। মূল 'উর্দু' গল্পটি যে উর্দু গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থে সংকলিত, মিণ্টোর সেই উর্দু গল্প সংকলন গ্রন্থটি আমাকে এনে দিয়েছিলেন আমার এককালীন সহকর্মী ও শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক এ. জে. তায়েব সাহেব। তখন আমি মৌলানা আজাদ কলেজের বাংলার অধ্যাপক আর উনি ইংরাজীর। সে-সময় মূল উর্দু হতে অনুবাদ ক'রে লেখাটা তাঁকে দিয়ে 'ওকে' করিয়ে নিয়েছিলাম। পরে তায়েব সাহেব অধ্যক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ নেই। মাঝখানে আমার মৃত্যু এবং পুনর্জীবনের বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। জোর করে চালানো হৃৎযন্ত্র আর কতদিন সক্রিয় থাকবে জানি না। তাই এই গল্প প্রসঙ্গে "মিণ্টো"র উর্দু গল্প সংগ্রহ গ্রন্থটি দেবার জন্য আমার পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার আগে তায়েব সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেলাম। মূল উর্দুর দু একটি স্থান কিছুটা অশ্লীল মনে হওয়ায় বাংলা অনুবাদে বাদ দিয়েছি। — অনুবাদক : সু.চ.]

* * *

সেদিনও ছিল এমনি বর্ষার। জানালার বাইরে অশ্বত্থ গাছের পাতাগুলো এমনি নাইতে শুরু করেছিল। সেগুন কাঠের ঐ স্প্রিং অলা পালঙ্কে (আজ যা জানলার ধার থেকে একটু দূরে রাখা হয়েছে) একটি মেয়ে রণধীরকে জড়িয়ে শুয়েছিল।

জানলার বাইরে অশ্বত্থগাছের পাতাগুলো রাত্রের দুধলো অন্ধকারে থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে নাইছিল। আর ঘরের ভেতর সেই মেয়েটি রণধীরের সঙ্গে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে জড়িয়েছিল। সন্ধ্যার সময় পর্যন্ত প্রায় সারা দিন এক ইংরেজী কাগজের সব খবর, মায় বিজ্ঞাপন পর্যন্ত, পড়া চুকিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছে তখন ঐ মেয়েটা (যে ফুল বাগানের লাগোয়া

রসুই কারখানাতে কাজ করত) বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য তেঁতুল গাছের তলায় এসে দাঁড়িয়েছিল। রণধীর গলা খাঁখারি দিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তারপর হাতছানি দিয়ে তাকে ওপরে ডাকল।

কদিন ধরে রণধীর নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ বোধ কচ্ছিল। যুদ্ধের জন্য বোধহয় পূর্বে যে সকল মেম সস্তা দামে পাওয়া যেত তারা এখন মেয়েদের অক্জিলিয়ারি ফোর্সে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। অনেকে ঢুকেছিল নাচের ইস্কুলে। যেখানে কেবল ফৌজী গোরাদের প্রবেশাধিকার। এছাড়া রণধীর মনে মনে আর একটি রূপসীর দম্ভের প্রতিশোধ নেবার জন্য আর চাপা ক্ষুধার দাপিতে শ্রমিক মেয়েটাকে ওপরে ডেকেছে। রূপসীটি থাকেন তারই ফ্ল্যাটের নীচে। প্রতিদিন সেজে-গুজে উর্দী পরে আর তাঁর ছাঁটা চুলের উপর খাকী রংয়ের টুপী হেলিয়ে বাইরে বেরিয়ে সে এই মনে করে হাঁটে যে দুধারের পাথকই তাকে খাতির করবে।

রণধীর যখন ঐ শ্রমিক মেয়েটাকে ইসারা করে ওপরে ডেকেছিল তখনও সে ভাবেনি যে তাকে শয্যাসঙ্গিনী করবে। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটির ভিজে কাপড় দেখে মনে হল, হায়রে বেচারীর নিউমোনিয়া হয়ে যেতে পারে।

মেয়েটা তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল; কেন না তার চোখে লজ্জার লালিমা ভেসে এল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে রণধীর যখন তাকে সাদা ধুতি দান ক'রে দিল তখন একটু চিন্তার পর মেয়েটি তার কাশটা খানা খুলল যার ময়লা ভিজে গিয়ে আরও বেড়ে গিয়েছিল। কাশটা খানা খুলে একদিকে রেখে দিল সে, তারপর সাদা ধুতি দিয়ে নিজের জঙ্ঘা দেশ ঢাকল। এরপর সে ধীরে ধীরে তার ফেঁসে যাওয়া চোলীটা খোলার চেষ্টা করল। চোলীটার দুপ্রান্ত জুড়ে সে একটা গেরো বেঁধে রেখেছিল। সেই গেরো তার তপ্ত কোমল ঠেলে ওঠা দুটি বুকের ফাঁকে চেপে বসে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ সে তার খসা নখ দিয়ে গেরোটা খোলার চেষ্টা করল—কিন্তু সে গেরো তখন বৃষ্টির জলে বেজায় শক্ত হয়ে গিয়েছে। ক্লান্ত হয়ে সেই মারাঠী মেয়েটি নিজ ভাষায় যা বলল তার মর্ম হচ্ছে, খুলছে না গেরোটা, এখন কি করি?

তার পাশে গিয়ে বসল রণধীর। তারপর গেরো খোলার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে ক্লান্ত হয়ে হার মেনে এক হাতে চোলীর অপর প্রান্ত ধরে জোরে টান মারল। একদম ফেঁসে গেল গেরোটা। রণধীরের হাত দ্রুতবেগে এদিক ওদিক সরে গেল। আর দুটো থর থর করে কেঁপে ওঠা বুক তার দৃষ্টিগোচর হল।

মুহূর্তে মনে হল কুম্ভকারের দুটি দক্ষ হাতের মত তার চঞ্চল দুটি হাত ঐ মেয়েটার বুকের ওপর নরম নরম মাটির গন্ধে ভরা দুটো পেয়ালা তৈরী করেছে। তার সুগঠিত বুক দুটিতে সেই গড়ন, সেই কোমলতা, সেই ভিজে ঠাণ্ডা-গরম তাপ যা কুমোরের হাতে সদ্য গড়া মাটির কাঁচা বাসনের মধ্যে দেখা যায়। মেটে রংয়ের তার যৌবনশ্রীযুক্ত বুকে কোনও কুঞ্চন নেই। কালো রংযের নিচে যেন আলোর এক ঝলক! অদ্ভুত ও আশ্চর্য এক রংযের ঝলক···যেন চমক হলেও চমক নয়। বুকের ওপর স্তন দুটিকে মনে হল যেন পুকুরের ঘোলা জলের নিচে দুটো জলন্ত প্রদীপ।

এমনই বর্ষার দিন। জানালার বাইরে অশ্বত্থের পাতাগুলো সেদিনও এমনি কাঁপছিল। মেয়েটার দুটো আবরণই জলে ভিজে একটা নোংরা স্তূপের মত ফরাসের ওপর পড়েছিল। সে আবদ্ধ ছিল রণধীরের নিবিড় আলিঙ্গনে। তার নগ্ন আর ময়লা শরীরের সজল উত্তাপ রণধীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করছিল, যে ধরণের প্রতিক্রিয়া হয় কোনও নোংরা টার্কিস বাথে স্নান কালে।

সারা রাত সে রণধীরের নিবিড় মিলনে আবদ্ধ রইল—দুজনে মনে হল এক হয়ে গেছে। হয়ত কখনও দুজনে দু একটি কথা বলেছিল। কিন্তু যা কিছু বলার যা কিছু কওয়ার সে সবই দুজনের শ্বাস, ঠোঁট আর হাতের মাধ্যমেই হচ্ছিল। রণধীরের হাত সারারাত তার বুকের ওপর (বসন্ত) বায়ুস্পর্শের মত ফিরতে লাগল। ছোট ছোট, যৌবনে ভরা বুকের চারপাশে, কালো রংযের বৃত্ত জেগে উঠছিল ঐ বসন্ত বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে। মেয়েটার সারা শরীরের উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ ক্ষণিকের জন্য রণধীরকেও কাঁপিয়ে তুলছিল।

অনেক মেয়ের নরম আর শক্ত বুকের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিয়ে রণধীর এমন অনেক রাত কাটিয়েছে। সে এমন মেয়ের সাথেও রাত কাটিয়েছে যে একেবারে আনাড়ী এবং তাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের সকল কথাই শুনিয়ে দিয়েছে। এমন মেয়ের সাথেও মিলিত হয়েছে যারা সব পরিশ্রম নিজেরাই করেছে—রণধীরকে কোন কষ্ট করতে হয়নি। কিন্তু এই মেয়েটা, যে তেঁতুল তলায় দাঁড়িয়ে ভিজছিল আর যাকে সে হাত ইসারায় ওপরে ডেকেছিল, একেবারে অন্য ধরণের।

সারা রাত তার শরীর থেকে অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য একটা গন্ধ রণধীরের কাছে আসছিল। ভাল ও মন্দ মেশান সেই গন্ধ রণধীর সারা রাত ধরে পান করল।

তার বাহুমূল, বুক, চুল পেট—নানা জায়গা হতে সেই ভাল ও মন্দ গন্ধ রণধীরের নিঃশ্বাসকে আচ্ছন্ন ক'রে দিল।

সারা রাত ধরে সে ভাবল যে ঐ মেয়েটা নিকটে থাকলেও তার মনের এত নিকটে আসতে পারত না যদি না তার শরীর হতে ঐ অদ্ভুত গন্ধ না আসত। সে গন্ধ তার মন-প্রাণের সকল কানায় কানায় ঢুকে গেছে। তার সব পুরানো আর নতুন কল্পনার মধ্যে কাজ করছে। ঐ গন্ধ মেয়েটার সঙ্গে রণধীরকে এক রাত্রের জন্য একাত্ম করে দিয়েছে। উভয়ে উভয়ের মধ্যে মিশে গেছে, মিলে গেছে সেই স্বাদে যা দৈহিক হলেও অমূল্য। ঐ গন্ধ যা ঐ শ্রমিক মেয়েটার অঙ্গ হতে প্রতি মুহূর্তে নির্গত হচ্ছিল তা রণধীর যেন ভাল করেই জানে অথচ তা যেন স্পষ্ট করে বোঝাতে পারে না। মাটির ওপর জল ছিটিয়ে দিলে যেমন সোঁদা সোঁদা গন্ধ বেরোয় অনেকটা সেইরকম, কিন্তু সবটা নয়। তাতে যেন ল্যাভেণ্ডার আর আতরের কৃত্রিমতা নেই। তা একেবারে আসল খাঁটি গন্ধ। স্ত্রী আর পুরুষের দৈহিক মিলনের মত আসল আর অকৃত্রিম। স্বেদ-গন্ধে তীব্র ঘৃণা ছিল রণধীরের। তাই স্নানান্তে সে সুগন্ধি পাউডার দিত দেহে ছড়িয়ে অথবা ব্যবহার করত এমন কিছু যা এ গন্ধনাশক। কিন্তু কি আশ্চর্য সেই রণধীর মেয়েটার বাহুমূলাস্থে চুম্বন করল, আঘ্রাণ করল সেই রোমরাজি। জাগল তার অদ্ভুত অনুভূতি। রণধীরের মনে হোল সে এ গন্ধ জানে, ভাল ভাবেই জানে। কিন্তু এর অর্থ কাউকে জানাতে বা বোঝাতে পারবে না।

বর্ষার দিন রণধীর জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখল অশ্বত্থের পাতাগুলো তেমনি কাঁপতে কাঁপতে নাইতে নেমেছে।·· বর্ষার সেদিন রণধীরের এই কামরায় কেবল একটি সেগুন কাঠের পালঙ্ক ছিল। আজ সেখানে আর একটি পালঙ্ক পড়েছে। কোণে একটি নতুন ড্রেসিং টেবিলও এসেছে। কিন্তু দিনটা সেই রকমই বর্ষার ··বর্ষণও সেই রকম চলেছে। বর্ষার অপরাহ্ন বেলা গড়িয়ে অন্ধকারে তারার মিটমিটে আলো আসছে। আর ভেসে আসছে হেনার আতরের তীব্র গন্ধ।

দ্বিতীয় পালঙ্কটা খালি। এই পালঙ্কে, যেখানে শুয়ে রণধীর জানালার বাইরে অশ্বত্থ পাতার নাচন দেখছে, সেখানে শুয়ে রয়েছে এক সুন্দরী নিজের অনাবৃত শরীর আবরণের কোনও সলজ্জ চেষ্টা না করে। তার লাল রেশমী

শালওয়ার পড়ে আছে অপর পালঙ্কে—লাল টকটকে রং। ঐ পালঙ্কে তার ছাড়া কাপড়খানাও পড়ে আছে। তার সোনালী ফুল ভরা সেমিজ, অঙ্গিয়া, আঙ্গিয়া, দোপট্টা—সব লাল রংয়ের পোষাকে হেনার আতরের তীব্র গন্ধ। তার ঘন কাল চুল লুটিয়ে পড়েছে দেহের উপর। লাল আর কাল রংয়ের বিচিত্র ও অদ্ভুত এক মিলন। তার ধবধবে সাদা বুকের ওপর কাঁচুলির কাঁচা রংয়ের ছাপ। ধবধবে সাদা বুকের মধ্যে একটু নীলাভা। বাহুমূলের প্রান্তশায়ী রোমরাজি দূরীভূত, ফলে সেখানে নীল ধূসরের পরশ।

রণধীর বার কয়েক ঐ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল মনে মনে। মনে হচ্ছিল সে যেন কোনও এক প্যাকিং বাক্স হ'তে বার করেছে তাকে, বই বা চীনে মাটির বাসনের মত। যেমন বইয়ের মধ্যে চাপের দাগ বা চীনে মাটির বাসনে আঁচড়ের আভাস থাকে এই মেয়েটার দেহেও তেমনি ছাপ পড়েছে। যখন রণধীর তার চুস্ত অঙ্গাবরণের গ্রন্থি মোচন করেছিল তখন লক্ষ করেছিল বুকে আর পেটে বলি রেখা আর কসে বাঁধা দড়ির ছাপ। ল্যাকল্যাইন দড়ির দাগ দেখে মনে হয় যেন নখের আঁচড়ে ছুনছাল সরে গেছে।

বর্ষার তেমনই দিন।

অশ্বত্থের নরম নরম সবুজ কোমল পাতার উপর বৃষ্টির টুপুর টুপুর আওয়াজ তেমনি করেই শোনা যায় যেমন শুনেছিল রণধীর আর একটি বরিষণ মুখরিত রাত্রে সর্বক্ষণ।

ভারী চমৎকার আবহাওয়া।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কিন্তু তাতে ভরা রয়েছে হেনার আতরের তীব্র সুগন্ধ।

অনেকক্ষণ ধরে রণধীরের হাত এই সুন্দরীর কাঁচা দুধের মত সাদা রংয়ের বুকের ওপর বাতাসের মত ফিরতে লাগল।

অনুভব করতে লাগল অঙ্গে উত্তেজনার চঞ্চলতা।

অনুভূত হ'ল নরম কোমল শরীরের শিহরণ।

বক্ষে বক্ষ আশ্লেষে রণধীরের প্রতি অঙ্গ মেয়েটির প্রতি অঙ্গের আনন্দধ্বনি শুনতে পেল।

কিন্তু কোথায় সেই উত্তেজনার আহ্বান, যে আহ্বান সে শুনেছিল সেই

মারাঠী শ্রমিক মেয়ের অঙ্গ-গন্ধ ঘ্রাণে ?

কোথায় সেই ধ্বনি যা দুধ পিয়াসী বাচ্চার চাপা কান্নার চেয়ে সহজবোধ্য, যা নিভৃত হৃদয় হতে উত্থিত হয়ে নিঃশব্দ হয়ে গেল।

রণধীর ঝিলিমিলি কাটা জানালার বাইরে তাকিয়েছিল। অদূরে অশ্বত্থের পাতাগুলো নাচছিল। কিন্তু তাদের পাতার নাচন ছাড়িয়ে তা'র দৃষ্টি যেন দূরের কিছু দেখার চেষ্টা করছিল যেখানে ঐ মেঘ মেদুর বর্ষায় এক অদ্ভুত ধোঁয়াটে আলো জ্বলে উঠছিল। সেই আলোয় যেন ভেসে আসছিল মারাঠী মেয়েটার বুকের রূপ। সেই আলো যেন রহস্য কথার ন্যায় গোপন অথচ প্রকাশ্য।

রণধীরের পার্শ্বশায়িনীর শরীর দুধ-ঘি মেলা আ'টার মত নরম।

তার এলায়িত শরীর হতে ভেসে আসছিল হেনার আতরের সুগন্ধ। ভেসে আসছিল সেই সুগন্ধ ক্ষণে ক্ষণে যেন শ্বাসরোধ করে।

সেই সুগন্ধ যেন ঠিক সুগন্ধ নয় কিছু অম্ল মিশ্রিত।

আসলে রণধীরের মনে স্থান নিয়েছে সেই গন্ধ যা সেই মারা'ঠী শ্রমিক মেয়ের শরীর হ'তে বিনা প্রযত্নে উৎসারিত হয়েছিল। সেই গন্ধ যা হেনার আতর অপেক্ষাও মিষ্ট ও নরম। যা এখন আঘ্রাণের প্রয়োজন নেই, কিন্তু যা ঘ্রা'ণের ইন্দ্রিয়কে অভিভূত করে অন্তরতম প্রদেশ অধিকার করেছে।

শেষ চেষ্টা করে রণধীর ঐ মেয়েটির দুধালো শরীরের ওপর হাত রাখল, কিন্তু তাতে কোনও শিহরণ অনুভূত হোলো না। তার নববিবাহিতা যুবতী পত্নী, যে ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে এবং যে বি এ পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেছে ও আপন কলেজের শতেক সহপাঠী যুবকের হৃৎপিণ্ডে দোলা দিয়েছে, রণধীরকে নূতন ভাবাবেগে অধীর করতে পারল না।

রণধীর হেনার চাপা গন্ধের মধ্যে খুঁজে ফিরতে লাগল সেই গন্ধ, যা এমনি এক বর্ষার দিনে জানালার বাইরে অশ্বত্থ পাতার বৃষ্টি স্নানের ক্ষণে এক শ্রমিক মেয়ের ময়লা শরীর হ'তে প্রথম পেয়েছিল।

প্রিয়তমাসু

[মূল ঃ ওড়িয়া গল্প। মূল লেখক ঃ শ্রীসুরেন্দ্র মহান্তি]

[মূল লেখক সু. ম. এবং বাংলা অনুবাদক সু. চ উভয়ের জন্ম '৯২২]

*　　　　•　　　　*

ফ্লপ্, ফ্লপ্…ফ্লপ্। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে দেশলাইয়ের উপর একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে ভূদেব স্বগতোক্তি করছিল। ফ্লপ্, ফ্লপ্, ফ্লপ্… ফ্লপ্! জীবনটা একটা বিরাট ফ্লপ্।

"আমাদের দাবী বাঁচার দাবী" শ্লোগান দিয়ে রাস্তা দিয়ে বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে। "আমাদের দাবী…"

সুমিত্রা ঠিক বলেছিল—"ভূদেব, ছবির দাম শিল্পীর প্রতিভানির্ভর নয়, তা নির্ভর করে বিজ্ঞাপনী প্রচারের উপর। পিকাসো…"

আর্টের সঙ্গে সুমিত্রার ছিল সৌখিন পরিচয়।

অসহিষ্ণু ভাবে ভূদেব সুমিত্রাকে বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, "ফিলিষ্টিন্! সবাই ফিলিষ্টিন তুমিই বা কি করে এই যুগের ফিলিষ্টিন্-বিকৃতি থেকে মুক্ত হবে? শিল্পীর প্রতিভা অপরাজেয়।"

অনেক স্বপ্ন নিয়ে ভূদেব তার পেন্টিংয়ের প্রথম এক্‌জিবিশনের ব্যবস্থা করেছিল সহরের এক আর্ট গ্যালারিতে। সেদিন কফিতে ছিল এক অনাস্বাদিত উত্তেজনা। সিগারেটের ধোঁয়ায় ছিল অনাঘ্রাত সৌরভ। ধোঁয়াটে কফি হাউসের বিষণ্ণ পরিবেশটা পর্যন্ত নবীন আশাবাদে রঙীন হয়ে উঠেছিল।

"কয়েকটা কাগজের আর্ট-ক্রিটিক প্রেস শো দেখে মুগ্ধ। ডক্টর মল্লিককে জান ত সুমিত্রা? বিখ্যাত আর্ট ক্রিটিক। আমার স্টিল লাইফ্ ছবি দেখে খুব প্রশংসা করেছেন। আর—"

"তাদের ককটেল পার্টি দিয়েছিলে নিশ্চয়!"—সুমিত্রা চিরদিন এমনই সিনিক। পদে পদে তার সন্দেহ আর আক্ষেপ।

কিন্তু সুমিত্রার আশঙ্কাই শেষ পর্যন্ত সত্য হল। প্রদর্শনীতে এলেন অনেকে বটে, কিন্তু একটা ছবিও বিক্রী হল না। কেবল সুমিত্রার সেই ন্যুড-ছবিটির জন্য একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুব দর কসাকসি সুরু করেছিলেন। তাঁর দুই গালে মধ্যযুগীয় দাঁড়ি-গোঁফ আর ঘন ঝুলফি চিবুক পর্যন্ত প্রসারিত। ইচ্ছা করলে

সেই ছবিটা চার সংখ্যা বিশিষ্ট দামে বিক্রী হয়ে যেত। ভদ্রলোকের আর্টিষ্টিক রুচি থাক বা না থাক তাঁর ড্রইংরুমের দেওয়ালের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সর্‌রিয়্যালিষ্টিক মুড্‌ ছবি, তাঁর বৈদগ্ধ্যের বিজ্ঞাপন হিসাবে। কিন্তু সে ছবি ভূদেব বিক্রী করে কি ভাবে? সেটা সুমিত্রার ছবি। অবশ্য শত চেষ্টা সত্ত্বেও সুমিত্রা সে ছবির ভিতর নিজেকে আবিষ্কার করতে পারে নি।

সাদাসিধা ব্লাউজ, শায়া আর শাড়ীর সলজ্জ আবরণের অন্তরালে ভূদেব তার মানস দৃষ্টিতে সুমিত্রার যে অঙ্গরেখা কল্পনা করেছিল সে তাকেই সেই ছবির ভিতর কিউবিষ্টিক রেখাতে রূপায়িত করেছিল। কনুয় অস্বাভাবিক ভাবে স্ফীত, যেন দুটি অক্ষত বর্তুল মাংসপেশী। ভূদেব জানে সুমিত্রাকে মডেলের মত সিটিং দিতে বললে সে ব্লাউজের ওপর থেকে শাড়ির আঁচল পর্য্যন্ত সরাত না। ভারী ট্র্যাডিশনাল সুমিত্রা!

কিন্তু সে ছবিটা ভূদেব বিক্রী করে কিভাবে? সেই জন্য সে ছবিটার গায়ে ভূদেব এক খণ্ড স্লিপ সেঁটে দিয়েছিল সোল্ড; তারপর শেষ হল এক্‌জিবিশন। একটা ছবিও বিক্রী হল না। উল্টে প্রদর্শনীর ভাড়া এবং আর্ট সমালোচকেদের জন্য ককটেল পার্টির ব্যবস্থা করতে নিঃশেষ হয়ে গেল ভূদেবের সমস্ত সঞ্চয়। ফ্লপ্‌...ফ্লপ্‌...!

রাস্তায় শোনা যাচ্ছিল তখনও শোভাযাত্রীদের শ্লোগানের প্রতিধ্বনি—"আমাদের দাবী বাঁচার দাবী"...

ঠিক ছিল এক্‌জিবিশন শেষে সুমিত্রাকে নিয়ে ভূদেব অন্ততঃ একমাস সমুদ্র সৈকতে কাটাবে। "দীঘা বড় চীপ,...পুরী বড় ব্লাজে (blasé) ওয়ালটেয়ার বড ডাল্‌, গোপালপুর-অন্‌ বীচ, কেমন?" একটা ট্যুরিষ্ট ম্যাগাজিনে ভূদেব গোপালপুর-অন্‌ বীচ্‌-এর একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিল।

সেদিন সুমিত্রা তার সাংসারিক অভিজ্ঞতা নিয়ে টিপ্পনী করেছিল, "হোটেলগুলো ওখানে ভয়ঙ্কর কষ্ট্‌লী।"

কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ভূদেব বেপরোয়াভাবে উত্তর দিয়েছিল, "কয়েকটা ছবি বিক্রয় হলে পর সে-চিন্তা তোমাকে আর করতে হবে না, মিত্রা। আর আমার এক্‌জিবিশন্‌টার পর তোমাকে জনসন-ঘোষ কোম্পানীর রিসেপ্‌সনিষ্টের কাজটাও না করলে চলবে।"

কফির পেয়ালার ভিতরে তাকিয়ে সুমিত্রার ঠোঁটে ফুটে উঠেছিল সেই

বিষণ্ণ সন্দেহের হাসি, মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারা একটা ক্ষীণ জ্যোৎস্না-রেখা যেন।

"কিন্তু হোটেলগুলো বড় মামুলী—মনে হয় রঙীন খাঁচা। তার থেকে একটা কটেজ হলে ভাল হয়। সমুদ্র সৈকতের নিভৃত নিরালায় একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত কটেজ। আর তার সামনে একটা ঘন ঝাউগাছ।"

ঝাউয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস ভূদেবের কানে আসে কি? ঠিক যেন মনুষ্য হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস। কফি হাউসের কোলাহলের ভেতরেও ঝাউয়ের দীর্ঘশ্বাসের মত সুমিত্রার দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।

এ্যাসট্রের ভিতর সিগারেটের ছাই ঝেড়ে ভূদেব বলল, "তুমি ঠিক বলেছ সুমিত্রা। ঝাউগুলো যেন মানুষের অশরীরী আত্মা।"

কিন্তু সব পরিকল্পনা হল ব্যর্থ। ফুটপাতের ওপর ক্লান্ত পা দুটো টেনে টেনে ভূদেব এগিয়ে চলল লক্ষ্যহীন নিরুদ্দেশ পশ্চিমে। মনে মনে বলতে লাগল, "ফ্লপ্... ফ্লপ্ ফ্লপ্

"আমাদের দাবী বাঁচার দাবী।"

ফুটপাথের ওধারে একটা ব্যাঙ্ক-বাড়ীর দেওয়ালে নকশালপন্থী পোস্টার—"লাল সেলাম।"

ওদিকে ডিলাইট সিনেমার সামনে ম্যাটিনী শোর জন্য সকাল সকাল সুরু হয়ে গেল কিউ। ফুটপাথের ওপর ভিড়ের ঠেলাঠেলি। বিল বোর্ডে আলিঙ্গনাবদ্ধ উলঙ্গ যুগল মূর্তির পটভূমিকায়—"এ নাইট্ টু রিমেম্বার্।" অন্য বিল বোর্ডের উপরিভাগে এক উলঙ্গিনী নারীমূর্তির নিটোল বর্তুল নিতম্ব। দেহের রেখায় অদ্ভুত সিম্ফনি, মাংসলতার মাদক ছন্দ। সুমিত্রার দেহরেখাগুলি কি এমনই বর্তুল? সুমিত্রা বড় ট্র্যাডিশনাল। ন্যুড্ আঁকবার জন্যে ভূদেব অনেক অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার স্টুডিওতে একটা সীটিং-য়েও রাজী হয়নি কখনও।

"এতে লজ্জা করার কি আছে সুমিত্রা? এতে দেহ কোথায়? এতো হচ্ছে পিওর আর্ট।"

প্রতিবারেই সুমিত্রার সেই শেষ উত্তর, "না তাহলে তোমার স্টুডিওতে আর কখনও আসব না ভূদেব।"

আঃ ভারী তো ষ্টুডিও। নিছক ভদ্রতার খাতিরে একটা আদিম গহ্বরের মত অন্ধকূপটাকে সুমিত্রা ষ্টুডিও বলে উল্লেখ করে মাত্র।

ভূদেব ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে চলল নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

একজিবিশন শেষে এক সন্ধ্যায় সুমিত্রা এসেছিল সেই ষ্টুডিওতে।

সুমিত্রা প্রশ্ন করেছিল "তাহলে "কি ঠিক হল? দীঘা, না গোপালপুর-অন্-বীচ?"

একটা সাদা ইজেলের সামনে শূন্য দৃষ্টিতে বসেছিল ভূদেব। তুলিটা প্যালেটের ভিতরে ফেলে দিয়ে সে বলল, "তার চেয়ে বরং চল কফি-হাউসে।"

কফি-হাউসে যাবার কোনও আগ্রহ সুমিত্রার ছিল না সে ক্লান্ত-ভাবে একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে পড়ে বলল, "বরং এখানে ষ্টোভে কফি তৈরী কর ভূদেব।"

ভূদেবের সেই অন্ধকূপ কোণে একটা টেবিলের ওপর ছিল একটা ষ্টোভ ও কফি প্রস্তুতের সরঞ্জাম। কিন্তু কফি ছিল না।

সুমিত্রা বলল, "তাহলে বরং আমাকে একটা সিগারেট দাও ভূদেব।"

ভূদেবের সামনে রাখা আধখোলা সিগারেট প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিল সুমিত্রা, তারপর বেপরোয়া ভাবে দুই ঠোঁটের ভিতর চেপে ধরল। ভূদেব দিয়াশালাই কাঠি জ্বালল সিগারেটে আগুন দেবার জন্য। সুমিত্রা বলল, "তোমার সিগারেট থেকে ধরালেই চলবে।"

কাঠিটা জ্বলতে জ্বলতে পুড়ে গেল।

ভূদেব বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "তুমি সিগারেট ধরেছ না কি?"

সুমিত্রা ধোঁয়া ছেড়ে উত্তর দিল, "না ধরিনি ঠিক, তবে একটু চেষ্টা আর কি?"

সুমিত্রার চোখের দৃষ্টিতে একটা অদ্ভুত সুদূরতা। সব পরিচিত সীমার বাইরে সেই দৃষ্টি প্রসারিত। সুমিত্রাকে যেন নিতান্ত অপরিচিত বলে ভূদেবের মনে হচ্ছিল।

কতক্ষণ নীরবে সিগারেট টানার পর সুমিত্রা বলল, "আমি জানতাম, তোমার একজিবিশনটা হবে মস্ত একটা ফ্লপ্। এ যুগে আর্ট একটা পণ্য। ব্ল্যাক মানি নিষ্কাসনের একটা উপায় মাত্র। নবীন ধনীদের বৈঠকখানা

এবং বাথরুম সাজাবার জন্য এক রকমের ফার্ণিচার। এর মূল্য নিছক বিজ্ঞাপন। অযথা টাকাগুলো নষ্ট করলে ভূদেব। তার চাইতে বরং⋯”

অপরাধীর মত ভূদেব নীরব হইল। সমুদ্র সৈকতনিবাসে অবসর বিনোদনের সেই রঙীন স্বপ্ন সব হাতের মুঠির ভিতর থেকে মুঠোমুঠো বালির মত বেলাভূমিতে ঝরে ঝরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল।

সুমিত্রা বলল, “তাহলে কোথায় যাব আমরা ?⋯ দীঘা, পুরী, গোপালপুর-অন্‌-সীচ্‌, ওয়ালটেয়ার ?”

সুমিত্রা বাঁ হাতের মণি বন্ধে চওড়া ষ্ট্রাপে বাঁধা একটা চৌকো ঘড়িতে সময় দেখে বলল, “আমি এখন উঠি ডার্লিং।”

সুমিত্রার আচরণ, কথাবার্তা, ভঙ্গীতে ছিল এমনই এক অস্বাভাবিকতা যার সঙ্গে ভূদেবের কোনও দিন কখনও কোনও পরিচয় ছিল না!

ভূদেব শুধাল, “কফি ?”

রহস্যাবৃত শূন্য দৃষ্টিতে জানালার বাইরে তাকিয়ে সুমিত্রা উত্তর দিল “অন্য আর এক সন্ধ্যাতে।” তারপর একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বাঁ হাতটা ওপরে উঠিয়ে সুমিত্রা বলল, “বাই বাই।”

সুমিত্রা বাইরে চলে গেল। তাকে যেন পিছন থেকে একটা ভূতে তাড়া করছিল।

ভূদেব অন্যমনস্ক ভাবে সাদা ইজেলের উপরে একটা চারকোল ধরে আঁকবার চেষ্টা করল একটা সমুদ্র সৈকত একটা প্রাচীন পরিত্যক্ত কটেজ!

সেই সন্ধ্যার পর থেকে সুমিত্রার সঙ্গে আর তার সাক্ষাৎ হয়নি। সুমিত্রা যেন হঠাৎই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল।

* *

সুমিত্রাকে একবার টেলিফোন করলে কেমন হয় ? একটা ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরের টেলিফোনের অপরপ্রান্ত হতে জনসন-ঘোষ কোম্পানীর রিসেপসন কাউণ্টার থেকে সুমিত্রার ক্লান্ত অবসন্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, “হ্যালো”। সে যেন ভূদেবকে এড়িয়ে যেতে চাইছে পরিত্রাহি কামনায়। ⋯“আজকাল বড্ড বিজি, সেই জন্যে যেতে পারিনি তোমার ষ্টুডিওতে।”

“সন্ধ্যাগুলো কেমন কাটছে ?”

“বড্ড বোরিং,” সুমিত্রা বলল, “না না তোমার আসার দরকার নেই।

আমার এক বন্ধু মানে বান্ধবী এখন নার্সিংহোমে। তার কাছে প্রতি সন্ধ্যায় যেতে হয়।" (সুমিত্রার গলা যেন শুকিয়ে আসছিল। গ্লাস থেকে এক ঢোক জল খেয়ে সে গলাটা ভিজিয়ে নিল)। "ভূদেব আমি আগামী সপ্তাহ থেকে ছুটি নিচ্ছি।...বাঃ এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে? চেঞ্জের প্রোগ্রাম! তোমাকে ঠিক করতে হবে। দীঘা বড় কমনপ্লেস। ছবি আঁকবার সরঞ্জাম কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবে—ইজেল, প্যালেট, ব্রাশ, পেন্ট... আঃ, ঐসব দুষ্টুমী বন্ধ কর ভূদেব, ভুলে যাচ্ছ এটা অফিস টেলিফোন।

লক্ষ্যহীন পথ-পরিক্রমা।

সময়ের গতিবেগ যেন হঠাৎ কেমন করে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

একটা লাইট-পোষ্টের সিনেমা পোষ্টারে এক উলঙ্গিনী সাস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ভূদেবের দিকে—"এ নাইট টু রিমেম্বার।" আর নকশালী পোষ্টারে টেড়া-বেঁকা অক্ষরে লেখা, "আমাদের দাবী বাঁচার দাবী।"

কিন্তু ভূদেবের সেই ধরণের কোনও রাত্রির স্মৃতি নেই স্মরণ করার। কিংবা বাঁচার অর্থ বুঝতে পারছিল না। তার কাছে সব কিছু মনে হচ্ছিল নিতান্ত এ্যাবসার্ড—উদ্ভট।

নিওন-আলোকিত সন্ধ্যার ট্রাফিকের ভেতর আর একটা লক্ষ্যহীন দিন শেষ হল।

ভূদেব ফিরে যাচ্ছিল তার অন্ধকূপে। সিনেমায় ফার্স্ট শোর জন্য তার আগ্রহ ছিল না। ফার্স্ট শোর দর্শকেরা হলের ভিতরে চলে যাচ্ছিল। লাউঞ্জে উদ্দেশ্যহীনভাবে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা টিকিট পায়নি, অথবা বিল বোর্ডে কিছুটা যৌন চিত্রের ফটোগ্রাফ দেখে তারা নিজেদের অযথা উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল। বিল বোর্ডের ফটোচিত্রগুলি অনাবৃত মৈথুন চিত্র "ফর্ এ্যাডালটস্ ওনলি"!

ভূদেব অন্যমনস্ক ভাবে লাউঞ্জের ভিতরে ঢুকে পড়ল।

হলের ভেতরে থার্ডবেল বাজছিল।

একটা দামী মারসিডিজ গাড়ী ব্রেক কষে থেমে গেল সিনেমা হাউসের সামনে। লাউঞ্জের কাঁচের দরজা ঠেলে ভিতরে এলেন একজন বৃদ্ধ—ড্রেন পাইপ আর ছিটে কাপড়ের বুশ কোট পরে আর দাড়ি গোঁফ প্রসাধিত করে

যেন কম পক্ষে তিরিশ বছর বয়স কমাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন।

ভূদেব একটা কাউন্টারের আড়াল থেকে এগিয়ে গেল।

সঙ্গিনীর কটিদেশে বাহুস্পর্শ করে বৃদ্ধ বললেন, "থার্ড বেল হয়ে গেল··· উই আর লেট্।"

সঙ্গিনী উত্তর দিলেন, "বেটার লেট দ্যান নেভার।" সঙ্গিনীর দুই চোখ আর ঠোঁটে "শেরী" অথবা "ড্রাই মার্টিনী"র আমেজ।

অস্পষ্টভাবে ভূদেবের মনে হল এই ভদ্রলোক সেদিন এক্জিবিশনে সেই ন্যুড্ ছবিটা কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই ছবিটা ভূদেব বিক্রী করত কেমন করে?

ভূদেব দু চোখ মেলে তাঁর সঙ্গিনীর দিকে তাকাল।

চেনা-চেনা মুখ।

ভূদেবের চেতনায় সহসা যেন একটা চাবুকের আঘাত লাগল।

এ যে সুমিত্রা!

কিন্তু সুমিত্রার সেই বেশবাসে তাকে সুমিত্রা বলে চেনার উপায় ছিল না। নাভির ওপরে শাড়ীটা কোন রকমে আলতো ভাবে গোঁজা। নিম্নভাগে প্রায় এক ইঞ্চি অনাবৃত রেখে সুমিত্রা পরেছে হাত কাটা ব্লাউজ। ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ারের ফিতে একসঙ্গে মিশে গেছে।

হাই হিলে ভর দিয়ে দুলে দুলে সিঁড়ির ওপরে উঠছিল সুমিত্রা। সেই বৃদ্ধের কাঁধে নিজের দেহের ভার চাপিয়ে এগিয়ে চলল সুমিত্রা ড্রেস্সারক্লের ব্যালকনির দিকে। *

* [শ্রীসুরেন্দ্র মহান্তি আধুনিক ওড়িয়া সাহিত্যের যুগান্তকারী কথা-সাহিত্যিক। দীর্ঘদিন তিনি পার্লামেন্টের রাজ্যসভা ও লোকসভায় বিশিষ্ট সভ্য ও একাধিক জাতীয় কমিটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতীয় প্রতিনিধি রূপে চীন সফরান্তে "পিকিং ডায়েরী" প্রকাশিত করেন। তাঁর রচনা-সাহিত্য-একাডেমী দ্বারা সম্মানিত। ওড়িয়া ভাষায় আধুনিক কালের ছোট গল্প লেখক ও উপন্যাসকার হিসাবে তাঁর অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। —সুধাকর চট্টোপাধ্যায়]

পূর্ণিমা চন্দ্রের জ্যোৎস্না ধারায়

[মূল উর্দু গল্প। মূল লেখক : কৃশন্ চন্দর্]

[উর্দু গল্প। মূল লেখক কৃশন্ চন্দর্। গল্পগ্রন্থ "অজন্তা সে আগে" (Maulana Azad College Library 844. 3191 K 97A)। গল্পের নাম "পুরে চাঁদ কী রাত"। মূল উর্দু হতে অনুবাদ করার জন্য ১৯৭৬ সালে অনুরোধ করেন মৌলানা আজাদ কলেজের লাইব্রেরীয়ান মহম্মদ ইয়াসিন মহাশয় এবং মূল উর্দু বইটি নিজের নামে ঐ লাইব্রেরী হ'তে গ্রহণ করে আমাকে কিছুদিন ব্যবহার করতে দিয়েছেন ঐ কলেজের ফারসীর অধ্যাপক আমীন সাহেব। তাঁদের দু জনকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।—অনুবাদক : সু. চ.]

*　　　*　　　*

এপ্রিল মাস। বাদাম গাছের ডাল ফুলে ভরা। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া সত্বেও বসন্তের মাধুর্য এসে গেছে। আকাশ ছোঁয়া গাছের নীল দূর্বাঘাসের মখমলের ওপর কোথাও কোথাও বরফের টুকরো সাদা ফুলের মত ফুটে রয়েছে। আগামী মাসের মধ্যে এই সাদা ফুল এই দূর্বাঘাসের মধ্যে হারিয়ে যাবে। তখন ঘাসের রং হয়ে উঠবে ঘন সবুজ। আর বাদাম গাছের শাখায় শাখায় সবুজ সবুজ বাদাম পোখরাজ-মণির মত ঝিকামিক করে উঠবে। নীল পাহাড়ের ওপর থেকে কুয়াশা দূর হয়ে যাবে। এই ঝিলের পুলের ওপারে পায়ে চলা পথ নধর ভেড়াদের আলাপের ভ্যা ভ্যা শব্দে মুখর হয়ে উঠবে। রাখালরা তখন ভেড়ার লোমের তৈরী পুরু শীতবস্ত্র গফার গরমে ঐ আকাশ ছোঁয়া গাছের নীচে আঁকাবাঁকা পথ ধরে গান গাইতে গাইতে চলতে থাকবে।

কিন্তু এখন এপ্রিল মাস। গাছের মধ্যে পাতা মাথা চাড়া দেয়নি। এখনও পাহাড়ের গায়ে বরফের কুয়াশা। এখনও পায়ে চলা পথের বুকে ভেড়ার শব্দ নেই। এখনও সমল ঝিলের ওপরে পদ্ম তার দীপের আলো জ্বালেনি। ঝিলের ঘন সবুজ জল তার গভীরে লুকিয়ে রেখেছে সেই সব লক্ষ রূপের মাধুর্য্য যা বসন্তের আবির্ভাবে সহসা এর উপরে নিষ্পাপ পবিত্র শিশুর হাসির মত ভেসে উঠবে। পুলের কিনারায় কিনারায় বাদাম গাছে আনন্দ সঙ্কেত ঝিকমিক করছে। শীতের শেষ রাত্রে বাদামের ফুল জাগতে থাকে। এপ্রিল, বসন্তের

দূত হ'য়ে, ঝিলের জলে ভাসিয়ে দেয় নৌকো, ফুলের কোমল শিকারা। সেগুলো জলের ওপর বসন্তের প্রতীক্ষায় থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে।

পুলের রেলিং ধরে আমি অনেকক্ষণ প্রতীক্ষারত। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে এল। ঝিলের হাউস বোট চলে গেল খিলানের নিচে দিয়ে দূরে বহুদূরে। শেষে দিগন্তের পটভূমিকায় মনে হ'তে লাগল যেন কাগজের নৌকো, তেমনি অসহায় আর দুর্বল। সন্ধ্যার গোলাপী রং আকাশের দিক হতে দিগন্তে প্রসারিত হ'ল। গোলাপী হ'ল ঘন লাল তার পর ধূসর। পাশের বাদাম গাছের সারির আড়ালে পায়ে চলা পথ শান্ত। রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রথম তারাটি যেন কোন মুসাফিরের গানের মত চমকে উঠল। বাতাসে শীতের তীব্রতা আরও তীব্র হয়ে উঠল। কনকনে ঠাণ্ডায় নাক বন্ধ হবার উপক্রম।

সহসা চাঁদ উঠল।

আর এল সে।

দ্রুত পায়ে চলতে চলতে পায়ে চলা পথের পাবাপার জমিতে দৌড়ে এল সে একেবারে আমার কাছে। আস্তে আস্তে বলল, আঃ।

শ্বাস বইছে দ্রুত তালে। বন্ধ হয়ে যাবার দ্রুতবেগে শ্বাস চলছে। হাতের আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল আমার কাঁধ তারপর মাথা রাখল সেখানে। ওর ঘন কালো চিকন চুলের জঙ্গল আমার জীবনের গভীরে ঘন ছায়া ফেলল। বললাম বিকেল থেকে তোমার অপেক্ষা করছি

হাসল সে। বলল, এখন রাত হয়েছে। কি সুন্দর রাত।

কোমল দুর্বল ছোট হাত আমার অন্য কাঁধের উপর রাখল। মনে হ'ল যেন বাদাম ফুলে ভরা শাখা আমার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ল। অনেকক্ষণ ও রইল চুপ করে। অনেকক্ষণ আমিও চুপ। কি জানি কেন ও হঠাৎ হেসে উঠল আর বলল, বাবা স্থাঁড়ি পথের বাঁক পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছে। বলেছিলাম বড্ড ভয় করছে তাই আজ ত আমার সইয়ের বাড়ী শোবার কথা। শোয়া না জাগার কথা। কারণ বাদামের প্রথম আবির্ভাবের খুশীতে আমরা, সব সইয়েরা, রাতভোর জাগব আর গান গাইব। এইজন্যেই তো বিকেল থেকে তৈরী হচ্ছি এদিকে আসতে। কিন্তু করব কি? ধান পরিষ্কার করতে হ'ল। কালকের ধোয়া কাপড় আগুনের তাতে শুকোতে হল। মা জঙ্গলে গিয়েছিল কাঠ আনতে, ফেরেনি। আর মা না এলে তোমার জন্য মকাইয়ের

ভুট্টা, শুকনো খোবানি আর জরদালু কেমন ক'রে আনি বলত। এই দেখ তোমার জন্ম সব কিছু এনেছি। হায় তুমি মিছে রাগ করে দাঁড়িয়ে আছ। দেখ আমার দিকে…… আমি এসে গেছি। আজ পূর্ণিমা। এস তীরে বাঁধা নৌকাখানা খুলে ঝিলে বেড়াতে যাই।

ও তাকাল আমার চোখের দিকে। আমি দেখলাম ওর প্রেমে ভরা ভীরু চোখে চাঁদের ঝিকিমিকি। সে চাঁদ আমাকে বলছে, চল নৌকো খুলে বেরিয়ে পড় ঝিলের জলে। আজ বাদামের গাছে উৎসবের হলুদ রংয়ে রাঙা আনন্দ সংকেত। আজ ও তোমার জন্ম নিজের সই, বাবা, ছোট বোন, বড় ভাই সবাইকে ধোঁকায় রেখেছে। কেন না আজ পূর্ণিমা। আজ বাদামের গাছ চারদিকে বরফের ফুলে ভরে আমোদের ইসারা করছে। কাশ্মীরের গান ওর বুকের ভেতর (বাচ্চার জন্ম দুধের মত) ভরে উঠেছে। ওর গলায় দেখছ মুক্তোর সুতুলী হার। সে হার ওকে বলছে আজ রাতভোর জাগ। কাশ্মীরে আজ বসন্তের প্রথম রাত্রি। আজ তোমার গলায় কাশ্মীরী সুর ফুটে উঠুক চাঁদনী রাতে জাফরাণ ফুলের মত। পরে নাও আজ লাল সুতুলীর হার।

ওর চোখের তারায় এত কথা চাঁদ দেখছে। সহসা কোন গাছের মধ্যে এক বুলবুল গান গেয়ে উঠল। দূর নৌকোয় জলে উঠল আলো। আকাশ-ছোঁয়া গাছের সারির ওধারে বস্তীতে গানের ধ্বনি উচ্চকিত হল। শোনা গেল উঁচুতে উঠছে গানের সুর, শিশুকণ্ঠের কলধ্বনি, পুরুষের ভারী গলার আওয়াজ আর ছোট ছেলের কান্না। জীবনের চিহ্ন স্বরূপ ছাতের উপর ধোঁয়া উঠল। আর ভেসে এল মাছ আর ভাত আর কলমী শাকের নরম নোন্‌তা স্বাদে ভরা রাত্রির রান্নার গন্ধ। বসন্তের মধু মদির পূর্ণিমা রাত্রি।

আমার রাগ পড়ে গেল। ওর হাত তুলে নিলাম নিজের হাতে। বললাম, চল যাই ঝিলের ওপর……

পুল ছাড়ালাম। পায়ে চলা পথ শেষ হল। বাদাম গাছের সার শেষ। নিচের জমি পার হলাম। এখন আমরা ঝিলের কিনারায় চলেছি। ঝোপে ঝোপে ব্যাঙ ডাকছে। ডাকছে ব্যাঙ আর ঝিঁ ঝিঁ আর ঘাসের পোকা। ওদের একটানা ধ্বনি ঐকতানের রূপ নিয়েছে; রূপ নিয়েছে এক স্বপ্নালু সিম্‌ফনি। ঘুমন্ত ঝিলের বুকে চাঁদের নৌকো নীরব নিস্তব্ধ …হাজার হাজার বছর এমনি প্রেমের প্রতীক্ষায়। তোমার এবং তোমার প্রিয়ার স্মিত হাসির প্রতীক্ষায়। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেমের প্রতীক্ষায়। শুচিশুভ্রা সুন্দরী

পূর্ণিমা রাত্রি যেন কুমারীর অনাবিল দেহের মত পবিত্র প্রেমের প্রতীক্ষারত।

একটা খোবানির গাছের সঙ্গে নৌকো বাঁধা ছিল। গাছটা একেবারে ঝিলের কিনারা থেকে উঠেছে। মাটি সেখানে খুব নরম। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে। ব্যাঙ তান ধরেছে হুএ হুএ হুএ। ঝিলের জল বারবার তীরের চুম্বন চাইছে। বারবার সে চুম্বন শব্দ আমাদের কানে আসছে। দুহাত দিয়ে ওর কোমর জড়িয়ে নিজের বুকের কাছে টেনে আনলাম। ঝিলের জল তীরকে বারবার চুম্বন করছে। আমি প্রথম চুমু খেলাম ওর চোখে আর ঝিলের ওপর লক্ষ পদ্ম যেন পাপড়ি মেলল। তারপর চুমু খেলাম ওর গালে আর নরম হাওয়া যেন মুখর হয়ে গান ধরল। ঠোঁটে ঠোঁট রাখলাম আর লক্ষ মন্দির মসজিদ এবং গীর্জা হ'তে প্রার্থনার সুর শোনা গেল উঁচু হতে উঁচুতে উঠছে। পৃথিবীর ফুল আর আকাশের তারা আর বাতাসে ভেসে আসা হাল্কা মেঘ সব যেন এক সাথে নাচতে শুরু ক'রে দিল। থুত্‌নীর পর ওর ঘাড়ে চুমু দিলাম। ফুটতে ফুটতে পদ্মফুল নিমীলিত হল, গান উঠতে উঠতে কোথায় উধাও হয়ে গেল, নাচ কমতে কমতে থেমে গেল। জেগে উঠল ঐ ব্যাঙের ডাক। ঝিলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে ভেসে এল একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

আস্তে আস্তে নৌকো খুললাম। নৌকোয় বসল সে। বৈঠা হাতে নিয়ে নৌকো বাইতে বাইতে নিয়ে চললাম ঝিলের মাঝখানে। সেখানে নৌকো থেমে গেল। না যায় এদিকে না যায় ওদিকে। বৈঠা তুলে নৌকোর ওপর রাখলাম। ও খুলল পুঁটলী। তার থেকে জরদালু বার ক'রে আমায় দিল। নিজেও খেতে লাগল। শুকনো জরদালু টক আর মিষ্টি। বলল, গত বসন্তের জিনিষ···

আমি খেতে খেতে ওর দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে ও বলল, গত বসন্তে তুমি ছিলে না—

গত বসন্তে আমি ছিলাম না। জরদালুর গাছ সেদিন ফুলে ভরে গিয়েছে। একটু নাড়া দিলেই ডাল থেকে ফুলগুলো মাটিতে মুক্তোর মত ছড়িয়ে পড়ে। সবুজ সবুজ জরদালু, শক্ত আর টক জরদালু, সেদিন নুন আর লঙ্কা সহযোগে খাওয়া, ঝালের চোটে জিভ সী সী করা আর নাকে চোখে জলের ধারাবর্ষণ। গত বসন্তে আমি ছিলাম না। কিন্তু এই সবুজ জরদালু পেকে হলদে হয়েছে, সোনালি হয়েছে, হয়েছে টকটকে লাল। আনন্দের রাঙা প্রতীকের মত ডালে ডালে ঝুলেছে। আর তাদের গাছে দোল খেতে দেখে কত খুশী ভরা চোখ,

নিষ্পাপ চোখ আনন্দে নেচে উঠেছে

গত বসন্তে আমি ছিলাম না। কত সুন্দর হাত সেদিন লাল লাল জরদালু তুলেছে। কত সুন্দর ঠোঁট তাদের তাজা রস চুষেছে। ঘরের ছাতে নিয়ে ও জরদালু শুকুতে দিয়েছে কেননা যখন এই জরদালু যাবে শুকিয়ে, যখন এক বসন্ত যাবে চলে আসবে আর এক বসন্ত, তখন আসব আমি আর এই ফলের মধুর স্বাদে বিভোর হয়ে যাব।

জরদালুর পর শুকনো খোবানি খেলাম। খোবানি প্রথমে খুব মিষ্টি লাগছিল না। কিন্তু মুখের লালায় রসান্বিত হয়ে উঠল তখন মধু আর চিনির স্বাদ পেলাম। বললাম, খুব নরম আর মিষ্টি ত।

একটা খোবানির গুটি দাঁতে কেটে বীজটা আমাকে দিয়ে বলল : খাও। বীজ বাদামের মত মিষ্টি। এমন খোবানি আমি কখনও খাইনি।

সে বলল, আমাদের উঠোনে গাছ হয়েছে। আমাদের এখানে খোবানীর একটিই গাছ। কিন্তু তাতে এমন লাল বড় মিঠে খোবানি হয় যে কি বলব। গত বসন্তে যখন খোবানি পাকল তখন সইয়েরা সব আমাকে চেপে ধরল খোবানি খাওয়াবার জন্য।

ভাবলাম গত বসন্তে আমি ছিলাম না কিন্তু খোবানি গাছ উঠোনে এমনি ভাবেই খাড়া ছিল। গত বসন্তে সে গাছ ভরেছে কচি পাতায়। ক্রমে তার মাঝে কাঁচা খোবানির সবুজ হলুদ কুঁড়ি ধরেছে। খোবানির মধ্যে আঁটি দেখা দিয়েছে। কাঁচা টক খোবানী তখন দুপুরে খাবারের সাথে চাটনীর কাজ দেয়। গত বসন্তে সেদিন আমি যখন ছিলাম না তখন খোবানিতে গুটি ধরেছে। খোবানির রং হাল্কা সোনালী হতে পেরেছে। গুটির মাঝে নরম বীজ জেগে তার স্বাদে সবুজ বাদামকে মাত করেছে। গত বসন্তে আমি ছিলাম না। আর এই লাল খোবানী সুন্দরী গোলাপী কাশ্মীরী কুমারীর রংয়ে রঙিন হয়ে তেমনি কচি আর রসে টুসটুসে হয়েছে। সবুজ সবুজ পাতার থোকায় দোল খেয়েছে চোখের সামনে। আর এদিকে উঠোনে মেয়েরা নাচছে আনন্দে। ছোট ভাই উঠেছে গাছে। খোবানি তুলে ওপর থেকে দিদি আর তার সইয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছে। কি মিষ্ট ছিল সেই গত বসন্তের রসে টুসটুসে খোবানি। খোবানি শেষ করে বার করল সে ভুট্টা। কি সুন্দর সোঁদা গন্ধে ভরা সোনালি সেঁকা ভুট্টা। মুচমুচে সাফ দানায় ঝলমলে মুক্তোর জেল্লা আর স্বাদে মিষ্টতা।

সে বলল, এ হল মিছরি মকাইয়ের ভুট্টা।

"ভারী মিষ্টি"—ভুট্টা খেতে খেতে বললাম।

সে বলল, গত ফসলের জিনিষ ঘড়ায় রাখা ছিল মাকে লুকিয়ে।

আমি একধার থেকে ভুট্টা খেয়ে দানার সারি কিছুটা রেখে দিলাম। ও খেতে সুরু করল ওখান থেকে। পরে আমার জন্য দানার সারি কিছুটা রেখে দিল। এমনি করে আমরা দুজনে একই ভুট্টা খেতে লাগলাম। ভাবলাম এই মিছরি মকাইয়ের ভুট্টা কি মিষ্টি। এ হোল গত ফসলের জিনিষ যখন ও ছিল আর আমি ছিলাম না। যখন ওর বাবা ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে মাটি ফালা ফালা করেছে, বীজ রুয়েছে। মেঘ ঢেলেছে জল। মাটি সবুজ চারাগুলোকে ওপর দিকে তুলে ধরেছে। তার পাশে পাশে ও করেছে নালি। ক্রমে চারা বড় হয়েছে। তার মাথায় ধরেছে মুকুট····· দুলেছে বাতাসে। ও জমিতে এসেছে চারাগাছে সবুজ ভুট্টা দেখতে। সেদিন আমি ছিলাম না, কিন্তু ভুট্টার মাঝে দানা জন্মেছে, দুধেভরা দানা, যার কচি গায়ে নখের আঁচড় লাগলে দুধ বেরিয়ে যায়—এমনি নরম আর কোমল ভুট্টা পৃথিবী তুলে ধরেছে। সেদিন আমি ছিলাম না আর এই ভুট্টা হয়েছে জোয়ান আর তাজা। রসে পাক ধরেছে। পাক ধরেছে আর শক্ত হয়েছে, এমন শক্ত যে নখ লাগলেও কিছু হয় না বরঞ্চ নখ ভাঙবার ভয়। ভুট্টার শুঁড় যা প্রথমে ছিল হলদে, ধীরে ধীরে হয়েছে সোনালী, আর শেষে হয়েছে কালচে। মকাইয়ের ভুট্টার রং জমির রংয়ের মত বাদামী হয়েছে। আমি সেদিন ছিলাম না। খেতে নিড়োবার কাজ হয়েছে, বলদ চষেছে। ভুট্টার থেকে দানা আলাদা হয়েছে। আর ও আপন সাথীদের সাথে প্রেমের গান গেয়েছে। কিছু ভুট্টা লুকিয়ে সেঁকে আলাদা ক'রে রেখেছে। সেদিন আমি ছিলাম না। কিন্তু জগৎ ছিল; সৃষ্টি ছিল; প্রেমের গান ছিল। আগুনে সেঁকা ভুট্টা ছিল। কেবল আমি নেই।

খুশীভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, "আজ পূর্ণিমা। যেন সব কামনাই পূর্ণ। কাল পূর্ণ ছিল না আজ পূর্ণ হয়েছে।" ও ভুট্টা আমার বুকে ঠেকায়। ওর ঠোঁটের গরম গরম নোস্তা স্বাদ এখনও ঐ ভুট্টার গায়ে লেগে রয়েছে।

বললাম, "তোমাকে চুমু খাব।"

সে বলল, "সাবধান! নৌকো ডুবে যাবে।"

শুধালাম, "তো করি কি ?"

সে বলল, "ডুবতে দাও।"

*   *   *   *   *

সেই পূর্ণিমা আমাকে আজ ভোলে নি। আজআমার বয়স সত্তরের কাছাকাছি। ঐ পূর্ণিমা রাত্রের স্মৃতি আমার চেতনায় এমন দাগ রেখেছে যেন মনে হয় "ত কালকের ঘটনা। এমন পবিত্র প্রেম আর কখনও ঘটেনি। ওর জীবনেও বোধ হয় ঘটেনি কোন ইন্দ্রজাল, কোন মায়া সেদিন আমাদের এমন করে এক করে দিল যে ও আর ঘরে ফিরল না। সে রাত্রে বাড়ী থেকে চলে এল আমার সাথে। আমরা দুজনে পাঁচ-ছ দিন প্রেমে বিভোর হ'যে বালক-বালিকার মত এদিক ও'দক জঙ্গলের কিনারে নদী নালার পর আখরোটের ছায়ায় ছায়ায় জীবন ও জগতের সীমানা ছাড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। ঐ ঝিলের কিনারায় এক ছোটো ঘর কিনলাম—আমাদের দুজনের নিরালা নিকেতন। মাস কযেক পর আমাকে শ্রীনগর যেতে হ'ল। বলে গেলাম তিন দিনের দিন ফিরে আসব, তৃতীয় দিনে ফিরে এলাম। দেখি ও এক যুবকের সঙ্গে হেসে কথা কইছে। দুজনে একই রেকাবি থেকে খাবার খাচ্ছে। দুজনে গায়ে গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি, কথায় কথায় হাসাহাসি। আমি ওদের দেখলাম, কিন্তু ওরা আমাকে নজর করল না। নিজেদের আনন্দে এতই বিভোর যে আমাকে লক্ষ্য করল না। ভাবলাম ওর সামনে রয়েছে গত বসন্তের কি তারও আগের কোন বসন্তের প্রেমিক যেদিন আমি ছিলাম না। এমনি কত বসন্ত আসবে। আসবে কত পূর্ণিমা রাত্রি যেদিন প্রেম-কামনা উঠবে উদ্বেল হয়ে মিলনোৎসুক বিরহিণীর সাগ্রহ প্রতীক্ষায় চঞ্চল। আজ ঘরে ঝরা পাতার ক্ষণ, বসন্তের বিদায় ক্ষণ যেমন আসে। এখন আর কাজ কি আমার এখানে। এই ভেবে আমি ওর সাথে দেখা করলাম না। চলে এলাম। চলে এলাম চিরতরে। সে প্রথম বসন্তের সঙ্গে আর কোনও দিন সাক্ষাৎ ঘটেনি। আজ আটচল্লিশ বছর বাদে এসেছি ফিরে। আমার ছেলের সঙ্গে। আমার স্ত্রী পরলোকে। আমার ছেলের স্ত্রীপুত্র এসেছে আমার সঙ্গে। আমরা বেড়াতে বেড়াতে এই সফল ঝিলের কিনারায় এসে পড়েছি। আবার সেই এপ্রিল মাস। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়েছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি বাদাম গাছের সারির দিকে তাকিয়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় উৎসবের শুভ্র প্রতীকে দোলা লাগল। পায়ে চলা পথের ধারে

কোনও পরিচিত পদধ্বনি শোনা গেল না। এক সুন্দরী কুমারী হাতে এক ছোট পুঁটলী ঝুলিয়ে পুলের ওদিকে দ্রুত চলে যাচ্ছে নজরে পড়ল। বুকটা আমার ধক্ করে উঠল। দূর বস্তীতে কোনও গৃহিণী স্বামীকে ডাকছে খাবার জন্য। কোথা থেকে একটা দরজা বন্ধের আওয়াজ। একটা ছেলে কোথায় যেন কাঁদতে কাঁদতে চুপ করে গেল। ছাদ থেকে ধোঁয়া উঠছে। কোথায় যেন গাছের ডালে পাখীর ডানা ঝাপ্‌টানোর শব্দ জেগে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। কোথায় কে যেন গান গাইছে। তার সুর ভাসতে ভাসতে আকাশের সুদূরে হারিয়ে গেল।

পুল পেরিয়ে অগ্রসর হলাম। আমার ছেলের স্ত্রীপুত্র আমার পিছনে আসছে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। এখানে বাদামের সারি শেষ। গাছের নিচে দিয়ে এগিয়ে এলাম ঝিলের কিনারায়। ঐ ত খোবানী গাছ। কিন্তু কত বড় হয়ে গেছে। কিন্তু নৌকো। ঐ ত রয়েছে নৌকো—কিন্তু সেই নৌকো কি? সামনে ঐ ত ত আমার প্রথম বসন্তের ঘর। আমার পূর্ণিমা রাত্রের প্রেম।

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে। বাচ্চাদের আওয়াজ শোনা গেল। কেউ যেন ভারী গলায় গান গাইছে। কেউ যেন কোন বুড়ীকে ধমকে চুপ করিয়ে দিল। ভাবলাম অর্দ্ধেক শতাব্দী হয়ে গেল ঐ ঘর দেখিনি। এখন দেখলে ক্ষতি কি। আমিই ত ঐ ঘর কিনেছিলাম। এখনও ঘরের মালিক আমি। সুতরাং একবার দেখলে ক্ষতি কি? ঘরের ভেতরে পা বাড়ালাম। কি চমৎকার বাচ্চা! এক যুবতী তার স্বামীর জন্য রেকাবিতে খাবার রাখছিল। আমাকে দেখে সে চমকে উঠল। বাচ্চা দুটো ভয়ে বিস্ময়ে চুপ করে গেল। সে বুড়ী এতক্ষণ রাগে গরগর করছিল সে থামের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল: কে তুমি?

বললাম: এ আমার বাড়ী।

সে বলল: তোমার বাপের বাড়ী!

: বাপের নয় আমারই। আটচল্লিশ বছর আগে আমি এ বাড়ী কিনেছি। এবছর এমনি দেখতে এলাম, আপনাদের বার ক'রে দেবার জন্য নয়। এ বাড়ী এখন আপনাদেরই। আম এমনি…

আমি ফিরছিলাম। বুড়ীর আঙুলগুলো থামের ওপর চাপ হয়ে বসল। গভীর শ্বাস নিল সে তারপর বলল, তুমিই তা'হলে এখন এত বছর বাদে কে কাকে চিনতে পারে

কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল থাম আঁকড়ে। আমি নিচের উঠোনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ ও হেসে উঠল আপন মনে। বলল, এস ঘরের সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। দেখ ঐ হ'ল আমার বড় ছেলে। ঐ হল তার থেকে ছোট। ঐ বড় বৌ। এরা আমার নাতি পুতি। নমস্কার কর তোরা। এ আমার স্বামী। শ, শ, শ, ডেকোনা ডেকোনা। পরশু থেকে জ্বরে পড়ে আছে, ঘুমুতে দাও ওকে। কিন্তু তোমাকে কি দিয়ে অভ্যর্থনা করি বলত?

দেওয়ালের ওপর খুঁটিতে টাঙানো মকাইয়ের ছড়ার দিকে তাকালাম, সেঁকা ভুট্টা সোনালী মুক্তোর মত চকচকে দানায় ভরা। দুজনেই মুচকি হাসলাম। সে বলল, আমার অনেক দাঁত পড়ে গেছে। যেগুলো বা আছে সেগুলো কোনও কাজের নয়।

বললাম আমারও সেই অবস্থা। ভুট্টা আজ আর খেতে পারব না। আমাকে ঘরের ভেতর ঢুকতে দেখে আমার সঙ্গীরা সেখানে হাজির হল। খুব হৈ হৈ বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে তাড়াতাড়ি সঙ্গী বেছে নিল। আমরা দুজনে আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম। আস্তে আস্তে ঝিলের ধারে চললাম। সে বলল, আমি তোমার জন্য দু' বছর প্রতীক্ষা করেছি। সেদিন তুমি এলোনা কেন?

: এসেছিলাম। কিন্তু দেখলাম এক যুবক তোমার কাছে ফিরে চলে গেলাম।

: বলছ কি সব?

: হুঁ। তুমি ওর সাথে একই রেকাবি থেকে খাবার খাচ্ছিলে গায়ে গা ঠেকিয়ে।

ও একেবারে চুপ কোরে গেল। তারপর হেসে উঠল জোরে। জোরে জোরে হাসতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, কি হোল?

সে বলল, "আরে ও ত আমার আপন দাদা।" আবার ও জোরে হাসতে লাগল। "সেদিন ও আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। সেদিন তোমার আসার কথা। ও ফিরে যাচ্ছিল আমি ওকে থাকতে বললাম তোমার সাথে দেখা হবে বলে। কিন্তু তুমি আর এলে না।" গম্ভীর হয়ে গেল ও। তারপর বলল "দু বছর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি। তুমি চলে গেলে পেটে এক বাচ্চা দিলেন ভগবান। সেও একবছর বাদে মারা গেল। তারপর আরও চার বছর তোমার পথ চেয়ে রইলাম। কিন্তু তুমি এলে না। শেষে

আমি বিয়ে করলাম।··

দুটো বাচ্চা ঘর থেকে খেলা করতে করতে বেরিয়ে এল। একজন আর একজনকে মকাইয়ের ভুট্টা খাওয়াচ্ছে।

সে বলল : ও আমার ছেলের ছেলে।

আমি বললাম : ও আমার ছেলের মেয়ে।

ওরা দুজনে দৌড়ে দৌড়ে ঝিলের কিনারা ধরে দূরে চলে গেল। জীবনের দুটি সুন্দর চিত্রের দিকে আমরা দুজনে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ও এসে দাঁড়াল আমার কাছে। বলল, আজ তুমি এসেছ আমার ভারী ভাল লাগছে। আমার জীবন ত শেষ হয়ে এল। জীবনের সব আনন্দ আর দুঃখ দেখা শেষ। ঘর ভরা আমার। আর আজ তুমি এলে। আমার আর একটুও খারাপ লাগছে না।

বললাম, আমারও সেই অবস্থা। ভেবেছিলাম সারা জীবন তোমার সঙ্গে দেখা করব না। তাই এত বছর এদিকে কখনও আসিনি। এখন এসে দেখছি একটুও খারাপ লাগছে না।

দুজনে আমরা চুপ ক'রে রইলাম। বাচ্চারা দেখতে দেখতে আমাদের কাছে ফিরে এল। ও আমার পৌত্রীকে কোলে তুলে নিল আমি তুলে নিলাম ওর নাতিকে। ও চুমু খেল আমার নাতিকে আমি ওর পৌত্রীকে। খুশীতে আমরা দুজনে দুজনকে দেখতে লাগলাম। ওর চোখের মণিতে চাঁদ জল জল করছে। আর ঐ চাঁদ আশ্চর্য্য হয়ে খুশী হয়ে বলছে, মানুষ মরে যায় কিন্তু জীবন কিছুতেই মরে না। বসন্ত শেষ হয় আবার দ্বিতীয় বসন্ত আসে। ছোট প্রেম শেষ হয় কিন্তু জীবনের সত্য ও মহান প্রেম চিরন্তন। তোমরা দুজনে গত বসন্তে ছিলে না একত্রে, এ বছর বসন্ত তোমরা দেখছ। আগামী বসন্তে তুমি এখানে থাকবে না। কিন্তু জীবন থাকবে, থাকবে প্রেম, থাকবে যৌবন, থাকবে সৌন্দর্য্য, থাকবে মাধুর্য্য, থাকবে পবিত্রতা।

বাচ্চারা কোল থেকে নেমে পড়ল। ওরা অন্য কোথায় গিয়ে খেলতে চায়। ওরা দৌড়ে দৌড়ে খোবানি গাছের কাছে এগিয়ে গেল ··সেখানে নৌকো রয়েছে বাঁধা।

আমি জিগ্যেস করলাম, ওটা কি সেই গাছ?

মুচকি হেসে ও উত্তর দিল, না, অন্য গাছ।

[পরের গল্পগুলি রহস্য কাহিনী]

অন্তরাল হতে অন্তরালে

বীভৎস দৃশ্য !

অথচ কাল পর্যন্ত এই ঘর, বারান্দা, ছাদের মধ্যে ঐ দেহটি কত সুন্দর··· কত মনোহর ভাবেই না ঘুরে বেড়িয়েছে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে, চোখে কাজল দিয়েছে, কপালে সিঁদুর সিঁদুর টিপ পরেছে। তারপর উদ্দীপক ভাবে জামা আর পাতলা শাড়ী পরে কত গানই না গেয়েছে। কত গান ··কত হাসি···কত 'আরও একটু কাছে বসতে পারো' বলে দুষ্টুমি।

ছবিখানা তাকিয়ে রয়েছে·· মাটিতে শোধা বীভৎস করুণ ঐ দেহটির দিকে।

কি সুন্দর ছবি। দেখে মনে হয় পঁচিশ বছরের তরুণী। সুন্দর স্বাস্থ্য। চোখে মুখে আনন্দের কি উচ্ছ্বাস। এ ছবিটি তোলা হয়েছে বছর তিনেক আগে, যখন ললিতা গ্রামাফোন কোম্পানীতে গান গাইবার জন্য প্রথম কণ্ট্র্যাক্ট পেল। গান গাইত ললিতা···সেই গান শুনেই ত শশধর তলাপাত্র তাকে বিয়ে করেছিল। দেড়শো টাকা মাইনের প্রেসের কম্পোজিটর সেই গান শুনেই মজেছিল। বিনা পণে বিধবা মায়ের গরীব মেয়ে উদ্ধার পেয়েছিল। আর সেই গানই উদ্ধার করল শশধর তলাপাত্রকে বস্তির অন্ধকার ঘর থেকে কারনানী ম্যানসনের পাঁচতলার আকাশছোঁয়া ফ্ল্যাটে, যার মাসিক ভাড়া মাত্র পাঁচশ টাকা।

অবশ্য এর জন্য শশধর তলাপাত্র কম পরিশ্রম বা ত্যাগ স্বীকার করেনি। নানা জলসায় তার স্ত্রীকে দিয়ে গান গাইয়েছিল, নানা গাইয়ের সঙ্গে তাকে মিশতে দিয়েছিল। প্রথম প্রথম সেই গান বাজনার মাখামাখিতে ললিতাও আপত্তি করত·· শশধরের বুকের ভেতরটা কি রকম জ্বালা করত। কিন্তু ললিতা কিছুদিন বাদেই টাকা আনতে সুরু করেছিল নানা জলসার কল্যাণে। আর শশধর ধরেছিল তরল নেশা। গভীরতর জ্বালায় বুকের জ্বালাটা চাপা দেবার জন্য।

মাঝে মাঝে মাথায় খুন চেপে যেত·· স্ত্রীর ওপর অকথ্য অত্যাচার করত। কিন্তু সেই মাঝে মাঝে ঐ রকম স্বামী স্বামী ভাবটা ছাড়া বাকী সময় সে দোকান যেত, বাজার যেত, চা করত, স্ত্রীর বন্ধুদের জন্য খাবার আনত, প্লেট ধুত। আর

যখন কোনও বড় গাইয়ে আসতেন তখন হয়ত তাকেই যেতে হত বিলিতি নেশার দোকানে। তারপর সোডা, বরফ, পান—সে সব ত আনতে যেতেই হত। আসবার সময় গলার শব্দ করে ঘরে ঢুকতে হত। তবুও অনেকদিন খুব ভারী ভারী মুরুব্বিরা ললিতার নিকট হতে খুব দূরে সরে বসতেন না। বিশেষ করে যেদিন সুরেলা কোম্পানীর ডিরেক্টার সুরেন নিয়োগী মহাশয় তাঁর বিরাট গাড়ীটা চড়ে আসতেন সেদিন শশধর তলাপাত্রকে বাইরে সিনেমা দেখতে যেতে হত। অবশ্য সে-সিনেমা দেখার পয়সাটা তিনিই দিতেন।

যেদিন প্রথম প্রৌঢ় সুরেনবাবু আসেন সেদিন আড়ালে গিয়ে ললিতাই বলেছিল, দেখ, তোমার সামনে গান গাইবার কন্ট্রাক্ট করতে গেলে সুরেনবাবু একটু বিরক্ত হতে পারেন। মনে করবেন সাক্ষী-সাবুদ রেখে তাঁকে আইনের প্যাঁচে ফেলবার চেষ্টা করছি।

বেশত বেশ ত ··আমি না থাকলে তোমাদের কণ্ট্যাক্ট করার সুবিধে হয়—

কণ্ট্যাক্ট নয়, কন্ট্রাক্ট···

ঐ একই কথা। তা তোমাদের ঐ কার্যটি করতে কতক্ষণ সময় লাগবে? ঘণ্টা খানেকের মধ্যে হয়ে যাবে? আমি না হয় পার্কে গিয়ে বসে থাকব···

বারে, তুমি কষ্ট করে পার্কে বসে থাকবে, আর আমার তা ভাল লাগবে? সে হয় না। তার চেয়ে তুমি নাইট শোতে সিনেমায় একটা ভাল বই দেখে এস না।

হাসল শশধর। বলল, মানে তুমি সাড়ে আটটা থেকে বারোটা অবধি ঘরে বসে থিয়েটার করতে পার···

ছি, ছি, কি বলছ। এই দেখ উনি আমাদের জন্ম পাস দিয়েছেন। তা আমি ত আর যেতে পারছি না।

শশধর পাসটা দেখল। বুঝল পাস মানে পুশ।

প্রৌঢ় সুরেনবাবু ভদ্রলোক। ললিতার গলা তাঁর ভাল লাগল। সুরেলা কোম্পানীর ডিরেক্টর হিসেবে তিনি ললিতাকে কেবল গান গাইবার সুযোগ দিলেন না মোটা টাকাও পাইয়ে দিলেন। তারপর তিনিই এই বিরাট ফ্ল্যাটের ব্যবস্থা করে দিলেন। ললিতা এখন মস্ত গাইয়ে·· শিল্পী

কিন্তু হঠাৎ এসব কি হয়ে গেল?

শশধরের মাথাটা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। সামনের দেয়ালের ছবিটা ভারী সুন্দর কিন্তু মেঝের উপর যে মেয়েটি পড়ে আছে? তার চোখ দুটো ঠিকরে

বেরিয়ে আসছে · মুখ চোখ বীভৎস যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেছে। তার গলায় জড়ানো মাফলারের মত তারই গামছা

ললিতা স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রয়েছে।

পুলিসের ধমকানিতে শশধরের চেতনা ফিরে এল ঘরের মধ্যে এত পুলিশ কেন? থানার ইনস্পেক্টার তাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি ললিত দেবীর স্বামী·· শশধর তলাপাত্র?

আজ্ঞে হাঁ।

কাল রাত্তিরে কখন বাড়ী আসেন?

আজ্ঞে টাইম ঠিক মনে নেই। দশটাও হতে পারে এগারোটাও হতে পারে·

খুব মদ খেয়েছিলেন বুঝি

মদ!

আর ন্যাকা সাজতে হবেনা·· গা দিয়ে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে। ছিঃ অতবড় আর্টিষ্টের আপনি স্বামী।

শশধর, ময়লা কাপড় পরা শশধর, দুর্গন্ধ শরীরযুক্ত শশধর মাথা নিচু করে রইল।

ইনস্পেক্টার আবার হুমকি দিলেন, ফিরে এসে কি দেখলেন। জ্ঞান ছিল?

ছিল। কিন্তু না থাকলেই ভাল হত—

কেন?

ঘরের মধ্যে ললিতা শুয়েছিল খাটে আর—শশধর চুপ করল.

আর কি।

সুরেনবাবু তাকে আদর করছিলেন আমি এলাম দুজনের কেউ কিছু গ্রাহ্যই করল না।

সুরেনবাবু কে?

শশধর পরিচয় দিল। সুরেন রেকর্ড কোম্পানীর ডিরেক্টার। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি শরীরের বাঁধুনি দেখে মনে হয় না এত বয়স হয়েছে সৌম্যদর্শন মানুষ। বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র আছে সে বাড়ী শশধর দূর থেকে দেখে এসেছে বিরাট বাড়ী · রাজপ্রাসাদ।

সুরেনবাবু আপনার স্ত্রীকে আদর করছে দেখে আপনি বুঝি আর রাগ

সামলাতে পারলেন না।

আপনি আপনার স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় দেখলে কি করতেন?

চুপ করুন। আপনি কি করলেন বলুন।

রাগে সর্বশরীর জ্বলে গেল।

ঝাঁপিয়ে পড়লেন ললিতা দেবীর ওপর…

না, চোখ নামিয়ে নিলাম। কি হবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওরা দুজন, আমি একা। তা' ছাড়া এ ত কোনও নতুন ঘটনা নয়। ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পায়চারি করলাম। ললিতা ডাকতে ঘরের মধ্যে এলাম।

কি বললেন ললিতা দেবী?

ঠিক কথাগুলো মনে নেই। তবে বলল বোধহয় আমি নেশার ঝোঁকে কি দেখতে কি দেখেছি।

আপনি কি করলেন?

ভেতরে এলাম। ললিত সুরেনবাবুর সামনে আমায় আদর করল, মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। নিজের হাতে এক গ্লাস হুইস্কি খাইয়ে দিল।

নিজের হাতে…

অদ্ভুত তার টেষ্ট! সুরেনবাবু উঠে পড়লেন আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন। আমার কি রকম নেশার ঝোঁক হচ্ছিল। ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়লাম। সুরেনবাবুর বললেন, ঘুম পাচ্ছে, আলোটা নিভিয়ে দাও ললিতা।

আলো নিভিয়ে দিল ললিতা।

তারপর…

রাগে আমার সর্ব শরীর জ্বলে যাচ্ছিল। ঘরের আলো নিবিয়ে ওরা পালঙ্কে হাসাহাসি করছে। চিৎকার করে বললাম, খুন করে ফেলব।

তারপর…

আমার চিৎকার শুনতে পেয়েছিল পাশের ঘর থেকে সৌরভি। সে ছুটে ঘরে এল।

সৌরভি কে?

আমাদের রাত দিনের লোক। রান্না করে। থাকে পাশের ঘরে। সৌরভি আসতে ঘরে কে যেন আলো জ্বালল? সৌরভিকে দেখলাম। সে কি যেন জিজ্ঞেস করল। সুরেনবাবু কি যেন বললেন। আমার মনে হোল সুরেনবাবুকে

খুন করি। তারপর ভাবলাম, আমার কাছে ললিতার অপরাধ সবচেয়ে বেশী। তাকেই খুন করা উচিত। তখনই চিন্তা করলাম, আমার জন্তুই সব গণ্ডগোল। আমারই পাপ সব চেয়ে বেশী···আমারই জ্বালা সবচেয়ে বেশী। চোঁ চোঁ করে আর এক গ্লাস খেয়ে মনে হল—আগে নিজে আত্মহত্যা করব। তারপর ললিতাকে মেরে ফেলব।

সেটি কি করে সম্ভব···

নেশার ঝোঁকে সেটি অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল না।

তারপর···

আমার অবস্থা দেখে ললিতা মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। আমার ভীষণ রাগ বাড়তে লাগল। তারপর কি যে হোল আমার মনে নেই। সকাল বেলা ঘুম ভাঙতে দেখি এই বীভৎস দৃশ্য!

শশধর দুহাতে মুখ ঢাকল।

ইনস্পেক্টার ডেকে পাঠালেন সৌরভিকে। মাঝবয়সী মহিলা। রান্নার কাজ করে বটে কিন্তু দেখে মনে হলো ভদ্র ঘরের বিধবা। সে শশধরের কথাই এক রকম পুনরাবৃত্তি করল। জবাবন্দী গ্রহণের পর ইনস্পেক্টার আরও দু-একটি প্রশ্ন করতে একটি বিস্ময়কর সংবাদ পাওয়া গেল।

ইনস্পেক্টার প্রশ্ন করলেন: সুরেনবাবু, ললিতা দেবী, শশধরবাবু আর তুমি ছাড়া ঘরে তখন কেউ ছিল?

না।

শশধরবাবু ইজিচেয়ার থেকে উঠবার চেষ্টা করছিলেন।

না, নেশার ঝোঁকে বলেছিলেন, খুন করব, খুন করব। আমি বললাম ভুল বকছেন। দিদিমণি মাথায় হাত বুলোতে দাদাবাবু দেখি আরও আঁকু পাঁকু করছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমি বেরিয়ে এলাম।

তারপর?

সুরেনবাবুর বোধ হয় রাগ হয়েছিল। মস্করায় বাগড়া পড়েছে। আমি বাইরে আসতেই ভেতর থেকে ঘরের দোরে হুড়কো দিয়ে দিল।

তুমি ঘরে চলে এলে?

বটেই ত? আমার ইজ্জত নেই।

ইনস্পেক্টার এবার কঠোর ভাবে প্রশ্ন করলেন: বাজে কথা বলছ কেন?

তুমি ঘরে ফিরে যাওনি। তুমি কেন, কোনও মেয়েছেলেই ঘরে ফিরে ঘুমুতে পারবে না এ অবস্থায়। তুমি দরজায় উঁকি ঝুঁকি দেবার বা কান পেতে শোনার চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই।

সৌরভি চুপ করে রইল।

কি দেখলে, ব কি শুনলে।

হা কপাল, ঘর যে আবার আঁধার করে দিল। কিছু কি দেখার জো ছিল।

তবে কি শুনলে···

কিছু শুনতেও পেলাম না।

কিছু না।

না, না, শুনলাম দুজনে গ্রামোফোন বাজানো সুরু করল। সে আওয়াজে আর কিছু শুনতে পেলুম কই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করতে লাগল। আধঘণ্টা হবে বোধ হয়। ক্লটকের ঘড়িতে বারোটা বাজল। আমি ঘরে শুতে যাচ্ছি। সুরেনবাবু ঘর থেকে খিল খুললেন। বাইরে বেরুলেন তিনি।

ইনস্পেক্টার প্রশ্ন করল : একা বেরুলেন ?

সৌরভি একটু চিন্তা করে বলল : হাঁা, একাই ত। অত মাণি গণ্যি লোক। অন্য দিন দিদিমণি বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসেন। আমি তাজ্জব হয়েছি দেখে সুরেনবাবু বললেন, সৌরভি, তোমার দিদিমণি খুব কাঁদছে। মনে বড় দুঃখু হয়েছে। বলছে ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব, আত্মহত্যা করব। আমি বাইরে থেকে শেকল তুলে দিচ্ছি। তুমি এখন খুলো না। কি জানি ঝোঁকের মাথায় কি করে বসে। আমিও ভাবলুম ঠিক ত। বড় জানাজানি হয়ে গেল। কি জানি কি করে। সুরেনবাবু বাইরে থেকে ছিটকিনি তুলে দিলেন।

তারপর···

বাবু নিজের ঘড়ি দেখলেন। তারপর বললেন, বারোটা বেজে গেল। সৌরোভি তুমি আমাকে একটি লবঙ্গ দিতে পার।আমি ভাঁড়ার ঘর থেকে লবঙ্গ আনতে যাচ্ছি হঠাৎ ঘরের ভেতর থেকে একটা ভীষণ চিৎকার শোনা গেল।

চিৎকার ? ললিতা দেবীর চিৎকার ? তুমি ছাড়া আর কে শুনতে পেল ?

মুরারি। সে তখন পাঁচতলায় লিফটা উঠিয়ে আনছে। সে শুনতে পেল।

চিৎকারটা কি শুনলে ?

ঠিক কথা বুঝতে পারিনি। কেন না আমার মন তখন লবঙ্গর দিকে ছিল।

আর সুরেনবাবু তখন পাঁচতলায় লিফটের বেলটা টিপে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই ভীষণ শব্দে শরীরের সব রক্ত যেন জল হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি দিদিমণির ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। সুরেনবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন। বললেন, দরজা খুলো না। কি হয়েছে আমি জিজ্ঞাসা করছি। সুরেনবাবুর বোধ হয় দেরী হয়ে যাচ্ছিল হাতের ঘড়িটা আর একবার দেখলেন।

চিৎকার শুনে কেউ হাত-ঘড়ি দেখে নাকি ?

সুরেনবাবু হাত ঘড়ি দেখে দরজার বাইরে থেকে জোরে জোরে দিদিমণির নাম ধরে ডাকলেন। দুবার ডাকাতে কোনও উত্তর পেলেন না। লিফটের মুরারি তখন লিফট ছেড়ে কাছে এসে পড়েছে। সুরেনবাবু আবার বললেন, ললিতা কি হয়েছে শীগগির বল ?

তারপর ?

ঘরের ভেতর থেকে দিদিমণির গলা শুনতে পেলাম।

পরিষ্কার শুনতে পেলে।

থতমত খেয়ে সৌরভি বলল, মুরারিও শুনেছে।

ইনস্পেক্টার লিফটম্যান মুরারিকে ডাকালেন। বললেন, কাল রাত্তিরে বারোটার সময় তুমি লিফট নিয়ে উপরে উঠেছিলে।

আজ্ঞে হাঁ। বারোটা তখন বেজে গেছে। ললিতাদিদির ঘরের পাশেই লিফট আসে। সুরেনবাবু কল দিয়েছিলেন।

তুমি কোনও শব্দ শুনতে পেয়েছিলে ?

আজ্ঞে হাঁ। প্রথমবার শুনতে পেয়ে ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। তারপর দেখি, সুরেনবাবু আর সৌরভি ললিতাদিদির ঘরের সামনে ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি লিফট ছেড়ে দরজার সামনে দাঁড়ালাম। সুরেনবাবু তখনও বলছেন, ললিতা কি হয়েছে শীগগির বল। ঘরের মধ্যে থেকে দিদিমণি বললেন, কে সুরেনবাবু? আপনি এখনও বাড়ি যান নি। বাড়ি যান। আমি ভাল আছি। মিছিমিছি ভয় পেয়েছিলাম। আপনি বাড়ি যান।

তারপর ?

সুরেনবাবু তখনও ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আমাকে বললেন, বারোটা বেজে গেছে, না।

ইনস্পেক্টর বিস্মিত ভাবে বললেন, সুরেন বাবুর নিজের কাছেই ত ঘড়ি ছিল।

হ্যাঁ খুব দামী ঘড়ি। তবু কি জানি কেন বাবু ঐ কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি ঘড়ি দেখলাম। বারোটা বেজে দশ মিনিট। তারপর সুরেনবাবু লিফটে করে নিচে নেমে এলেন।

সৌরভি চুপ করেছিল। এবার আবার মুখ খুলল, আজ সকালে শেকল খুলে দরজা ধাক্কা দিয়ে দেখি দিদিমণি মাটিতে পড়ে আছে। আর দাদাবাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে চা নিয়ে গিয়ে এগিয়ে দেখি বীভৎস কাণ্ড। দিদিমণির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে যাচ্ছে। হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়ে গেছল বলে। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলাম। আমার কান্নায় নিচের লোকেরা ছুটে এল। তারাই পুলিশে খবর দিল। দাদাবাবু তখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছেন।

ইনস্পেক্টার জবাবনন্দী নিয়ে সই করিয়ে নিলেন। আদেশ দিলেন ডেডবডি কেউ যেন না ছোঁয়। পুলিশ পাহারা রইল ঘরের দরজায়। কেউ ঢুকতে পাবে না। এরপর ইনস্পেক্টার শশধরকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে থানায় যেতে। মুখ শুকিয়ে শশধর বলল, আমি সত্যিই কিছু জানি না।

॥ ২ ॥

থানায় ডেপুটি কমিশনার গিয়েছিলেন কি একটা কাজে। সঙ্গে ছিল, সুনন্দ। তাঁর ছোট বেলার বন্ধু। এখন প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ। বন্ধুদের পথ ভিন্ন হলেও স্নেহ শ্রদ্ধার অভাব নেই। শশধরকে নিয়ে ইনস্পেক্টার আসতে থানার আসর গরম হয়ে উঠল। কেসটা শুনে ডেপুটি কমিশনার মন্তব্য করলেন, সোজা কেস।

সুনন্দ তখন জবানবন্দীগুলো পড়ছিলো মন দিয়ে। সে কোনও মন্তব্য করল না। হঠাৎ তার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। কয়েকটা জায়গায় তার কি রকম খটকা লাগছে। শশধরকে নিজের হাতে ললিতা হুইস্কির গ্লাস দিতে শশধর তার টেষ্ট অদ্ভুত বলল কেন। হঠাৎ তার ঘুম আসতে লাগল কেন? সুরেনবাবুই বা শশধরের ঘুম পাচ্ছে বলে আলোটা নিভিয়ে দিলেন কেন? শশধর বলেছে, অন্ধকারে তারা হাসাহাসি করেছে। সুরেনবাবু বলেছেন সৌরভির কাছে যে, দিদিমণির মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। সে আত্মহত্যা করতে পারে। তাই বাইরে থেকে শেকল দিয়ে দিয়েছেন। যে অন্ধকারে স্বামীর পাশে অন্যলোককে নিয়ে হাসাহাসি করছে তার কিসের মন খারাপ।

শশধরের কথা মিথ্যে হলেও সৌরভির আড়ি পাতা মিথ্যে নয়। সে শুনেছে, ঘরের মধ্যে গ্রামোফোন বাজান হচ্ছিল। গভীর দুঃখের সময় গ্রামোফোন কেউ শুনতে পারে? আবার শশধরের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে গ্রামোফোন বাজানোর বা কি কারণ? ঘরের মধ্যে স্ত্রীকে নিয়ে হৈ হৈ হচ্ছে গ্রামোফোন বাজছে—এ অবস্থায় শশধর ঘুমোতে পারে কি স্বাভাবিক অবস্থায়। তবে কি ঘুমটা স্বাভাবিক নয়। সৌরভি বলছে, সকাল পর্যন্ত শশধর ইজি চেয়ারে অকাতরে ঘুমিয়ে। যদি শশধর রাত্রে ললিতাকে খুন করে থাকে তাহলে ইজি চেয়ারে অঘোরে ঘুমুতে পারবে কি? শশধরের পক্ষে ললিতাকে খুন করবার যথেষ্ট কারণ আছে কি? সে তো এই ধরণের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। সে আঘাত পেতে পারে কিন্তু খুন করতে পারে কি? আর খুন করতে পারলেও ঘরের মধ্যে আরাম কেদারায় ঘুমিয়ে থাকবে ধরা দেবার জন্য তাই না কি করে সম্ভব। তবে কি শশধরের গ্লাসে কোনও ঘুমের ওষুধ মেশান ছিল। সুনন্দ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, গ্লাসটা পরীক্ষা করাতে হবে।

ডেপুটি কমিশনার আনন্দ মুখার্জি তার দিকে জিজ্ঞাসু ভাবে তাকালেন। সুনন্দ তাঁকে তার সন্দেহের কথা খুলে বলল। হাসলেন আনন্দ মুখার্জি। বললেন, মাথা খারাপ। তবু যখন বলছ, ব্যবস্থা করছি।

হঠাৎ থানার ফোনটা বেজে উঠল। রিসিভারটা কানে তুলে চমকে উঠলেন থানার ও, সি। তারপর বললেন: ড. সি নর্থ এসেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করছি। আপনি আসুন।

আনন্দ মুখার্জি মুখ তুললেন। প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার?

ও সি কথা বললেন. সুরেলা রেকর্ড কোম্পানীর সুরেন নিয়োগী ফোন করছিলেন। বললেন, একটা জরুরী ব্যাপারে তিনি এখানে আসতে চান।

সুরেন নিয়োগী? আশ্চর্য—সুনন্দ বিড় বিড় করে উঠল।

শশধর তলাপাত্র তখনও সেখানে উপস্থিত। সুনন্দ তাকাল তার দিকে। মুখটা তার ভয়ে শুকিয়ে গেছে। কিন্তু চোখ মুখ বেশ ফুলো ফুলো। রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল শশধরের? সুরেন নিয়োগী এলেন। উস্কোখুস্কো মুখ। চোখ দুটি লাল। মুখে কেমন ধরনের বর্বরতা। রাত্রে ঘুম হয়নি নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন?

সুরেন নিয়োগী মহাশয় সকালে ললিতাকে ফোন করেছিলেন…পুলিশ তাঁকে জানিয়েছে ললিতা খুন হয়েছে। তিনি ব্যাপার কি জানার জন্য স্বয়ং থানায় এসেছেন?

ও. সি. তাঁকে প্রশ্ন করলেন, কাল কত রাত্রি পর্যন্ত ওখানে ছিলেন ?

বারোটা দশ পনের অবধি।

তারপর ?

তারপর গাড়ী নিয়ে রাস্তায় বেরুই। একটু বেশী মাত্রায় নেশা হয়েছিল। গাড়িটা একটা ফুটপাথের ওপর উঠে পড়ে। ভাগ্যিস তখন ফুটপাথে বেশী লোক ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ পুলিশ ছুটে এসে গাড়ির নম্বর নেয়। উত্তেজিত জনতা ঘিরে ধরে। অনেক কথা কওয়ায় প্রায় একঘণ্টা বাদে লোকজন আবার গাড়ি নামিয়ে, বাড়ি যেতে বলে।

কোথায় এই ঘটনা ঘটে ?

চৌরঙ্গীর মোড়ে।

সুনন্দর মাথায় হিসেব খেলে যায়। বারোটা দশ থেকে দেড়টা অবধি সুরেনবাবু উত্তেজিত জনতা ও ট্রাফিক পুলিশের নজরবন্দী অবস্থায় ছিলেন। তার মধ্যে ললিতার কামরায় ফিরে গিয়ে খুন করা সম্ভব নয়।

ও. সি. কে পাশের কামরায় ডেকে নিয়ে গেল একজন ইন্‌স্পেক্টার। খানিক বাদে সুনন্দকে ডেকে পাঠালেন তিনি। ডাক্তার প্রাথমিক পরীক্ষা করে মৃত্যুর সময় জানিয়েছে। এখনও অবশ্য ময়না তদন্ত করা হয়নি। তবু ডাক্তার এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ললিতা দেবীর মৃত্যু হয়েছে রাত্রি বারোটার কাছাকাছি সময়ে।

সুনন্দ প্রশ্ন করে, ললিতা দেবী আত্মহত্যা করেছেন মনে হয় ?

না, ডাক্তার জানিয়েছে, মার্ডার। ললিতা নিজের গলায় দু'দিক থেকে গামছা টেনে আত্মহত্যা করতে পারে না। আর শেষ পর্যন্ত গামছা টেনে রাখতে পারলেও, হাত দুটো গামছার দুই প্রান্তে মুষ্টিবদ্ধ হয়ে থাকত। ললিতাকে খুব কাছ থেকে মার্ডার করা হয়েছে। শশধরকে এইবার চালান করতে বলি। তার আগে তাকে একবার দেখে আসি চল।

সুনন্দকে নিয়ে ডেপুটি কমিশনার চললেন। আশ্চর্য··ঘরের মধ্যেকার বেঞ্চিতে বসে পড়ে শশধর দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঢুলছে।

সুরেন নিয়োগীর এজাহার নেওয়া শেষ হয়েছে। এবার ও. সি. আনন্দ মুখার্জিকে বললেন, সুরেনবাবু, একবার ললিতা দেবীর ঘরে ঢুকতে চাইছেন।

বেশ ত ব্যাপারটা চুকে যাক।

সুরেনবাবু এবার নিজেই কথা বললেন, দেখুন, ললিতার কাছে আমার

কোনও চিঠিপত্র থাকতে পারে। আমি স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘর করি। সেই সব চিঠিপত্র থেকে পাবলিক স্ক্যাণ্ডাল হোক, আমার ঘর সংসার ভেঙ্গে যাক— এটা নিশ্চয়ই আপনারা চান না। দয়া করে একবার অনুমতি দিন—

গম্ভীর গলায় আনন্দ মুখার্জি বললেন, আমরা নিরুপায় মিষ্টার নিয়োগী। এটা মার্ডার কেস…

কে ললিতাকে মার্ডার করবে? আমি?

কি করে বলব সে কথা। বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ত আপনি লোক চক্ষুর সামনেই ছিলেন।

তবে?

বিশেষ করে আপনি যখন ঘর থেকে চলে আসেন তখনও ললিতা দেবীর কণ্ঠস্বর বাইরে থেকে শোনা গেছে।

তাহ'লে আমাকে সন্দেহ করার কোন কারণ আছে কি?

এইবার সুনন্দ কথা বলল, আপনার কাল রাত্রিরে ভাল ঘুম হয়নি?

কে বলল? দুটোর সময় বাড়ী ফিরেছি। সে সময় থেকে নেশার ঝোঁকে একেবারে গভীর ঘুমে ঘুমিয়েছি। কেন, আমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার রাত্রিরে ঘুম হয় নি নাকি?

সুনন্দ কোনও কথা বলল না।

পরেরদিন আনন্দ মুখার্জির কাছ থেকে জোর আহ্বান পেল সুনন্দ। বিকেল বেলা দেখা হোল দুজনের। আনন্দ মুখার্জিকে বিশেষ উত্তেজিত দেখা গেল। সুনন্দকে দেখে বললেন, দুটো জিনিস জানা গেছে সুনন্দ।

কি দুটো?

প্রথমত শশধর যে গ্লাসের পানীয় খেয়েছিল তার মধ্যে তীব্র ঘুমের ওষুধ ছিল। গ্লাসের মধ্যে তার চিহ্ন রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত ললিতা দেবীর কয়েকটা চিঠিপত্র আমাদের হাতে এসেছে। একটা চিঠি অনেক কাটাকুটি করে খসড়া করেছিলেন! সেটা খুব জরুরী। তার মধ্যে তিনি সুরেন নিয়োগীকে মারাত্মক ভয় দেখিয়েছেন। বলেছেন, সুরেনবাবু তাকে ভালবাসেন ত দেবী গ্রামোফোন কোম্পানীর আর্টিস্ট করে রেখেছেন কেন। তাঁকে ত একটা অংশ দান করতে পারেন স্বচ্ছন্দে।

এতে ভয় দেখানোর কি হলো? এ ত ভিক্ষা।

না কেবল ভিক্ষা নয়। পত্রের শেষ দিকে লিখেছেন, সুরেনবাবু যদি তাঁর

প্রস্তাবে রাজী না হন, তাহলে তিনি সুরেনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। সঙ্গে নিয়ে যাবেন তাঁকে লেখা সুরেনবাবুর কয়েকটা চিঠি।

সুনন্দ চুপ করে রইল।

শশধর যদি ওষুধের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তাহলে তার পক্ষে খুন করা কি সম্ভব হয়? অপর পক্ষে শশধর হয়ত বুঝতে পেরেছিল যে তাকে ঘুম পাড়িয়ে তার স্ত্রী অপরের সঙ্গে স্ফূর্তি করবে। তাই সে ঘুমের ভাণ করেছিল। সুরেন নিয়োগী যাওয়া মাত্রেই সে তাকে হত্যা করেছে কিন্তু তাই বা কেন সে করবে? সে তো নতুন কোনও আঘাত পেল না। সুতরাং ললিতাকে খুন করার উত্তেজনাটা সেদিন শশধরের ক্ষেত্রে তীব্র আকার ধারণ করেনি মনে করা অসঙ্গত নয়। তাছাড়া সুরেন নিয়োগীর পক্ষে ললিতাকে হত্যা করার যথেষ্ট কারণ আছে। তার ঘর সংসার স্ত্রীপুত্র ব্যবসা সব কেড়ে নিতে চলেছে ললিতা। মৃত্যুতে লাভের সম্ভাবনা সুরেন নিয়োগীর সব চেয়ে বেশী অর্থাৎ শশধর হত্যাকারী হলে ক্রোধের হত্যা। সুরেন নিয়োগী হলে লাভের হত্যা। শশধর দু-একবার রাগ করে ললিতাকে মার ধোর কম করেনি সুরেন নিয়োগী পাকা ব্যবসাদার, লাভলোকসানের হিসাব তার রক্তের মধ্যে। এছাড়া ললিতাকে বাঁচিয়ে রাখা তার সাংসারিক সুখ শান্তির পক্ষে পরম ক্ষতিকর।

কিন্তু সুরেন নিয়োগীর পক্ষে হত্যা করা কি ভাবে সম্ভব? সে যখন ঘর থেকে বেরিয়েছিল তখনও ললিতা জীবিত।

তবে?

সুনন্দ বলল, চল একবার ললিতা দেবীর ফ্ল্যাটটা দেখে আসি।

আনন্দ মুখার্জি বললেন, পুলিশ তন্ন তন্ন করে দেখেছে।

তা হোক… চল।

ললিতা দেবীর ফ্ল্যাটের বাইরে পুলিস। ফ্ল্যাটের ভিতরে কামরার বাইরে পুলিস। ডেপুটি কমিশনারকে দেখে মস্ত সেলাম ঠুকল তারা। ঘরের মধ্যে ঢুকল সুনন্দ। আনন্দ মুখার্জি একবার উঁকি মেরে চেয়ারে বসলেন। সুনন্দ কোন জিনিষ দেখতে এসেছে সে নিজেই জানে না। ঘরের মধ্যে ছড়ানো কাগজপত্র, দেয়ালের ওপর টাঙানো ললিতা দেবীর ছবি। একপাশে, ললিতা ও শশধরের ছবি। অপর পাশে ললিতা ও সুরেন নিয়োগীর ঘেঁসাঘেঁসি ফটো। শশধর অনেকবার সে ফটো দেখেছে… তবু টাঙানো রয়েছে ঘরের মধ্যে।

সুনন্দ হঠাৎ বলে উঠল, শশধর খুন করতে পারে না।

কিন্তু সুরেন নিয়োগীর পক্ষেই বা খুন করা কি কিভাবে সম্ভব? বারোটার কাছাকাছি সময় খুন হয়েছে ললিতা।

অথচ বারোটা দশ মিনিটের সময় তার গলা শোনা গেছে। কিন্তু ললিতাকে দেখা যায়নি। সে দরজার কাছে এগিয়ে এসে সুরেন নিয়োগীকে বিদায় দেয়নি। আবার সুরেন নিয়োগী যখন তার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে ছুটে এসেছে তখনও সে এগিয়ে এসে হেসে দরজা খুলে পরিহাস করেনি।

তুমি কি বলতে চাও

আনন্দ মুখার্জির চোখে অপার বিস্ময়।

আমি বলতে চাই, শশধর যখন ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন, ঘরের মধ্যে যখন অন্ধকার, তখন হঠাৎ গ্রামোফোন বাজানোর কি কারণ থাকতে পারে? হঠাৎ রাত্রে সাড়ে এগারটার সময় দরজা বন্ধ করে গ্রামোফোন চালানোর কি কারণ?

কি কারণ?

ঘরের মধ্যে যদি কোনও চাপা শব্দ ওঠে কিম্বা আর্তনাদ শোনা যায় গ্রামোফোনের রেকর্ড তা চাপা দিয়ে দেবে।

তোমার থিওরি হল অন্ধকারে ললিতার কাছে এসে গলায় গামছা দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে সুরেন নিয়োগী তার কাজ শেষ করেছে।

ঠিক তাই। ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত স্বামীর পাশে স্ত্রীকে খতম করতে হয়েছে সুরেন নিয়োগীকে। এ ছাড়া তার বাঁচার পথ নেই বলে।

কিন্তু তারপর? সুরেন নিয়োগী যখন বাইরে থেকে প্রশ্ন করছে তখন ঘরের ভিতর থেকে কে উত্তর দিয়েছে? ললিতার ভূত?

সুনন্দ এগিয়ে গেল গ্রামোফোনের দিকে। গ্রামোফোনে একটি রেকর্ড পরানো। অটোমেটিক স্টপে এসে রেকর্ডটি বন্ধ হয়ে গেছে। পল্লীগীতির লেবেল লাগানো রয়েছে রেকর্ডে। হাসি পেল সুনন্দর। পল্লীগীতি শোনার উপযুক্ত মুহূর্ত বটে। আনন্দ মুখার্জি বিস্মিত ভাবে বললেন, ও কি তুমি ওটা বাজাবে নাকি? দোহাই তোমার পল্লীগীতি আর শুনিও না।

সুনন্দ তখন রেকর্ডের গান শোনার জন্য গ্রামোফোনটা চালু করে দিয়েছে।

ঘস্ ঘস্ ঘস

এক মিনিট চলে গেল। রেকর্ড থেকে কোনও শব্দ বেরুল না। সুনন্দ আবার গোড়া থেকে পিন পরালো। আবার ঘস্ ঘস্ করে রেকর্ড এগিয়ে চলল। কিন্তু আর কোনও শব্দ নেই।

আনন্দ মুখার্জি ছুটে এলেন, সাউণ্ড বক্সটা খারাপ হয়ে গেছে। বন্ধ করে—

মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল আনন্দ মুখার্জির। সমস্ত নিস্তব্ধতা একটি বুকফাটা আর্তনাদে খানখান হয়ে গেল। চমকে উঠলেন আনন্দ মুখার্জি। তারপর খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা। রেকর্ডটা এগিয়ে চলল। সুনন্দ বিস্মিত ভাবে গ্রামোফোনটার দিকে তাকাল। সাউণ্ড বক্সটা খারাপ হয়ে গেল নাকি। সেই সময়ে আবার অশরীরী শব্দ ভেসে এল রেকর্ডের মধ্য হতে। বামাকণ্ঠে রেকর্ড বাণী শোনা গেল, কে, সুরেনবাবু? আপনি এখনও বাড়ী যান নি। বাড়ী যান। আমি ভাল আছি। মিছি মিছি ভয় পেয়েছিলাম। আপনি বাড়ী যান

ঘস্‌·· ঘস্‌ ঘস্‌

রেকর্ডটা অটোম্যাটিক ব্রেকে বন্ধ হয়ে গেল

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল সুনন্দর। বলল, আমি ঐ রকমই অনুমান করেছিলাম। সুরেনবাবু বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন। ললিতাকে মেরে ফেলা ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর ছিল না। সে সুযোগ নিতে তিনি ছাড়েন নি ঘর থেকে যখন বেরিয়ে পড়লেন তখন সোরভিকে দেখিয়ে তিনি বাইরে লবক চাইলেন। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন যে ঘরের ভেতর রেকর্ডটা কতখানি এগিয়েছে। তারপর লিফটের কাছে এগিয়ে গেলেন। আর্তনাদের শব্দ ভেসে এল।

ঐ আর্তনাদের কারণ কি?

আমার মনে হয় দুটি কারণ। প্রথম কারণ, ঐ শব্দ শুনলে সবাই সচকিত হয়ে, ললিতা দেবীর কুশল জানতে চাইবে। দ্বিতীয় কারণ হল, ওটি টাইম সিগন্যালের মত। ঐ শব্দের কতক্ষণ বাদে পরবর্তী কণ্ঠস্বর শোনা যাবে তা পরিষ্কার জানতেন সুরেনবাবু। কারণ তিনিই রেকর্ডটা তৈরী করেছিলেন তাঁর কোম্পানীতে কোনও স্ত্রীলোককে দিয়ে। এই দুটি শব্দধারার মধ্যে কতখানি সময় লাগবে হিসেব করে দেখে সুরেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন ললিতার কুশল। ঘরের ভেতর থেকে শোনা গেল কণ্ঠস্বর। সুরেনবাবুর সঙ্গে যারা ছিল তারা বুঝল ললিতা ভাল আছে। সুরেনবাবু লিফটম্যানকে সময় সম্বন্ধে প্রশ্ন করে সচেতন করে তুললেন। এই ভাবে সময় সম্বন্ধে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে রাস্তায় গিয়ে এ্যাকসিডেণ্ট বাঁধিয়ে সকলের সামনে দেড় ঘণ্টা কাটিয়ে দিলেন। তার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, তাঁর গতিবিধি এবং যাওয়া আসার সময় নিয়ে পাকা দলিল তৈরি করা।

আনন্দ মুখার্জি টেলিফোনটি তুলে নিলেন, হ্যালো··· সুরেনবাবু···বাড়ী আছেন। দাঁড়ান, আমরা আপনার ওখানেই যাচ্ছি · কেন · একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে। শশধর সম্বন্ধে একটি বিচিত্র খবর পেয়েছি। আপনি হয়ত কিছু আলোকপাত করতে পারেন।

সুরেন নিয়োগী বৈঠকখানাতেই বসেছিলেন।

ডেপুটি কমিশনার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন

শশধর সম্বন্ধে কি বিচিত্র খবর পেলেন? আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন।

ডেপুটি কমিশনার সহকারী দুজনকে কি ইঙ্গিত করলেন। তারা কাছে এগিয়ে গেল সুরেনবাবুর আনন্দ মুখার্জি বললেন, জানতে পারলাম শশধর হত্যাকারী নয়। আপনি সব কথা খুলে বলে আমাদের সাহায্য করবেন আশা করি।

সুরেন নিয়োগী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন

আনন্দ মুখার্জি শেষ কথা বললেন, আপনার ঘরই আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল শেষ পর্যন্ত।

সুরেন নিয়োগী উঠে দাঁড়ালেন হাতকড়াতে হাত দুট বাড়িয়ে দিলেন।

—:—

হত্যা মৃত্যু নিরুদ্দেশ

এক

অবিনাশবাবুর আহ্বান

লাল সুরকি ছড়ানো প্ল্যাটফরম।

জুতোর মচ্‌ মচ্‌ আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই মোটরে স্টার্ট দেবার শব্দ জেগে উঠল।

অনেক রাত্রির ট্রেন। গাড়ী থেকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নেমেছে সুনন্দ। মোটর গাড়ী নিয়ে হাজির ছিলেন অবিনাশবাবু নিজে। তাঁরই আহ্বানে আসতে হয়েছে সুনন্দকে। একদিন দুজনের নিবিড় পরিচয় হয়েছিল কোলকাতায়। সে প্রায় পনের বছর আগেকার কথা। অবিনাশবাবু তখন সওদাগরী অফিসের কেরানী। চাকরী জীবনে মাঝামাঝি পর্যায়ে হঠাৎ সুনন্দর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল কলুটোলার এক মেসে। অবিনাশবাবু সেখানে দীর্ঘদিনের বোর্ডার আর সুনন্দ তখন কলেজে পড়া ছাত্র। সেই মেসে সীট না পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল।

অবিনাশবাবুর কেমন মায়া লেগেছিল কলেজের এই ছাত্রটিকে দেখে। তাঁরই বিশেষ অনুরোধে একটি সীট পেয়েছিল সুনন্দ। অবশ্য সুনন্দ সেদিন সুনন্দ হয়নি। মানে তখন তার ছাত্রজীবন পর্যন্ত প্রাচীন ধরনের নাম নিয়েই তখন সে পড়াশুনো করছিল। সুনন্দ নাম নিয়ে প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নও সে দেখতে আরম্ভ করেনি।

তারপর বহুদিন গত হয়েছে। এম এস সি পাশ করবার পর গতানুগতিক ভাবে চাকরী-জীবনে না ঢুকে সে রহস্য-সন্ধানীর জীবন বেছে নিয়েছে। নিজে ফার্ম খুলেছে। নিজের নামটাও বদলে নিয়েছে। এখন সে বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ সুনন্দ চ্যাটার্জী।

ওদিকে অবিনাশবাবুও হঠাৎ সওদাগরী আপিসের চাকরী ছেড়ে সাঁওতাল পরগণার এই জঙ্গলে এসে বাসা বাঁধলেন। কেন যে চাকরী ছাড়লেন আর কেনই বা তিনি এই জঙ্গলে এলেন সে কথা কারোও জানা নেই। আর জানবার আগ্রহ থাকার কথাও নয়।

সেদিনের সেই কলেজে পড়া ছাত্রটির সঙ্গে অবিনাশবাবুর আর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি দীর্ঘ পনের বছর। কিন্তু অবিনাশবাবুকে মনে ছিল সুনন্দর। অনেক বছর বাদে হঠাৎ তাঁর চিঠি বিস্মিত করল তাকে। অবিনাশবাবু! সেই অবিনাশবাবু তাকে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর অরণ্য নিবাসে। ব্যাপারটা খুব জরুরী এবং গোপনীয়। হয়ত তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। একবারে যেন সে আসে। অন্ততঃ তাঁর চিঠির উত্তর দেয়।

হাতে কাজ ছিল না। সুনন্দ আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে দ্বিধা করল না। অনেক স্নেহ সে পেয়েছে সেদিন তাঁর কাছ থেকে। আজ যদি তাঁর দ্বারা কোনও উপকার হয়। বিশেষ করে তিনি যখন ঐ ভাবে ডেকেছেন। অবশেষে ট্রেনে করে সে ঠিক জায়গাতেই হাজির হয়েছে। প্ল্যাটফরমের পথটুকু দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল। তারপর গাড়ীর দরজা খুলে ভিতরে বসল সুনন্দ। ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিল থর থর করে।

মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল সুনন্দ: হঠাৎ কি প্রয়োজন পড়ল ডিটেকটিভের? ঘটি বাটি চুরি যায়নি নিশ্চয়?

হাসল সে।

ম্লানমুখে অবিনাশবাবু উত্তর দিলেন: বাড়ী চল, হাত মুখ ধোও, খাওয়া দাওয়া কর। তারপর একটা জটিল রহস্যের কথা তোমাকে বলব। দশ বছর ধরে ভেবে ভেবে পাগল হয়ে গেলাম। কিন্তু আজও তার কোনও কূল কিনারা পেলাম না। তাই একজনের সাহায্য নিতে চাই। সে সাহায্য বাইরের লোকের হলে চলবে না। তাই বাধ্য হয়ে তোমাকেই ডাকলাম।

সুনন্দ চুপ করে ভাবতে লাগল।

জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে আঁকা বাঁকা পাহাড়ী পথের ধারে চমৎকার বাংলো। গাড়ী থেকে নামল দুজনে। প্রচুর জলযোগের ব্যবস্থা করা ছিল। আহারাদির পর সুনন্দর কাছে অবিনাশবাবু আবার হাজির হলেন। এবার তিনি যেন অন্য মানুষ…অনেক দ্বিধাগ্রস্ত অনেক চিন্তিত।

অবিনাশবাবু মুখ খুললেন: একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা যেমন রহস্যজনক তেমনি গোপনীয়। বছরের পর বছর সেই রহস্যভেদের চেষ্টা করেছি, পারিনি। শেষে তোমার শরণাপন্ন হলাম।

: কি ব্যাপার?

: ব্যাপারটা এত গোপনীয় যে আজ পর্যন্ত আমি আর কাউকে সে কথা

বলি নি। কাউকে বলতে পারব না হয়তো

: কি এমন কথা—

: বলছি। কিন্তু তুমি কথা দাও, একথা বাইরের কেউ জানবে ন

: বেশ আমি কথা দিচ্ছি।

: পুলিস জানবে না।

: পুলিসের কাছে আমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই তাই সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার গোপন কথা যেমনই হোক পুলিসের কানে উঠবে না।

: যদি খুনের কথা হয়।

: খুন!—চমকে উঠল সুনন্দ

: হাঁ, কথা দাও, খুনের কথা হলেও, পুলিস সে ব্যাপারে কোনও কালে জানবে না।

সুনন্দ চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ সে কি ভাবতে লাগল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে অনুনয়-ভরা কণ্ঠে অবিনাশবাবু বললেন: আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি। কদিন বাদেই মারা যাব। তোমার বিবেকে বাধলে তখন তুমি না হয় পুলিসকে জানিও। কিন্তু তুমি কথা দাও যে আমাকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবে না। ব্যাপারটা যত গুরুতরই হোক আমার জীবদ্দশায় পুলিসকে জানাবে না।

অনেক ভেবে সুনন্দ উত্তর দিল: বেশ আমি কথা দিচ্ছি, পুলিস যদি আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞেস না করে তাহলে আমি নিজের থেকে কোনও কথা বলতে যাব না।

অবিনাশ বাবু তাকালেন সুনন্দর মুখের দিকে। তার মুখে বেদনার বিষণ্ণ ছায়া। বললেন, তাই হোক তোমার হাতে আমি নিজেকে সঁপে দিলাম। আমার কথা শুনে তোমার যা উচিত মনে হয় কোরো। এই রহস্যের গুরুভার আমি আর বইতে পারছি না।

: বলুন। আমি মন দিয়ে শুনছি।

সুনন্দ তার দৃষ্টি প্রসারিত করে দিল জানালার মাঝখান দিয়ে অনেক দূরে মাঠের দিকে। সেখানে গাছপালার কোলে ঢালু পাহাড়টা হঠাৎ শেষ হয়ে গিয়েছে।

অবিনাশবাবু আত্মসমাহিতভাবে তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

॥ দুই ॥

অবিনাশবাবুর রহস্য কথা

অবিনাশবাবু বলতে লাগলেন।

: সওদাগরী আপিসে কাজ করার সময় এক কাকার কাছ থেকে মাঝে মাঝে আমার নামে টাকা আসত। আমাকে তিনি খুব ভালবাসতেন—অথচ আমি তাঁকে ভাল করে কোনদিন দেখিনি। আমার ছোট বয়স থেকে তিনি ঘর ছাড়া। বিয়েও করেননি। সারা জীবনই এই সাঁওতাল পরগণার এইখানেই একরকম অজ্ঞাতবাস করে কাটিয়ে দেন। কাকার মৃত্যুর পর তাঁর বিশাল সম্পত্তি আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। আপিসের কাজ আর সাঁওতাল পরগণার জমিদারী, কোনটা ছেড়ে কোনটা রাখব ঠিক করতে পারছিলাম না। আমারও বিয়ে-থা হয়নি। ভাবলাম, দূর ছাই, চাকরী করে কি হবে। স্ত্রী পুত্র নেই বয়সও হচ্ছে—বাকী জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেব। চলে এলাম এখানে। প্রথম প্রথম কোলকাতার জীবনের জন্যে মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠত। তারপর অবশ্য আমাকে এমনি পেয়ে বসল যে এতদিন কোলকাতায় কি করে ছিলাম তাই ভেবে মাঝে মাঝে আশ্চর্য লাগত।

এখানে একজন বাঙালীকে সঙ্গী পেলাম মনে মনে। এই পাঁচমুড়ো পাহাড় যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে আর একটা বাঙলো প্যাটার্নের বাড়ী আছে। প্রসাদ সিংহ ঐ বাড়ী আর ওপাশের অনেকখানি জমির মালিক। তার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমার। সে আমাকে শিকার করা শেখালো। শিকারের টুকিটাকি কত কি উপহার দিল আমাকে। সে এখানে আসত—শীতকালে, প্রধানতঃ শিকারের ঝোঁকে। আমিও শীতের দিনগুলোর জন্য অপেক্ষা করতাম। এপাশে ওপাশে ধূ ধূ করছে মাঠ আর উঁচু নীচু পাহাড়। কোনদিকে সভ্য জনসমাজের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে সাঁওতালরা আসে আর চলে যায়। তখন তাদের সঙ্গী হিসাবে পাই। আর শীতের সময় আসে প্রসাদ সিংহ। এইভাবেই কয়েকটা বছর বেশ কেটে গেল।

সুনন্দ প্রশ্ন করল: এর মাঝখানে আপনি একবারও কোলকাতা যাননি?

: গেছি মাঝে মাঝে। তবে কোলকাতায় আত্মীয়স্বজনের বাড়ীতে না, হোটেলে। হোটেলে উঠতাম, মাঝে মাঝে প্রসাদও উঠতো। আমাকে সেই হোটেলের পথ দেখিয়েছিল। অস্বীকার করব না—এখানে থাকতে থাকতে আমার চরিত্রে কিছু কিছু খারাপ জিনিস ঢুকেছিল। দিশী মদ ও অন্য কিছু

আস্বাদ করার জন্য প্রসাদও সাঁওতাল পরগণায় আসত। আমার বাড়ীতে জংলী মেয়েরা কাজ করত। প্রসাদ তখনও বিয়ে করেনি। ক্রমে আমার সঙ্গে তার নানা বিষয়েই গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ হয়ে গেল। সে-ই আমাকে একদিন কোলকাতায় তার একটি পরিচিত বিলিতী হোটেলের পথ দেখাল। মাঝে মাঝে সেখানে এসে উঠতাম—মুখ বদলানো হত।

ব্যাপারটা চলছিল এইরকম। হঠাৎ প্রসাদ একবার কোলকাতায় গিয়ে বিয়ে করে বসল। তারপর বৌ নিয়ে আস্তানা গাড়ল সাঁওতাল পরগণার ওই জনমানবহীন অঞ্চলে। বেশ বর্ণল আমাদের মধ্যে প্রীতির টান কিছুদিন ধরে। হঠাৎ কি যে হয়ে গেল প্রসাদ যেন আমার ওপর ক্ষেপে উঠল। তার গভীর ভালবাসা হঠাৎ তীব্র বিতৃষ্ণায় রূপান্তরিত হয়ে গেল।

সুনন্দ প্রশ্ন করল: আপনি কি করে বুঝতে পারলেন?

সুনন্দর কথায় ফেটে পড়লেন অবিনাশবাবু। বললেন: বুঝতে না পাবার কারণ কি? বন্ধ করল যাওয়া আসা, শিকার করা। তার বাড়িতে গেলে দূর থেকেই গালাগালি দিতে আরম্ভ করত। তার বাড়ীর চারপাশে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে দিল আশেপাশে সাঁওতালদের কাছে আমার নামে যা তা বলতে লাগল।

: আর আপনি?

: আমি প্রথম প্রথম মাথা ঠাণ্ডা রেখে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতাম তাতে দেখলাম খারাপ হচ্ছে। সে হাটে মাঠে আমাকে নানা ভাবে অপমানিত করতে লাগল। আমিও শেষ পর্যন্ত ধৈর্য রাখতে পারলাম না। এক একবার মনে হত বন্দুকটা দিয়ে হারামজাদার মাথাটা উড়িয়ে দিই। বেটাছেলের বাপান্ত করা ঘুচিয়ে দিই কিন্তু ছুঁচোটা সে সুযোগ দিচ্ছিল না মোটেই।

অবিনাশবাবু এতক্ষণ সংযত কথা বলছিলেন। এইবার যে ভাবে তিনি প্রসাদবাবুর প্রসঙ্গে গালাগালি করতে শুরু করলেন তাতে বোঝা গেল তার ওপর রাগ তাঁর এখনও পড়েনি।

সুনন্দ প্রশ্ন করল: তার সঙ্গে শেষ দেখা হল কবে?

: তারিখটা আমার মনে নেই। কিন্তু সময়টা ও স্থানটা মনে আছে। পাশের শহরে একটা লিকার শপ আছে। সেখানে সেদিন সন্ধ্যেবেলা তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি রাগের মাথায় তার চোদ্দ-পুরুষ উদ্ধার

করে দিয়েছিলাম

: সে কি বলল ?—প্রশ্ন করল সুনন্দ।

: সে কিছুক্ষণ অস্বাভাবিক ভাবে গম্ভীর হয়ে রইল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : মুখ সামলে কথা বলিস বাস্কেল। যদি তোর বিন্দুমাত্র আত্মসম্মান জ্ঞান থাকে তাহলে পরশু, হাট বার, বিকেল বেলা সকলের সামনে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবি। তারপর তোর জমি বাড়ী বেচে এখান থেকে চলে যাবি। যদি না যাস ত পরশুদিন হাটের মধ্যে তোর বাড়ীর কেচ্ছা সবাইকে শুনিয়ে দেব।

বিস্মিত ভাবে সুনন্দ বলল : তার মানে ?

অবিনাশবাবু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : আমাদের পারিবারিক জীবনে একটা গভীর কলঙ্ক আছে। ছুঁচোটা কোন রকমে সে খবরটা সংগ্রহ করেছিল।

: ব্যাপারটা খুব গুরুতর ?

: খুবই গুরুতর। এমন গুরুতর সেই কথা জানাজানির পর আমার কোথাও মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। অথচ রাসকেলটার কথায় সম্মতই বা হই কি ভাবে ...

: আপনি কেন মনে করলেন যে প্রসাদ সিংহ আপনার বাড়ীর সব খবর জেনেছে ?

: আমার সম্বন্ধে সে যে-সব কথা বলে বেড়াচ্ছিল, জোর গলায় প্রতিবাদ করলেও বুঝতে পারছিলাম যে আমাদের বাড়ীর খবর তার অজানা নেই। বুঝলাম, তার হাতে এমন কিছু প্রমাণ আছে যার সাহায্যে সে উঁচু মাথা নীচু করে দিতে পারে। আমার সামনে তখন তার কথা মতো তার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে বাড়ী জমি বিক্রী ক'রে চলে যাওয়া, আর না হয় এখানে সাঁওতাল সমাজে সকলের উপহাসের পাত্র হয়ে দিন কাটান ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না।

: কলঙ্কটা কাকে নিয়ে ?—সুনন্দ প্রশ্ন করল

: এ বিষয়ে বেশী কিছু বলতে পারব না। তবে জেনে রাখ, যার জমিদারীর মালক আমার সেই কাকার নাম এর সঙ্গে খুব গভীর ভাবেই জড়িত। লিকাৎ শপ থেকে আমি পাগলের মত বাড়ী ফিরলাম। সমস্ত পথটা যে কিভাবে এসেছি জানিনা। কেবল মনে হচ্ছিল পরশু দিন হাটবার,

তার আগে ও ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেলতে হবে। বাড়ী ফিরেই বন্দুকটা লোড্ করলাম। ভাবলাম আত্মহত্যা করব। কেউ জানবে না কি হয়েছে। কিন্তু তারপর মনে হলো তাতে প্রসাদের নোংরা জিভকে থামান যাবে না। আমার মৃত্যুর পর সে আমার সম্বন্ধেও যা তা কথা বলে বেড়াবে। না আত্মহত্যা করলে চলবে না—রাস্কেলটার মুখ বন্ধ করতে হবে।

প্রসাদের বাড়ী আর আমার বাড়ীর মাঝখানে ব্যবধান প্রায় এক মাইল। মাঝখানে গাছপালার ঘন জঙ্গল আর ছোট নদী শালমতী। ঠিক করলাম পরের দিন বিকেলবেলা ঐ জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে যাওয়া-আসার পথটা ভাল করে দেখে আসব। অনেক দিন ও-পথে যাওয়া হয়নি। তারপর রাত্রিবেলা সুযোগ বুঝে অপমানের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে হবে।

পরের দিন। শীতের অপরাহ্নের ম্লান রোদ্দুর গাছের ডালপালাকে রাঙা করে বিদায় নেবার অবসর খুঁজছে। গাছের তলায় তলায় অন্ধকার আসছে নেমে। নদীটি চিক্ চিক্ করে বয়ে চলেছে।

এগিয়ে চললাম ঐ দিকে

দিনের বেলায় বন্দুক নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, কে দেখে ফেলবে। প্রসাদ অনেক দিন আগে আমাকে একটা ধারাল ছোরা দিয়েছিল। তার নাম লেখা ছোরা—বন্ধুত্বের উপহার হিসেবে। শিকারের দিনগুলোতে সে-ছোরা আমার প্রায় নিত্য সঙ্গী ছিল। সেদিন সেই ছোরাটাকে কেন যে সঙ্গে নিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই তবে বনের কাছে যখন পৌছুলাম তখন পকেটে হাত দিয়ে ছোরাটাকে অনুভব করে বেশ একটা তৃপ্তি পেলাম।

অন্ধকার নেমে আসছিল। আমার জমির এলাকা ছাড়িয়ে তার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বেশ খানিকটা এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই দেখলাম একটা শালগাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে প্রসাদ। তার চোখ রয়েছে তার নিজের বাড়ীর দিকে। হয়ত কিছু দেখেছে ঐদিকে। গায়ে একটা ওভারকোট। ঐ ওভারকোটটা আমিই তাকে উপহার দিয়েছিলাম। তখন বন্ধুত্ব ছিল নিবিড়।

ভাবলাম ঠিক হয়েছে আমার হাতে রয়েছে তারই ছোরা। আর তার গায়ে রয়েছে আমরাই দেওয়া ওভারকোট। ভাগ্য সুপ্রসন্ন! আস্তে আস্তে তার খুব কাছে গিয়ে পড়লাম। ধারে কাছে কোনও লোক নেই...কেউ সাক্ষী দেবে না।

পিছন থেকে ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার পিঠের ওপর। একটা ক্ষীণ আর্তনাদের সঙ্গে দেহটা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল। চারদিকে অন্ধকার তখন ঘন হয়ে এসেছে।

উপুড় হওয়া দেহটা দু-একবার ধড়-ফড় করে স্থির হয়ে গেল। হঠাৎ চোখে পড়ল, একটা টর্চের আলো সেই দিকেই আসছে। আর দাঁড়ালাম না। দ্রুতপদে বাড়ী ফিরে এলাম। মাথাটা তখন কি রকম এলোমেলো হয়ে গেছে। পালাতে হবে······হাঁ, এখনই। গাড়ীটা বার করলাম গ্যারেজ থেকে, তারপর বেশ করে তেল ভরে চালালাম আসানসোলের দিকে। ওখান থেকে কোলকাতা যাবার অনেক ট্রেন পাওয়া যাবে। পকেটে যা টাকা আছে তাতে বেশ কিছুদিন চলে যাবে যদি ধরা না পড়ি। গাড়ী নিয়ে সোজা কোলকাতায় এলে গাড়ীর নম্বর অনুসরণ করে আমাকে ধরা পুলিসের পক্ষে সহজ হবে মনে করে ওটাকে আসানসোলে একটা গাড়ী রং করার দোকানে রেখে কোলকাতায় চলে এলাম।

রাত্রে উঠলাম একটা বাজে হোটেলে।

পরের দিন সকালে উঠে হোটেলের বেয়ারা দিয়ে যতগুলো খবরের কাগজ আছে সবগুলো কিনলাম। কিন্তু কোনটাতেই কোন হত্যাকাণ্ডের খবর নেই। পরের দিন আবার খবরের কাগজে দেখলাম। কিন্তু না······সাঁওতাল পরগণার কোন মারাত্মক খুনের খবর কাগজে বেরোয় নি। তারপর নিজে রাস্তায় গিয়ে তন্ন তন্ন করে অনেক কাগজ দেখলাম। সেদিনও কোনও খবর নেই।

তাহলে কি প্রসাদ মারা যায় নি। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। যাক, আমি তাহলে খুনী নই। কিন্তু তাই বা কি করে হবে! আমি তার যে অবস্থা দেখেছি তাতে নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। তাছাড়া সে যদি নাও মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তার সাংঘাতিক ভাবে আহত হওয়ার খবরটাই বা কাগজে বেরুচ্ছে না কেন? ওখানে তো কোন ডাক্তারের বাড়ী নেই। বেঁচে থাকলে তাকে চিকিৎসার জন্যে পাশের শহরের হাসপাতালেই আনতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজেও খবরটা বেরুবে। কিন্তু ব্যাপার কি?

পরের দিনও খবরের কাগজ দেখলাম। নাঃ, কোনও খবর নেই। উৎকণ্ঠা আমাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলল। ভাবলাম, দূর ছাই, আর পারি না। ধরা

পড়ি পড়ব, তার আগে দিন কতক বেশ ক'রে নেশা আর ফুর্তি করে নিই। যে সাহেবী হোটেলে আমরা আসতাম মাঝে মাঝে, ফোন করে জানলাম সেখানে ঘর খালি আছে। উঠে গেলাম সেখানে। সমস্ত রাত্রি হোটেলের ঘরে দাপাদাপি করে কাটালাম। বেলায় ঘুম ভাঙার পর মুখ হাত পা ধুয়ে নেশার খোঁয়ারি কাটাবার জন্য হোটেলের দোতালায় বারের দিকে এগুলাম, কিন্তু দু-পা এগিয়েই আমার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম হোটেলের বারে. প্রসাদ যেখানে বসে মদ খেত, সেখানে তারই মত দেখতে, অবিকল তারই মত চেহারার একজন লোক খবরের কাগজের উপর চোখ বুলোচ্ছে। তার মুখটা আয়নার দিকে ছিল। হঠাৎ আয়নায় আমার ছায়া পড়তে সে একবার আয়নার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের খবরের কাগজটা খসে পড়ল। মুখটা তার এক নিমেষে সাদা হয়ে গেল। একটা ফুঁয়ে যেন প্রদীপ নিভে গেল। মড়ার চোখের মত চোখ নিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। মনে হল, অনেক চেষ্টা করে সে যেন আত্মসম্বরণ করছে। তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখলাম সে আমাকে ডাকছে তার কাছে.

এগিয়ে গেলাম মন্ত্রমুগ্ধের মত।

না, চিনতে এবার ভুল হল না। প্রসাদই। দিনের আলোয় তাকে দেখলাম ভাল করে। অশরীরী বলে মনে হোল না। এমন কি শরীরে কোন জখমের ভারও বোঝা গেল না। আর সবচেয়ে আশ্চর্য, প্রসাদ যেন সেই আগের প্রসাদই হয়ে গেছে। আমার ওপর কোনও বিদ্বেষ নেই. বললে: বোসো……সকালেই এক গ্লাস হয়ে যাক।

: আপত্তি নেই।

বসলাম তার পাশে। মনটা আমারও কি রকম ভাল লাগছিল! যাক আমি তাহলে খুনী নই। কিন্তু প্রসাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ বসতে পারলাম না ভীষণ কৌতূহল আর অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। আমি কি পাগল হয়ে গেলাম। এ কি ব্যাপার?

সুনন্দ এবার মুখ খুলল: বোধ হয় আপনার মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। আপনি মনে করেছিলেন আপনি খুন করেছেন। কিন্তু আসলে কিছুই করেন নি।

ম্লান হাসলেন অবিনাশবাবু। বললেন: ব্যাপারটার তাহলে খুব সহজে সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু সমাধানটা অত সহজ নয়।

: কেন ?—প্রশ্ন করল সুনন্দ ?

: সেদিনই ট্রেনে করে ফিরলাম এখানে। ব্যাপারটা কি ? সবই কি আমার মস্তিষ্কের বিকার। ট্রেন থেকে সরাসরি নেমে একবার ঐ জঙ্গলে গিয়ে হাজির হলাম। যে গাছটার কাছে প্রসাদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম সে জায়গাটা খুঁজে বের করতে খুব কষ্ট হল না। সেই গাছের তলায় বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। দাগটা নদীর ধার পর্যন্ত গিয়েছে। খানিকটা মাটিও সরে গেছে। হয়ত লোকট' নদীর ধার পর্যন্ত নিজেই গেছে গ'ড়িয়ে গড়িয়ে, না হলে কেউ তাকে টেনে নিয়ে গেছে। মাটির ওপর দিয়ে নদীর কাছে গিয়ে সেই দাগটা মিলিয়ে গেছে। হয় সেই লোকটা ভাল হয়ে ফিরেছে, না হলে নদী তাকে গ্রাস করেছে। কি ব্যাপার! তবে কি গ্রামের কোন লোককেই আমি প্রসাদ বলে ভুল করে খুন করেছি! কিন্তু তাই বা হবে কি করে। তার গায়ে তা আমারই দেওয়া ওভারকোট ছিল। আর তা'ছাড়া কোন সাঁওতালের দেহের উচ্চতা বা রং তো প্রসাদের মত হতে পারে না, যে দূর থেকে দেখে ভুল করব। তবু একবার খোঁজ নিলাম····· গ্রামে কোনও নিরুদ্দেশের ব্যাপার নেই। মাথাটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেলো। এটা হত্যা-রহস্য না ভৌতিক-রহস্য বুঝতে পারলাম না। এখানে থাকা আমার পক্ষে নিরাপদ নয়। আসানসোল থেকে গাড়ীটা রঙ করিয়ে বেরিয়ে পড়লাম যেদিকে দু চক্ষু যায়। পথে পথে ঘুরলাম বছরের পর বছর। দীর্ঘ ন' বছর বাদে ফিরলাম সেদিন। ফিরেও স্বস্তি পেলাম না। ঐ জঙ্গল, ঐ জায়গা, আমাকে কেমন পাগল করে দিচ্ছিল। তাই তোমাকে টেনে আনলাম এখানে। পুলিসকে যে কথা বলতে পারিনি, আজ তোমাকে সে কথা বললাম।

সুনন্দ প্রশ্ন করল : লোকটা প্রসাদের স্ত্রী নয় ত ?

: পাগল···প্রসাদের স্ত্রী অসামান্য সুন্দরী। টক্ টক্ করছে তার গায়ের রং। সন্ধ্যার অন্ধকারে যে মানুষের ঘাড় আর কান দেখেছিলাম সে মাঝারি শ্যামবর্ণ। তাছাড়া তার চুল পুরুষের মত কেন হবে ? কানেও দুল টুল ছিল না। পরণে ছিল প্যাণ্ট, গায়ে ছিল ওভারকোট। হাতে ছিল একটা সিগারেট —এ অবস্থায় তাকে স্ত্রী মনে করার কোনও কারণ নেই।

: আচ্ছা প্রসাদ সিংহের বাড়ীতে কি আর কোন পুরুষ আত্মীয় ছিল ?

: বলেছি তো প্রসাদের বাড়ী অনেকদিন যাইনি। আগে যখন যেতাম

তখন প্রসাদের বাড়ীতে ওর স্ত্রী ছাড়া কাউকে দেখিনি। এমন কি তার স্ত্রীকেও ভাল করে দেখিনি। প্রসাদ তার স্ত্রীকে মোটেই হাজির করত না আমার সামনে·· দু একবার হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে মাত্র। আর যে কারণে সে আমার সামনে তার স্ত্রীকে বের করত না, সে-কারণে তার পক্ষে কোন পুরুষ আত্মীয়কে বাড়ীতে স্থান দেওয়া অসম্ভব।

: কারণটা কি?

: বলেছি তো প্রসাদের স্ত্রীটি অসামান্য সুন্দরী। প্রসাদের চরিত্র ভাল না থাকায় সে দুনিয়ার সবাইকে তারই মত ভাবত। সুতরাং বাড়ীতে কোন পুরুষ চাকর পর্যন্ত ছিল না। এ অবস্থায়—

: তবু একবার বাড়ীর খবরটা নিয়েছিলেন কি?

: তখন আমার সে-অবস্থা ছিল না। কিন্তু তার বাড়ীতে যদি কোনও লোক খুন হত তাহলে থানা পুলিশ হত নিশ্চয়ই। কিন্তু সমস্ত গ্রামে এরকম কোনও খবর নেই। তবু কোলকাতা থেকে ফিরে সাহস করে একবার শহরের থানায় গিয়েছিলাম। দেশ ছেড়ে কিছুদিনের জন্য বাইরে যেতে হচ্ছে, পুলিস যেন আমার বাড়ি ও জমির দিকে একটু নজর রাখে— এই কথা বলতে। দারোগাবাবুর সঙ্গে আমার গ্রাম নিয়ে আলোচনা হল। সে আলোচনা থেকেই প্রসঙ্গতঃ আমি জেনে নিলাম। কিন্তু তিনিও এ ধরণের কোন খবর পেলেন না, আমিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পালিয়ে এলাম।

অবিনাশবাবু চুপ করলেন।

সুনন্দ বাইরের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। দূরে পাঁচমুড়ো পাহাড়ের ধারে হলদে রং আর উঁচু নিচু পাহাড়ের ওপারে বোধ হয় প্রসাদ সিংহের বাড়ী।

সুনন্দ প্রশ্ন করল : প্রসাদ সিংহ কি এখানে থাকে?

: মাঝে মাঝে থাকে, মাঝে মাঝে কোথায় চলে যায়।

: কাল একবার দেখা করতে যাব। আপনার সঙ্গে কথবার্তা হয়?

: আমার সঙ্গে সেই হোটেলে আলাপের পর ন'দশ বছর কোনো কথা হয় নি। দীর্ঘদিন আমি তো বাইরে ছিলাম। ফিরে আসার পর একদিন তার সঙ্গে শহরে দেখা হয়েছিল। কিন্তু সেও আমার সঙ্গে কথা বলল না, আমিও অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। সমস্ত ব্যাপারটাই আজ পর্যন্ত আমার কাছে একটা অদ্ভুত প্রহেলিকা রয়ে গেছে। তুমি তো সব শুনলে। তোমার কি মনে হয়?

সুনন্দ কি ভাবল। তারপর বলল : আমাকে কিছুদিন সময় দিন। বছর দশ আগেকার ব্যাপার তবু দেখি কিছু খোঁজ খবর পাওয়া যায় কিনা?

॥ তিন ॥

প্রসাদ সিংহের গভীর রহস্য

অবিনাশবাবু আর প্রসাদ সিংহের বাড়ীর মাঝখানে বেশ খানিকটা ঘন জঙ্গল। তারই মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা পার্বত্য নদী শালমতী।

শাল পিয়াল মহুয়ার ঘন বনের মাঝে ছায়া ঘেরা শুঁড়িপথ। গ্রামছাড়া রাঙামাটির আঁকা বাঁকা রাস্তা।

সুনন্দ হাঁটতে হাঁটতে প্রসাদ সিংহের জঙ্গলের ধারে গিয়ে হাজির হল। অনেকদিনকার কাঁটাতারের বেড়া—অযত্নেও বেশীর ভাগ জায়গা অক্ষত আছে। পাশের রাস্তা ধরে বড় রাস্তায় পড়ে সুনন্দ প্রসাদ সিংহের বাড়ীর দরজায় গিয়ে আঘাত করল। ঝন ঝন করে রুদ্ধ দ্বারে প্রতিধ্বনি উঠল। অনেকক্ষণ বাদে ভিতর থেকে একটা রুক্ষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কাঁচা পাকা চুল নিয়ে এক দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ ভদ্রলোক দরজা খুলে কঠোর স্বরে প্রশ্ন করলেন : কাকে চাই হে?

: আপনাকে।

: আমাকে? তুমি কে বট হে?

বলেই অত্যন্ত অভদ্রভাবে দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন প্রসাদ সিংহ। সুনন্দ শরীরের খানিকটা অংশ দরজার ভিতর ঢুকিয়ে সে-চেষ্টায় বাধা দিয়ে বলল : আমি একটা তদন্তের কাজে এসেছি—

: তদন্তের কাজে—

কার্ডটা বাড়িয়ে দিল সুনন্দ। চমকে উঠলেন প্রসাদ সিংহ। বললেন : আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ দেখছি—তা হঠাৎ আমার কাছে

: ঐ বাড়ীর অবিনাশবাবুর একটা ব্যাপারে আমাকে আসতে হয়েছে।

প্রসাদ সিংহ এবার উৎফুল্ল হলেন। বললেন : অবিনাশটা ফেঁসেছে বুঝি—ভালই হয়েছে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তা কিসে ফাঁসল অবিনাশ?

: সে অনেক ব্যাপার—এখনও তদন্ত চলছে। কেমন লোক মশাই আপনার বন্ধু অবিনাশবাবু—

: বন্ধু! বন্ধু না ছাই! হারামজাদা—এক নম্বরের হারামজাদা। যেমন নিজে তেমনি তার বংশ—ঝাড়ে বংশে হারামজাদা—

: মানে—

: মানে লোচ্চার একশেষ। নিজে লোচ্চা, ওর চোদ্দ পুরুষ লোচ্চা। ঐ যে বাড়ী-ঘর ও কার জানেন? ওর কাকার! ছোঃ! ওর বাবা কেন তাকে বাড়ী থেকে বিদেয় করেছিল জানেন?

: তা তো সবাই জানে। সে কথা কারুর অজানা নয়।

খুশী হলেন প্রসাদ সিংহ। বললেন: মশাই কাজের লোক দেখছি। সেই কাকার সম্পত্তি হাতে নিয়ে অবিনাশটা দিনকতক বেশ কাটিয়েছিল। জংলী মেয়েটেয়েও কতকগুলো জুটিয়েছিল। আমার সংগে শিকারেও বেরুত। বেশ কয়েক বছর ভাবও ছিল আমার সঙ্গে। কিন্তু তার পরেই রক্তের মধ্যেকার পশুটা তার জেগে উঠল।

: অর্থাৎ—

: চরিত্রহীনতা যার বংশগত সে নিজেকে চিরকাল সামলে রাখবে কি করে। একদিন-না-একদিন তার মধ্যেকার পশুটা জেগে উঠবেই! আমার বাড়ীতে আসত সে বন্ধুর মত। কিন্তু সে যে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে আমারই সর্ব্বনাশ করার মতলব আঁটছিল তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি। বুঝতে যখন পারলাম তখন সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

সুনন্দ প্রশ্ন করল: বন্ধু হয়ে বন্ধুর সর্ব্বনাশ করার কথা ভাবতেও পারল।

এতক্ষণে প্রসাদ সিংহের মন পেল সুনন্দ। ঠিক মনের মতো কথা হয়েছে। ভদ্রতা করে প্রসাদ সিংহ বললেন: ভিতরে এসে বসুন—সব কথা তো আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয় না—হ্যাঁ, মশাই—পশু আর মানুষে তো ঐখানেই তফাৎ—

সুনন্দ আর একবার টোপটা ধরে খেলাল: ছিঃ···ছিঃ···

উত্তেজিত ভাবে প্রসাদ সিংহ বললেন: আমার স্ত্রী ছিলেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। এত রূপ···হ্যাঁ···হ্যাঁ মেয়েছেলে আমি কিছু দেখেছি বটে··· কিন্তু এমন অপূর্ব সুন্দরী বড় একটা নজরে পড়েনি। বিয়ের আগে সিনেমায় নেমেছিলেন বার কয়েক—কিন্তু আমাকে বিয়ে করার পর সব ছেড়ে দিলেন।

কোলকাতার লোভী আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের ভিড় বাঁচিয়ে এই সাঁওতাল পরগণায় নিয়ে এলুম তাঁকে, জীবনে সুখী হব বলে। দিন কতক বেশ ছিলুমও। তারপর ঐ অবিনাশ রাস্কেলটার সঙ্গে আমার স্ত্রীর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠল কেমন করে—

সুনন্দ আবার উত্তেজিত করল প্রসাদ সিংহকে: আপনার বুঝতে ভুল হয়নি তো?

: কচি খোকা নই মশাই—বেড়ালের গোঁফ দেখেই শিকারী কিনা বোঝা যায়। দিন কতক আমার স্ত্রীকে কিছু বেচাল দেখলুম। আমি অবিশ্যি আমার স্ত্রীর সঙ্গে অবিনাশের কোন দিনই পরিচয় করিয়ে দিইনি—আমার আপন সহোদর ভাইকে পর্যন্ত এ তল্লাট মাড়াতে দিতুম না। কিন্তু হলে কি হবে মশাই একদিন স্পষ্ট দেখলুম, অবিনাশ এসে আমাকে দেখতে না পেয়ে গিন্নীকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করল। আমি বাড়ী নেই মনে করে গিন্নী সেই সুযোগে রসালাপ জুড়ে দিলেন···

: রসালাপ! আপনার নিজের কানে শুনলেন—

: রসালাপ ছাড়া আর কি বলব? পাশের ঘরে খাটের তলায় শুয়ে পুরোনো ট্রাঙ্ক বার করছিলুম। শুনতে পেলুম গিন্নী জিজ্ঞেস করছেন: আপনার শরীর ভাল আছে তো—অনেকদিন আসেন নি?

: অবিনাশ কি উত্তর দিল?

: সান্‌সা মক্কেল মশাই। আস্তে আস্তে হেসে হেসে কি যে বলল কিছু বুঝতে পারলুম না। বোধহয় আঁচ পেয়েছিল আমি ওৎ পেতে আছি ··লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল। খাটের তলা থেকে আমি তখন ভাবছিলুম মুণ্ডু দুটো তরোয়াল দিয়ে আলাদা করে দিই। কিছুক্ষণ বাদে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে দেখি গিন্নী ভিজে বেড়ালের মত নিজের কাজ করছে। চড়া গলায় বললুম: এতক্ষণ কি হচ্ছিল?

আমার মূর্তি আর গলার স্বরে সে কিন্তু মোটেই ভয় পেল না। বলল: কখন কি হচ্ছিল?

ফেটে পড়ে বললুম! আমি ন্যাকা নই, সব বুঝি। বলি ব্যাপারটা কতদিন ধরে চলছে?

গিন্নী যেন আকাশ থেকে পড়ল: কোন ব্যাপারটা?

: ঐ যে অবিনাশ রাস্‌কেলটার সঙ্গে—

গিন্নী কড়া ভাবে উত্তর দিল : কি হয়েছে ?

: কি হয়েছে ? লুকিয়ে ফষ্টি নষ্টি করবে, আর বলবে কি হয়েছে ?

ঠাণ্ডা আগুনের মত স্বরে গিন্নী বলল : শুধু ফষ্টি নষ্টি ?

: তবে কি ?

: তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করতে পার।

: তুই বলবিনে শয়তানী··

: বলার আমার কিছু নেই। তোমার করার যদি কিছু থাকে ত কোরো

: আমি ওর মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেলব—

: তার আগে ও তোমার মুণ্ডু কেটে ফেলবে।

: আমার বাড়ীতে এলে জুতিয়ে তাড়িয়ে দেব।

: আমি জঙ্গলে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা কোরব।

: আমি জঙ্গল কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেব

: সে কাঁটাতার ডিঙিয়ে ও চলে আসবে

: দেখতে পেলে আমি ওকে খুন করব

: জানতে পারলে পুলিস তোমাকে ফাঁসি দেবে—

: দিকগে ফাঁসি, তোর তাতে কি ?

: তখন আমি আর একটা বিয়ে করব

সুনন্দ এতক্ষণ চুপ করেছিল এইবার মুখ খুলল। বলল : রাগের মাথায় আপনার স্ত্রী যা বললেন তাই আপনি সত্যি বলে মনে করলেন ?

: না, রাগ পড়লে বুঝলুম কথা কাটাকাটির সময় স্ত্রী যা বলেছে তার সবটা নাও সত্যি হতে পারে। তবু মনের খটকাটা গেল না। ভাবলুম ব্যাপারটার একটা হিল্লে করা দরকার। কোলকাতায় গেলুম সেই উদ্দেশ্য নিয়ে। ঈশ্বর যেন আমার কথা শুনতে পেয়েছিলেন হোটেল থেকে বেরুচ্ছি একটা ছোকরা গোছের গুণ্ডার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বাজিয়ে দেখলুম—মনে হলো লোকটা বিশ্বাসী এবং আমার কাজ ঠিকমতো করতে পারবে। সবচেয়ে ভাল লাগল তার চেহারা—এমন কুৎসিত আর কদর্য চেহারার ছোকরাকে আমার স্ত্রীর কাছে আসতে দিলেও আমার স্ত্রী তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। তবু সাবধানের মার নেই। জঙ্গলের মধ্যে একটা ঘর বানিয়ে দিলুম তার জন্যে। সেখানে সে থাকবে—আমার বাড়ীর পাহারাদার হিসেবে।

এই জঙ্গলটা দেখেছেন তো আমার বাড়ী আর অবিনাশের বাড়ীর মাঝামাঝি। সে সেই ঘরে থেকে দুটো বাড়ীর ওপরই নজর রাখতে পারবে। আর দরকার হলে বাকী ব্যবস্থাটুকুও করতে পারবে।

: ছোকরা কি আপনার বাড়ীর অন্দরে আসত?

: পাগল নাকি মশাই। কাছাকাছি আসতেও মানা ছিল। শুধু তাই নয়, আবার একটা বিশ্বাসী সাঁওতাল ঝিকে বলে রেখেছিলুম ওর ওপর নজর রাখতে। সে বাড়ীর দিকে এলে তার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবার কথাও বলে দিয়েছিলুম। সেই ঝি আমার বাড়ী থেকে ঐ ছোকরাটার জন্যে খাবারটাও নিয়ে যেত। খাবার দিয়ে আসত তাকে।

দিন কতক বেশ চলল। তারপর শ্যামলাল ছোকরা একদিন খবর দিল, অবিনাশকে সে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে এদিকে আসতে দেখেছে। জঙ্গলের পথে কিছুটা এদিকে এসে আবার ফিরে গেছে। [illegible] কখন এ বাড়ীর জানালায় দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। বুঝলুম শ্যামলাল ছোকরা কাজের ছেলে। হাতে নাতে ধরতে পারলে কি কাণ্ড ঘটাত [illegible] আমি কোলকাতায় বেরিয়ে পড়লুম—অবিনাশের সম্বন্ধে কিছু খোঁজ খবর নেবার জন্যে।

সুনন্দ প্রশ্ন করল: যাবার সময় শ্যামলালকে কি নির্দেশ দিয়ে গেলেন?

থতমত ভাবে প্রসাদ সিংহ বললেন: আমি রেগে [illegible] লোক নই মশাই। অবিনাশকে এই জঙ্গলে দেখতে পেলে [illegible] দিতে বলে দিয়েছিলুম। পাছে পরে এ নিয়ে পুলিসে গোলমাল হয় তাই ঘটনাস্থল থেকে দূরে কোলকাতায় একটা হোটেলে থাকলুম সকলের চোখের সামনে।

সুনন্দ বলল: কিন্তু এই রকম ব্যাপারে শ্যামলাল জড়িয়ে পড়লে ব্যাপারটা আপনার পক্ষেও জটিল হয়ে যেত না কি?

: ঠিক তাই। প্রথম উত্তেজনার মুহূর্তে মনে হয়েছিল অবিনাশকে সাবড়ে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার পরেই মনে হোল, তাকে খুন না করে যদি চিরকালের জন্য তার মাথাটা নিচু করে দেওয়া যায় তাহলে সাপও মরে লাঠিও ভাঙে না। কোলকাতার এক ডিটেকটিভ এজেন্সিকে লাগালুম অবিনাশের সম্বন্ধে গোপনে খবর সংগ্রহ করার জন্যে—

: খবর পেলেন কিছু?

: মারাত্মক খবর পেলুম। সে খবর এত সাংঘাতিক যে তা প্রকাশ করে

দিলে অবিনাশ কিছুতেই মাথা তুলতে পারবে না। ব্যাপারটা তার কাকাকে নিয়ে। কাকা কেন নিরুদ্দেশ থাকত আর কেনই বা অবিনাশকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে গেল, তা জানতে পেরে ভাবলুম বাছাধনকে এবার আর মাথা তুলতে হবে না। কোলকাতা থেকে ফিরলুম। এদিকে আমার অনুপস্থিতিতে শ্যামলালও অনেক কিছু করেছে জানতে পারলুম।

সুনন্দ প্রশ্ন করল : শ্যামলাল বলল সে কি করেছে ?

: শুধু বলা নয়, হাতে নাতে প্রমাণ দেখাল। একদিন আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিযে অবিনাশ আসছিল আমার বাড়ীর দিকে। শ্যামলাল তাকে হাণ্টার নিযে তাড়া করায় সে পালিয়ে যায়। সেই সময তার পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো পড়ে যায়।

সোজা হযে বসল সুনন্দ। বলল : সে টুকরোটা শ্যামলাল আপনাকে দেখাল ?

: দেখাল। এখনও সেটা রেখে দিযেছি। আমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে মস্ত প্রমাণ। দেখবেন চিঠিটা ?

প্রসাদ সিংহ দেরাজ থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করলেন। স্ত্রী লোকের হস্তাক্ষরে তাতে দু'লাইন লেখা।

"আজ ও চলে যাচ্ছে। তুমি সন্ধ্যে বেলায় ওখানে থেক।" চিঠির ওপরে কোনও নাম বা সম্বোধন নেই। নিচেও কোন সই নেই।

সুনন্দ চিঠিটা দেখে বলল : আপনার স্ত্রীর হাতের লেখা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তো ?

: না।

: শ্যামলালের কথা যদি ঠিক হয তাহলে এই চিঠিটা বাড়ী থেকে কেউ অবিনাশের কাছে নিযে গিযেছিল।

: ঠিক তাই—

: শ্যামলাল বোধহয অনুমান করেছিল কে নিযে গেছে।

: বাহাদুর ছোকরা শ্যামলাল। তার সন্দেহের কথা আমায় জানিযেছিল। কিন্তু এ বিষয়ে বেশী জোরজার করে হল্লা করতে বারণ করেছিল। কেননা সন্দেহ তো প্রমাণ নয়।

: বোধহয় যে সাঁওতাল ঝিকে শ্যামলালের খবরদারীতে রেখেছিলেন তারই ওপর শ্যামলালের সন্দেহ পড়েছিল ?

সচকিত হয়ে প্রসাদ সিংহ বললেন : ঠিক বলেছেন।

: কিন্তু সে ঝি তো আপনার খুব বিশ্বাসী ছিল···

: তা তো ছিল ?

: সে কি আপনার স্ত্রীর ওপরও নজর রাখত না ?

: তা তো রাখতেই হবে। শ্যামলালের ওপর নজর রাখা মানেই আমার স্ত্রীর ওপরও নজর রাখা।

: এমন একটি ঝিকে যদি কোনও কারণে সরিয়ে নেওয়া যায় তাহ'লে দুজনের ওপর খবরদারিটাই বানচাল হয়ে যাবে নাকি ?

থতমত খেয়ে প্রসাদ সিংহ বললেন : আপনি কি বলছেন, মশাই !

: এখন কিছু বলছি না। যাক্, এরপর আপনি কি করলেন ?

: স্ত্রীর চিঠি পাওয়ার পর স্থির করলুম যে ঝিকেই কেবল বিদায় করলে হবে না, অবিনাশকেও আর ক্ষমা করা যায় না। দোকানে বাজারে পাশের সহরে তার সম্বন্ধে নানা কথা বলে বেড়াতে লাগলুম। একদিন দেখা হল তার সঙ্গে। তাকে বললুম, তাদের পরিবারের সব কাহিনীই আমার জানা। সে যদি পরের হাটবারের মধ্যে সকলের সামনে আমার পায়ে ধরে ক্ষমা না চায় এবং আমাকে জায়গা-জমি বিক্রী করে দিয়ে দেশ থেকে চিরকালের মতো চলে না যায় তাহলে তার বাড়ীর কেচ্ছা সবাই জানবে।

: কি বলল অবিনাশ ?

: সে গম্ভীরভাবে চলে গেল। বুঝলুম সে আমার সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করতে চায়। হুঁসিয়ার না হলে তার হাতে আমার মৃত্যুও হতে পারে। তার বাড়ী আর আমার বাড়ীর মধ্যে ঐ যে জঙ্গল রয়েছে, সেদিন তাকে অপমান করার পর দুপুর বেলা সেই জঙ্গলে ঢুকে একটা গাছে চড়ে বসে রইলুম। গাছটা থেকে তার বাড়ীর ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। দেখলুম বিকেল নাগাদ সে বেশ মাতাল অবস্থায় বাড়ী এল। বন্দুকটা পরিষ্কার করার পর সে কি ভাবল। তারপর সেটাকে রেখে দিয়ে কি একটা জিনিষ তার পকেটে পুরে নিল। এইবার গায়ে একটা ওভারকোট চাপিয়ে সে বেরুবার জন্য তৈরী হল। বুঝতে পারলুম অবিনাশ একেবারে খেপে গিয়েছে। আমাকে কোনও রকমে কাছে পেলেই খুন করে ফেলবে।

সুনন্দ প্রশ্ন করল : ওভারকোটটা কিরকম ছিল আপনার মনে আছে ?

: বিলক্ষণ। এ ধরণের এক জোড়া ওভারকোট সে অনেকদিন আগে তৈরী করিয়েছিল। তখন আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। শিকারের সময় জঙ্গলে ওভারকোটের প্রযোজন হয বলে সে তার একটা আমায় দিয়েছিল। তার সঙ্গে মন কষা-কষির আগে পর্যন্ত তার উপহারের ওভারকোট পরে অনেকদিন শিকার করতে গেছি। তবে ইদানীং তার কোনো জিনিস ব্যবহার করতে আমার প্রবৃত্তি হত না। তা নইলে অবিনাশের ওভারকোটের জোড়া ওভারকোটটা আপনাকে দেখাতে পারতুম।

সুনন্দ বলল : অবিনাশ সেই ওভারকোট পরে আপনার বাড়ীর দিকে আসছে আপনি দেখতে পেলেন ?

: হ্যাঁ। গাছের ওপর থেকে দেখতে পেলুম অবিনাশ আমার বাড়ীর দিকেই আসছে। কিন্তু তখন গাছ থেকে নামা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। সঙ্গে আমার কোন হাতিয়ারও ছিল না। এ অবস্থায় গাছ থেকে নামামাত্র যদি সে আমাকে দেখতে পায তাহলে আমাকে খুন করে তার এলাকার মধ্যে পুঁতে দেবে। ওদিকে শ্যামলালকে আমার বলা আছে যে জঙ্গলের মধ্যে অবিনাশকে দেখলেই সাবাড় করবে। সুতরাং গাছের ওপর বসে থাকাই আমার উচিত, আরও খানিকটা অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামছিল। দেখলুম, সে সেই অন্ধকারের মধ্যেই আমার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপর অন্ধকারে গাছ-পালার ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাকে আর দেখা গেল না। কিছুক্ষণ বাদে আমি গাছ থেকে নেমে বড রাস্তায় বেরিযে অন্যদিক দিয়ে বাড়ী ঢুকলুম। জঙ্গল দিয়ে বাড়ী আসা তখন মোটেই নিরাপদ ছিল না। বাড়ী এসে দেখি স্ত্রীর পাত্তা নেই। ভাবলুম, ভালই হয়েছে, জঙ্গলে যদি অবিনাশের সঙ্গে দেখা করতে গিযে থাকে তাহলে দুজনকেই বন্দুকের গুলিতে সাবাড করে এখানকার পাট তুলে চলে যাব।

: তারপর।—সুনন্দ বলল।

: সন্ধ্যার অন্ধকার গাছ-পালার মধ্যে গভীর হয়ে আছে। গাছের তলায় তলায় বেশ কালো হয়ে উঠেছে। আমার সমস্ত শরীর তখন উত্তেজনায় কাঁপছে। একবার দেখতে পেলে হয, তারপর দুটোকেই শেষ করে চিরকালের মত এ দেশ ছেড়ে চলে যাব। চাপা অন্ধকারে গাছতলার মাঝখানে দিয়ে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ মনে হল, অনেক দূরে কে যেন দৌড়ে পালিয়ে গেল।

: কে? কে পালাল?

: দ্রুতপদে বন্দুক নিয়ে সেই দিকে এগিয়ে চললুম। হঠাৎ আমার সামনে যে দৃশ্য দেখলুম তাতে আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। দেখলুম, গাছ-পালার ঘন অন্ধকারের নীচে ধূসর রঙের ওভারকোট পরে অবিনাশ মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। একটা ছোরা তার পিঠের ওপর ফুঁড়ে রয়েছে। বুঝলুম শ্যামলাল অবিনাশকে খুন করেছে।

আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়ান ঠিক হবে না। আমি স্ত্রীকে যদি খুন করতে না পারি তাহলে সমূহ বিপদ। এখনি গিন্নী গিয়ে থানা পুলিস করবে প্রাণের দায়ে এবং প্রেমের দায়ে। সেও নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে তার প্রাণও আমার কাছে নিরাপদ নয়। কিন্তু এত অন্ধকারের মধ্যে গাছপালার আড়ালে যদি সে লুকিয়ে থাকে তাহলে তাকে খুঁজে বের খুঁজে বের করা অসম্ভব। আর যদি তাকে খুঁজে বের করতে না পারি তাহলে আমার প্রাণ রক্ষাও অসম্ভব কিন্তু বহু খুঁজেও পেলুম না কাউকে—না শ্যামলালকে, না আমার স্ত্রীকে কেউ কোথাও নেই তখন ভয় হল, পুলিসে খবর দিতে যায়নি তো মণিমালা। ভীষণ একটা ভয় আমাকে পেয়ে বসল। বুঝতে পারলুম শ্যামলাল খুন করে গা ঢাকা দিয়েছে। এখন আমাকে বাড়ীতে পেলে পুলিস সমস্ত খুনের দায়িত্ব আমার ওপরই চাপাবে অতএব পালাতে হবে এখনি, নিশ্চয় পুলিস আনতে গেছে মণিমালা। তার ফিরে আসার আগেই পালাতে হবে। সামনে যা কিছু পেলুম একটা সুটকেশে ভরে বন্দুক আর কিছু টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম মোটরে করে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নিরাপদ নয়। দ্রুত মোটর চালিয়ে কোলকাতার দিকে ছুটে চললুম। আমার মোটরের নম্বরটা কিন্তু পুলিসের জানা। তাই পথের মাঝখানে একটা ষ্টেশনের কাছে পুকুরের মধ্যে মোটরটাকে ঠেলে দিয়ে রেলগাড়ীতে চেপে বসলুম।

কোলকাতার একটা হোটেলে মাঝে মাঝে আস্তানা পাততুম। অবিনাশও আসত সে হোটেলে। নাম ভাঁড়িয়ে থাকতুম আমরা ফুর্তির জন্যে। সেই হোটেলে গিয়ে উঠলুম রাত্রিবেলা। এখানে আমি কিছু দিনের জন্যে নিরাপদ।

হোটেলে গিয়ে ভয়ে আর উত্তেজনায় প্রচুর মদ গিললুম। সমস্ত ব্যাপারটা আমি ভুলে যেতে চাই—চরিত্রহীনা মণিমালার আচরণের কথা, গুণ্ডা দিয়ে বন্ধু

হত্যা করার ব্যাপার, পুলিসের অনুসরণ করার ভীতি, ভবিষ্যতের সশ্রম কারাদণ্ডের চিন্তা। সমস্ত কিছু ভুলতে চাই। আকণ্ঠ মদ গিলে দুদিন বেহুঁস হয়ে কাটালুম। তৃতীয় দিন সকালবেলা কদিনের খবরের কাগজগুলো জড়ো করে পড়লুম। না, সাঁওতাল পরগণায় কোনও খুনের খবর নেই। খবরের কাগজের কোনো জায়গায় আমার বা অবিনাশের নামও নেই। তবে কি অবিনাশ মারা যায় নি।

কিছুই বুঝতে পারলুম না। আবার হোটেলের বারে গিয়ে বসলুম। কিন্তু সেখানে এমন একটা জিনিস ঘটল যা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

সুনন্দ মুখ তুলল। বলল: কি জিনিস?

প্রসাদ সিংহ আবার মুখ খুললেন: বারে বসে খবরের কাগজ পড়ছি আর মাঝে মাঝে এক আধ চুমুক মদ খাচ্ছি। এমন সময় বারের আয়নায় একটা ছায়া পড়ল। স্পষ্ট চেনা লোকের একটা প্রতিমূর্তি দেখলাম। অন্যমনস্ক ভাবে সেই দিকে তাকালুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সব রক্ত যেন জল হয়ে গেল। আয়নার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে অবিনাশ। হাত থেকে আমার কাগজখানা পড়ে গেল। ভাবলুম, তবে কি সত্যিই অবিনাশ মারা যায় নি? সে কি ছুরি খেয়ে ভাল হয়ে উঠে আমার সন্ধানে এখানে এসেছে? তাহলে সঙ্গে নিশ্চয়ই সে পুলিস এনেছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য। তার মুখে কোন বিদ্বেষের ছাপ দেখলুম না। সে যেন সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সে যেন বেশ কিছুটা আনন্দ পেল। আমিও তাকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। তাকে খুন করার ব্যাপার থেকে আমি তাহলে সম্পূর্ণ মুক্ত। অবশ্য তাকে মারবার চেষ্টা করেছিল শ্যামলাল। তার সঙ্গে আমার ষড়যন্ত্রের ব্যাপারটা প্রকাশ পেলেই বা আমার এমন কি গুরুতর শাস্তি হবে! অবিনাশ তো বেশ সুস্থই আছে।

আশ্চর্য! শান্ত ভাবে অবিনাশ আমার দিকে এগিয়ে এল। আমিও তাকে পাশে ডাকলুম। দুজনে খানিকটা মদ খেলুম। তারপর সেও চলে গেল, আমিও চলে গেলুম। না এল পুলিস, না ঘটল অন্য কিছু।

কি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলুম না। তখন একটা সন্দেহ আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল। তবে কি অবিনাশ আহত হয়নি? অবিনাশকে মারতে

গিয়ে শ্যামলালই কি অবিনাশের হাতে ছোরা খেয়ে মারা গেছে ? শ্যামলালকে ছুরি মারার পর ওভারকোট দিয়ে তার শরীরটাকে ঢেকে দিয়ে থাকে তাহলে ছুরির হাণ্ডলটা বাইরে জেগে থাকে কি করে !

সুনন্দ বলল : ঠিক কথা। তাহলে মৃতদেহ থেকে ছুরি খুলে ওভারকোট পরিয়ে আবার ওপর থেকে ছুরি মারতে হয়।

প্রসাদ সিংহ বললেন : ব্যাপারটা দাঁড়ায় সেই রকমই। অথচ ভূত যদি বিশ্বাস না করি, তাহলে অবিনাশ বা শ্যামলাল কেউ একজন নিশ্চয়ই ছুরির আঘাতে এভাবে পড়েছিল।

অবিনাশ যেভাবে হোটেলে এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেল তাতে মনে হয় শ্যামলালই মারা গেছে। কিন্তু শ্যামলালের দেহে ওভারকোটই বা এল কোথা থেকে ? আর ওভার-কোটের ওপর ছুরির ফলাটাই বা জেগে থাকে কি করে ?

ভাবলুম, একবার সাঁওতাল পরগণায় ছুটে যাই। দেখে আসি কি ব্যাপার। কিন্তু শ্যামলাল যদি মারা গিয়ে থাকে তাহলে পুলিস আমার খোঁজ করবেই। যে মুহূর্তে আমি বাড়ীতে ফিরব সেই মুহূর্তেই পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করবে।

তারপর মনে হোলো অবিনাশ তো আমার হোটেলের সন্ধান জানে। সে তো ইচ্ছে করলেই পুলিসকে আমার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারত। কিন্তু দেয়নি, তার কারণ সে নিজেই এ ব্যাপারে জড়িত। অতএব অবিনাশও যখন এ ব্যাপারে জড়িত তখন নিশ্চয়ই পুলিস তারও সন্ধান করবে। আমার সঙ্গে এই হত্যার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, কিন্তু তার সঙ্গে আছে। পুলিস যদি আমাকে ধরে। তাহলে সামান্য শাস্তির বেশী আর কিছু হবে না আমার। কিন্তু তার শাস্তি হবে মৃত্যু। আর সে শাস্তির কারণ হব আমি।

…হো :……হো : …· হো :……করে আপন মনে হেসে উঠলুম। প্রতিহিংসা……প্রতিহিংসা। আমার সমস্ত মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। যে আমার জীবন নষ্ট করেছে, আমার স্ত্রী মণিমালার মতো মেয়েকে নষ্ট করেছে, তার যাতে ফাঁসি হয় সেচেষ্টা আমাকে করতেই হবে।

সাঁওতাল পরগণায় আমাকে যেতেই হবে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

হোটেলের ম্যানেজার ফোন করছে, আমার একটা জরুরী চিঠি এসেছে

বেয়ারিং পোষ্টে। পিওনকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে কি ?

চমকে উঠলুম আমি : আমার চিঠি ! আমার এখানকার নাম ঠিকানা সবই তো ভুয়ো। এ ভুয়ো নাম-ধাম জানা আছে কেবল অবিনাশের আর শ্যাম লালের। অবিনাশের সঙ্গে তো কিছু আগেই দেখা হয়েছে। তার কাছ থেকে বেয়ারিং চিঠি আসার কোনও কারণ নেই। সে তো ম্যানেজারের হাতেই সিল করে কোনও চিঠি দিতে পারত। তবে কি শ্যামলালও মারা যায় নি ?

ম্যানেজারকে বললুম পিওনকে পাঠিয়ে দিতে। পিওন চিঠি দিয়ে গেল, সাঁওতাল পরগণার চিঠি। হস্তাক্ষর মণিমালার। ওপরে লেখা—গোপনীয় ও জরুরী। পিওনকে পয়সা দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চিঠি খুললুম।

সুনন্দ এবার সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করল : আপনার স্ত্রী কি লিখেছিলেন ?

: যা লিখেছিল তার কোনও মানে বুঝতে পারিনি।

: তার মানে ?

: কথাগুলো এখনও আমার মনে গেঁথে রয়েছে। সে লিখেছিল, তোমাকে বোধহয় এখনও কিছুটা ভালবাসি। তাই চিরদিনের মতো যাবার আগে তোমার বাঁচার ব্যবস্থা করে গেলাম। আশা করি, কৃতজ্ঞ থাকবে।

সুনন্দ প্রশ্ন করল : কিন্তু মণিমালা দেবী তো আপনার ভুয়ো নাম বা হোটেলের ঠিকানা জানতেন না। তিনি কি করে ঠিকানা যোগাড় করলেন ?

: আশ্চর্যের কথা। হয় অবিনাশের কাছ থেকে, নয় তো শ্যামলালের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করেছে। সম্ভবত শ্যামলালের কাছ থেকেই পেয়েছে। সে বোধহয় তাকে সেবা করে বাঁচিয়ে তুলেছে। ভাবলুম যাই হোক এখন কোনও হত্যার সঙ্গেই যখন আমার যোগ নেই তখন সাঁওতাল পরগণায় ফিরে যেতেও কোনও বাধা নেই। তাছাড়া মণিমালার কাছে কৃতজ্ঞই বা থাকতে হবে কেন, জানা দরকার।

সেই রাত্রেই ট্রেনে করে সাঁওতাল পরগণায় ফিরলুম। ফিরে পুরোনো ঝির কাছে খবর পেলুম গিন্নীমা চলে গেছেন। আর যাবার সময় বলে গেছেন যে, তিনি শ্যামলালকে বরখাস্ত করে বিদায় করে দিয়েছেন।

অত্যন্ত বিরক্ত হলুম ঝিয়ের কথায়। আমার বিশ্বাসী লোককে এইভাবে বিদায় করার কোনও অধিকার মণিমালার ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারলুম না যে, মণিমালা কোথায় গেল। শ্যামলালই বা কোথায় ?

বুঝতে পারলুম না, শ্যামলাল আমার কাছে সরাসরি এল না কেন? বুঝতে পারলুম না, সেদিন যে হত্যাকাণ্ড দেখলুম তা স্বপ্ন না সত্যি। সত্যি যদি নাই হবে তাহলে স্ত্রী আমার প্রাণ বাঁচালেন কি করে।

প্রসাদ সিংহ থামলেন। সুনন্দ বলল, রহস্যটা আপনি যতখানি জটিল মনে করেছেন ততখানি জটিল বোধহয় নয়। সব শুনে মনে হচ্ছে সমস্ত রহস্যের মূল সূত্র রয়েছে কোলকাতায়। আমাকে সেখানে একবার যেতে হবে। কিন্তু তার আগে আপনার স্ত্রীর একখানা ফোটো এবং বিয়ের আগে তিনি কোন্ কোন্ ফিল্মে নেমেছিলেন তা জানা দরকার।

প্রসাদ সিংহ এক মিনিট কাল কি ভাবলেন। তারপর বললেন: মণিমালার একটি মাত্র ফোটোই আমার কাছে আছে। বিয়ের পরে তোলা আমাদের দুজনের ফোটো। তারপর কোনও ক্যামেরাম্যানের সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রীকে ফোটো তুলতে দিইনি।

: বেশ, সে ফোটোটাই দেখান।

: চলুন।

প্রসাদ সিংহ সুনন্দকে নিয়ে শয়নকক্ষে ঢুকলেন। খাটের মাথায় দম্পতির একটা চমৎকার ছবি। নববিবাহিতা মণিমালা, পাশে প্রসাদ। ফোটোতে এক ফোঁটা ধুলো জমেনি। তলায় একটা ধূপ জ্বলছে। দুপাশে ফুলদানিতে দুটি রজনীগন্ধার ঝাড়।

সুনন্দ প্রশ্ন করল: আপনি স্ত্রীকে এখনও খুব ভালোবাসেন, তাই না?

থতমত খেয়ে প্রসাদ সিংহ বললেন: ফোটোর যত্ন দেখে তাই মনে করছেন বুঝি! কিন্তু সেদিন তো তাকে খুন করতেই গিয়েছিলুম!

সুনন্দ বলল: ওথেলোর দিন থেকে আজ পর্যন্ত অনেক স্বামীই স্ত্রীকে গভীরভাবে ভালবেসেছে বলেই খুন করতে গেছে।… যতদূর মনে হয় আপনার স্ত্রীর মধ্যেও এই Ambivalence ছিল।

: কি ছিল?

: একই সঙ্গে ঘৃণা ও ভালবাসা। হয়তো এখনও তাই আছে আপনার মতই।

প্রসাদ সিংহ চকিতভাবে বললেন: মণিমালা কি এখনও বেঁচে আছে? তার কোনও সন্ধানই তো আমি অনেক চেষ্টা করেও পাইনি!

: যদি সন্ধান পাই তাহলে কি বলব?

: কি বলবেন ? না না, বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে তার অনেক টাকার গয়না আমার কাছে রয়ে গেছে। বলে দেবেন, কোনও লোক পাঠিয়ে নিয়ে যেতে পারে, আমি বাধা দেবনা।

প্রসাদ সিংহ অন্যদিকে চোখ ফেরালেন—বোধহয় উদ্গত চোখের জল লুকোবার জন্যেই।

॥ চার ॥

মহীয়সী মহিলা

সিনেমা ও রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত বিমল সেন। পত্র-পত্রিকায় তারকাদের জীবনচরিত লেখাই তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতির মূলে। মণিমালা দেবীর বিয়ের সময়কার ফোটো নিয়ে সুনন্দ দেখা করল তাঁর সঙ্গে। বিমল সেন অনেকক্ষণ ধরে ফোটোটা দেখলেন, তারপর বললেন: এই ফোটোর সঙ্গে চিত্রিতা দেবীর বেশ কিছুটা মিল লক্ষ্য করছি। কিছুদিন হল উনি আবার রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়েছেন, তবে সম্প্রতি কোন ফিল্মে নামছেন বলে শুনিনি। বয়স হয়ে গেছে · এখন পার্শ্ব চরিত্রেই অভিনয় করেন।

সুনন্দ বিমল সেনের কাছ থেকে চিত্রিতা দেবীর বিষয়ে আরও কিছু বিবরণ সংগ্রহ করল। তারপর নিজে নানা জায়গায় ঘুরে অনুসন্ধান শেষ করল। অবশেষে একদিন সকালে ল্যান্সডাউন রোডের একটা বড় বাড়ীর সামনে তার মোটর এসে দাঁড়াল।

চিত্রিতা দেবী বাড়ীতেই ছিলেন। অল্প কিছুক্ষণ পরেই ড্রয়িংরুমে দেখা দিলেন। সুনন্দ হাত তুলে নমস্কার করে চিত্রিতা দেবীর চেহারাখানা ফোটোর সঙ্গে মনে মনে মিলিয়ে নিল।

বসতে বললেন চিত্রিতা দেবী। তারপর প্রশ্ন করলেন: আমার সঙ্গে কি একটা জরুরী দরকার আছে লিখেছেন। কি ব্যাপার, বলুন তো ?

: সম্প্রতি সাঁওতাল পরগণায় গিয়েছিলাম একটা রহস্যের সন্ধানে—

: আপনি ?

: প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এই কার্ডটায় আমার পরিচয় লেখা আছে।—বলে নিজের কার্ডটা এগিয়ে দিল সুনন্দ।

চিত্রিতা দেবী কার্ডটা দেখে বললেন : খনামধন্য ব্যক্তি আপনি। কিন্তু আমার সঙ্গে কি দরকার থাকতে পারে বুঝতে পারছি না তো।

: সাঁওতাল পরগণায় যে রহস্যের সন্ধানে গিয়েছিলাম তার চাবিকাঠিটা যে আপনার কাছেই আছে।—মৃদু হেসে বলল সুনন্দ।

: আমার কাছে ?

: হ্যাঁ। এই ফোটোটা কখনও দেখেছেন ?—বলে ফোটোটা পকেট থেকে বার করে টিপয়ের উপর রাখল সুনন্দ।

চিত্রিতা দেবী ফোটোটা তুলে নিলেন। তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন : হয়ত দেখে থাকব। কিন্তু আপনি কোথায় পেলেন এই ছবি ?

: সাঁওতাল পরগণায় ঐ রহস্যের সন্ধানে গিয়ে প্রসাদ সিংহের শোবার ঘরে এই ফোটোটা দেখতে পাই। ফোটোটার তলায় তখন ধূপ জ্বলছিল। দুপাশে রজনীগন্ধার ঝাড় ছিল ফুলদানিতে·· ···।

বিস্মিত ভাবে চিত্রিতা দেবী বললেন : এই পুরোনো ফোটোর তলায় ধূপ দেবার মত পাগল আছে নাকি কেউ ?

: আপনি আমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। প্রসাদ বাবু কেবল ধূপই দেননা ফোটোতে, তিনি জানিয়েও দিয়েছেন যে মণিমালা দেবীকে তিনি তাঁর সব গয়নাগুলো ফেরৎ দিতে চান। একটা চিঠি দিলেই মণিমালা দেবী সেগুলো নিজের কাছে আনতে পারেন।

: মণিমালা আবার কে ?—না চেনার ভান করেন চিত্রিতা দেবী।

সুনন্দ গম্ভীর গলায় বলল : দেখুন চিত্রিতা দেবী, রহস্য উদঘাটন করাই আমার পেশা। মণিমালা দেবী সম্বন্ধে বহু খবরই পেয়েছি। কেবল দু'একটি বিষয়ে আমার কিছু জানবার রয়েছে। সেই সম্বন্ধেই আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

চিত্রিতা দেবী চুপ করে রইলেন।

সুনন্দ বলল : মণিমালার দেবীর জন্ম···শিক্ষা···বিবাহ·· সব কিছুর সন তারিখ এই কাগজে লেখা আছে।

চিত্রিতা দেবী এবার চোখ তুলে তাকালেন কাগজের দিকে।

সুনন্দ প্রশ্ন করল : সব ঠিক আছে ?

হাসলেন চিত্রিতা দেবী। কথা বললেন না।

সুনন্দ আবার বলল : কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। মণিমালা

দেবী যদি প্রসাদ সিংহকে ভাল না বাসবেন তাহলে সিনেমা থিয়েটার ছেড়ে সাঁওতাল পরগণায় নির্জন বন্দী জীবন বরণ করে নিলেন কেন? বিয়ের আগে যাকে ভালবেসেছিলেন সেই শৈলেন চৌধুরীকেই বা বিয়ে করলেন না কেন?

: শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে মণিমালার কি সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন?—মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন চিত্রিতা দেবী।

: শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে অভিনয় করতে করতে মণিমালা তাঁকে ভালবেসে ফেলেন।

: অভিনয়ে নায়ক-নায়িকা হলেই বুঝি ভালবাসাবাসি হতে হয়?

: সবক্ষেত্রে না হলেও এক্ষেত্রে হয়েছিল।

: না এক্ষেত্রে হয়নি। মণিমালা শৈলেনকে বন্ধুর মতই দেখত।

: কিন্তু শৈলেন চৌধুরী যে তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন একথা তো সিনেমা-জগতে সবাই জানে।

: কিন্তু সে প্রস্তাব তো মণিমালা গ্রহণ করেনি। সে তো প্রসাদ সিংহকেই বিয়ে করেছিল।

: বিয়ে করেছিলেন বটে, কিন্তু মন দিয়েছিলেন কি?

হাসলেন চিত্রিতা দেবী। বললেন: অভিনেত্রী মণিমালা রঙ্গমঞ্চের অনেক মানুষের মধ্যে লাবণ্য দেখেছিল। কিন্তু প্রসাদ সিংহের মধ্যে যে বন্যভাব ছিল তার মধ্যে পাউডার এবং মিষ্টি কথা ছিলনা বটে, কিন্তু তার মধ্যেকার প্রাণ দেখে মণিমালা মুগ্ধ হয়েছিল।

: মুগ্ধ হয়েছিলেন তো শৈলেন চৌধুরীও সেই সাঁওতাল পরগণায় গিয়ে হাজির হলেন কেন?

: কে বলল সে কথা? প্রসাদবাবু?

: না প্রসাদবাবু জানতেন না যে কোলকাতা শহর থেকে যে ঈশ্বরের প্রেরিত গুণ্ডাটিকে তিনি সাঁওতাল পরগণায় নিয়ে গিয়েছিলেন সে আসলে ঈশ্বর-প্রেরিতও নয় গুণ্ডাও নয়।

চিত্রিতা দেবী চুপ করে রইলেন।

সুনন্দ আবার বলে চলল: প্রসাদ সিংহ চাইছিলেন একটা কদর্য গুণ্ডাকে তাঁর জঙ্গল পাহারা দেবার জন্য। হঠাৎ তাঁর সঙ্গে অমন একটি লোকের আকস্মিক আলাপ হয়ে গেল কোলকাতায়। শ্যামলালকে কুৎসিত দেখে খুশী

হয়েছিলেন প্রসাদ সিংহ। সারাজীবনে নানারকম make up নিয়েছিলেন শৈলেন চৌধুরী—শ্যামলালের ভূমিকায় ভাল অভিনয়ই করেছিলেন তিনি। প্রসাদ সিংহ বুঝতে পারেন নি যে মণিমালা দেবী শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে এই ধরনের একটা ষড়যন্ত্র করেছিলেন।

চিত্রিতা দেবী বিরক্তভাবে বললেন : ভুল হল আপনার। মণিমালা আদৌ জানত না যে শৈলেন চৌধুরী তার সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্যামলাল সেজে সাঁওতাল পরগণায় গেছে। মণিমালা যদি স্বেচ্ছায় নির্বাসন না বরণ করত তাহলে শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে তার সাক্ষাতে কোন বাধা ঘটত না।

: তবে মণিমালা জানলেন কি করে যে শৈলেনেই শ্যামলাল? প্রসাদ সিংহ তো দুজনকে কখনই কাছাকাছি হতে দেননি। সেক্ষেত্রে শ্যামলালের পক্ষে মণিমালাকে খবর দেবার কথাই উঠতে পারে না।

: অথচ শ্যামলালই মণিমালাকে জানিয়েছিল যে সে আসলে শৈলেন চৌধুরী।

চমকে উঠল সুনন্দ। বলল : কিভাবে খবর দিলেন শৈলেন চৌধুরী? আমি অনেক চিন্তা করেও বুঝতে পারছি না।

হাসলেন চিত্রিতা দেবী। বললেন : আপনি বুদ্ধিমান হতে পারেন, কিন্তু শৈলেন চৌধুরীর বুদ্ধির তুলনা হয়না। মণিমালা শ্যামলালের ভাত রান্না করে সাঁওতাল ঝিয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিত। একদিন ঝি ভাতের থালা নিয়ে মণিমালার কাছে ফিরে এল। বলল, শ্যামলাল বলেছে যে গিন্নীমা যেন ভাতটা অর্ধেক তুলে রাখেন। তার খিদে নেই। বিকেল বেলা ঐ ভাতটা যেন তাকে জল-খাবার হিসেবে দিয়ে দেওয়া হয়।

: তারপর?

: মণিমালা থালা থেকে ভাতটা অর্ধেক করে তুলে রাখতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

: কেন?

: ভাতের স্তূপের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ছিল একটা কাগজ! অর্ধেকটা ভাত সরাতে তা বেরিয়ে পড়ল। তাতে লেখা—"আমি শৈলেন। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

: আপনি কি করলেন?

: আমি, আমি……

চিত্রিতা দেবী থতমত খেলেন।

সুনন্দ বলল : মানে মণিমালা দেবী কি করলেন ?

: মণিমালার মাথায় ভূত চেপেছিল। সে আবার সেই ভাতের স্তূপের মধ্যে একটা ছোট কাগজে উত্তর দিয়ে, ভাত গুছিয়ে পাঠিয়ে দিল।

: দেখা হয়েছিল শৈলেন চৌধুরীর সঙ্গে ?

: হয়েছিল। কিন্তু শৈলেন যা চেয়েছিল মণিমালা তাতে রাজী হয়নি। মণিমালা শৈলেনকে চলে যেতে বলেছিল। কিন্তু শৈলেন বলেছিল যে সে মণিমালার কাছে অপ্রাপ্য কিছু চাইবে না। সে কেবল তার সঙ্গে একটু গল্প করতে, দুটো কথা বলতে চায়। আর সেই সামান্য চাওয়ার জন্যেই সে নিজের শিল্পী জীবন শেষ করে দিয়ে এসেছে। তারই জন্যে সে এখন প্রসাদ সিংহের মত সুদক্ষ শিকারীর বন্দুকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে—এই সামান্য ভিক্ষা না দেবার ক্ষমতা ছিল না মণিমালার। অবশ্য মণিমালা জানত সে তার স্বামীকে ঠকাবে না। তাছাড়া সে বড় নিঃসঙ্গ ছিল। তাই শৈলেনের কথায় রাজী হল মণিমালা।

: কিন্তু প্রসাদ সিংহ যদি কোন দিন দুজনকে জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পেতেন।

: প্রসাদ সিংহ যেদিন বাড়ী থাকতেন না সেদিনই দুজনের দেখা হত।

: শৈলেন চৌধুরীর কাছে মণিমালা বোধহয় ঐ রকম করে চিঠি পাঠিয়ে লিখতেন,—"আজ ও চলে যাচ্ছে তুমি সন্ধ্যাবেলায় ওখানে থেক"—তাইনা।

: চিঠির ভাষাটা জানলেন কি করে ?

হাসল সুনন্দ। বলল : কিন্তু যদি ঝিয়ের নজরে পড়ত……

চিত্রিতা দেবী বললেন : বলেছি ত শৈলেনের বুদ্ধি ছিল অদ্ভুত। সে শীতের জন্যে একটা ওভারকোট চেয়েছিল। একটা পুরোনো ওভারকোট পড়েছিল বাড়ীতে। বন্ধুর কাছ থেকে পেয়েছিল প্রসাদ সিংহ। পরে বন্ধুর সঙ্গে নানা কারণে মনোমালিন্য হওয়ায় ফেলে দিয়েছিলেন সেটা। মণিমালা সেই ওভারকোটটা সানন্দে দান করেছিল শ্যামলালকে।

: বুঝেছি। দূর থেকে গিন্নীমার সঙ্গে বাবুর ওভারকোট পরা শ্যামলালকে দেখে ঝি ভাবত বাবুই বোধহয় গল্প করছেন।

: ঠিক তাই। তাছাড়া জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার নামলে কাছের মানুষকেই ভাল করে দেখা যায় না……

সুনন্দ এবার চকিত প্রশ্ন করল : তাহলে অবিনাশ বাবুর ওভারকোটটাই শৈলেন চৌধুরীর ছদ্মবেশ হয়েছিল ?

চমকিত হলেন চিত্রিতা দেবী।

সুনন্দ বলল : সেদিন তাহলে শৈলেন চৌধুরীই ঐ ওভারকোটটা পরে মণিমালা দেবীর জন্যে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে ছিলেন ?

পাংশুমুখে চিত্রিতা দেবী বললেন : কোন দিন ?

: যেদিন খুন হলেন শৈলেন চৌধুরী।

চিত্রিতা দেবী দুহাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলেন।

প্রবল চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন : উঃ সে কি সাংঘাতিক দৃশ্য ! অন্ধকারের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে শৈলেন। তার পিঠের ওপর ফুঁড়ে রয়েছে একটা ছোরা। অন্ধকারের মধ্যেও ছোরাটা চিনতে ভুল হয়নি মণিমালার·· তার স্বামীর নাম-লেখা ছোরা। তার মনে হয়েছিল, প্রসাদ সিংহ নিশ্চয়ই তাদের দেখাসাক্ষাতের আঁচ পেয়েছে। সুতরাং শৈলেনকে শেষ করে শিকারী এবার মণিমালার সন্ধান করবে নিশ্চয়ই······

সুনন্দ প্রশ্ন করল : মণিমালা কি পালিয়ে গেলেন ?

: সেই জঙ্গলের মধ্যে স্বামীর ভয়ে সারারাত গাছে উঠে রইল মণিমালা। দেখল, প্রসাদ এল বনের ভেতরে। তন্ন তন্ন করে খুঁজল মণিমালাকে। তারপর বোধহয় পুলিসের ভয়ে মোটর নিয়ে পালিয়ে গেল প্রসাদ······সকাল হলেই মৃতদেহের সন্ধান পাবে মানুষ ····গণ্ডগোল বাড়বে······পুলিস আসবে—

: তাই মণিমালা শৈলেনের ওভারকোটের পকেটগুলো ভারী ভারী পাথরে বোঝাই করে তার দেহটা ফেলে দিলেন নদীতে ?

ম্লানভাবে চিত্রিতা দেবী বললেন : এছাড়া আর কি করার ছিল তার। শৈলেন তখন একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—

সুনন্দ বলল : আর, সে ছুরিটা ? যেটার গায়ে প্রসাদ সিংহের নাম লেখা ছিল······

: মণিমালা কি চাইতে পারে তার স্বামীর ফাঁসি হোক। যত অপরাধই করুক, প্রসাদ তার স্বামী। ছুরিটা খুলতে হয়েছিল শৈলেনের শরীর থেকে তাতেই সারাটা পথে রক্তের ফোঁটা ঝরতে ঝরতে গিয়েছিল বোধহয়। মণিমালা বন্ধুর দেহটা জলের তলায় শুইয়ে দিয়ে প্রার্থনা করল তার জন্য। তারপর

ছুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জলের মধ্যে···

চিত্রিতা দেবী চুপ করে রইলেন।

অভিভূতের মত সুনন্দ বলল: প্রণাম জানাই আপনাকে, আপনি মহীয়সী মহিলা। কিন্তু এত ভালবাসা নিয়েও স্বামীর কাছ থেকে সরে এসে বাঁচলেন কি করে?

: বাঁচলাম কই? মরে গেছি। একদম মরে গেছি। সিনেমায় গেলাম না। চারিদিকে ছবি দেখান হয়··· স্বামী সন্ধান পাবে। তাই থিয়েটারে ঢুকে পেট চালাচ্ছি কোন রকমে।

: কিন্তু মন?

: মনের খবর কে রাখে?

সুনন্দ বলল: আবার প্রণাম জানাই চিত্রিতা দেবী। কিন্তু ভুল আপনারও হয়েছিল। প্রসাদবাবু শৈলেন চৌধুরীকে খুন করেন নি।

: সে কি। আমি—মানে মণিমালা যে নিজের চোখে দেখেছে।

: তবু বলি আপনার ভুল হয়েছে। শুধু আপনার কেন? আপনার প্রসাদবাবুর, অবিনাশবাবুর সকলের।

: আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

: একটু ধৈর্য ধরুন সবই বুঝতে পারবেন। আমি দু-একদিনের মধ্যে আপনার বাড়ীতেই এই রহস্যের ওপর যবনিকাপাত করতে চাই। আপনার অসুবিধে হবে না নিশ্চয়ই?

: কিন্তু আমাকে কি করতে হবে?

: কিছুই করতে হবে না। আপনি কেবল পাশের ঘরে বসে থাকবেন। আমি অবিনাশ বাবু আর প্রসাদ সিংহকে আপনার এখানেই নিয়ে আসব।

: কিন্তু ওদের সামনে আমি বেরুতে চাই না।

: ওরা জানবেও না কার বাড়ীতে এসেছে। আপনি রাজি?

: বেশ, তাই হোক।

॥ পাঁচ ॥

শেষ না শুরু

অবিনাশবাবু ও প্রসাদবাবু উভয়েই যথা সময়ে জরুরী চিঠি পেলেন সুনন্দর। কৌতূহল চাপতে না পেরে অবিনাশবাবু আগেই বেরিয়ে পড়লেন। বিশেষতঃ তাঁরই আহ্বানে সুনন্দ গিয়েছিল সাঁওতাল পরগণায়।

প্রসাদ সিংহ প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়লেন। তারপর ভাবলেন, সুনন্দ লিখেছে যে সে মণিমালার সন্ধান পেযেছে এবং প্রসাদের মারাত্মক ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করতে চায় সে। এ অবস্থায় কোলকাতা না যাওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। শেষ পর্যন্ত মোটরেই পাড়ি জমালেন কোলকাতায়।

শুক্ল পক্ষের একাদশী।

চাঁদ উঠেছে শহরের মাথার উপর। রাত্তিরটাকে সেখানে পাওয়া যায় না ভাল ক'রে। কোলকাতা···কত আলো···কত গাড়ী। মণিমালা কিন্তু বড় ভালবাসত এই জ্যোৎস্না রাত। মনকে শক্ত করলেন প্রসাদ সিংহ। শহরে এসে ঝেড়ে ফেললেন মণিমালার চিন্তা। একটা লোহা বাঁধান লাঠি নিয়ে ল্যান্সডাউনের নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে হাজির হলেন প্রসাদ সিংহ। বাড়ীর নম্বর মিলিয়ে ভিতরে ঢুকতে ইতস্ততঃ করছেন এমন সময় ছাদের উপর থেকে আহ্বান ভেসে এল সুনন্দর, "উঠে আসুন প্রসাদবাবু···আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা।"

প্রসাদবাবু উপরে উঠে অবিনাশবাবুকে দেখতে পেয়ে একটু বিব্রত বোধ করলেন। সুনন্দ বলল: ভুল বুঝেছিলেন প্রসাদবাবু · অবিনাশবাবু বিশ্বাসঘাতক নন।

অবিনাশবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন: বিশ্বাসঘাতক !·· প্রসাদ কি আমাকে বিশ্বাসঘাতক মনে করত ! কিন্তু কেন ?

সুনন্দ খুলে বলল সব কথা। শোনাল প্রসাদ সিংহ কেমনভাবে নিজের স্ত্রীর প্রতি গভীর সন্দেহবশে এক গুণ্ডা ছোকরা নিয়ে আসেন অবিনাশবাবুকে শায়েস্তা করার জন্যে। প্রসাদবাবুকে সে একদিন দেখাল অবিনাশবাবুকে লেখা মণিমালার চিঠি—

অবিনাশবাবু প্রতিবাদ করলেন: আমাকে লেখা মণিমালার চিঠি!

আশ্চর্য। আমি হলপ করে বলতে পারি এমন কোনও চিঠি মণিমালা আমাকে লেখেন নি।

উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন প্রসাদ সিংহ : মণিমালা লেখেনি তোমাকে —"আজ ও চলে যাচ্ছে, তুমি সন্ধ্যা বেলায় ওখানে থেক।" "

অবিনাশবাবু বললেন : আশ্চর্য ব্যাপার তো!

সুনন্দ বলল : আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। চিঠিটা মণিমালা দেবী লিখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আপনাকে নয়। শৈলেন চৌধুরীকে। হ্যাঁ শ্যামলাল রূপী শৈলেন চৌধুরীকে।

সুনন্দ তখন মণিমালা আর শৈলেন চৌধুরীর সমস্ত ঘটনা পুনরাবৃত্তি করল।

একটু চুপ করে প্রসাদ সিংহ বললেন : কিন্তু শৈলেন চৌধুরীকে লেখা চিঠি আমাকে দেখিয়ে কি লাভ?

: আপনার মনে হবে শ্যামলাল খুব বিশ্বাসী আর কাজের লোক। এরপর যদি কোনও দিন শ্যামলাল আর মণিমালাকে আপনার ঝি একত্রে দেখতেও পায় তাহলেও আপনার মনে সন্দেহ জাগবে না কারণ শ্যামলালের কদর্য রূপ আর বিশ্বাসী চরিত্র আপনার মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। এছাড়া শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার অজুহাতে অবিনাশবাবুর দেওয়া সেই ওভারকোটটা ইতি-মধ্যে মণিমালা দেবীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলেন শৈলেন চৌধুরী। উদ্দেশ্য দূর থেকে দেখলে যাতে ঝি মনে করে আপনিই আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছেন।

অবিনাশবাবু চকিত ভাবে বললেন : তাহলে সেদিন ওভারকোট পরা যাকে দেখেছিলাম সে কি শৈলেন চৌধুরী—

সুনন্দ বলল : হ্যাঁ। শ্যামলাল বা শৈলেন চৌধুরী সেদিন মণিমালা দেবীর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন আপনার বাড়ীর দিকে পিছন ফিরে, প্রসাদবাবুর অন্দর মহলের দিকে তাকিয়ে। আপনি প্রসাদবাবু মনে করে সেদিন তাঁকেই আঘাত করেছিলেন।

সুনন্দ মণিমালা দেবীর কাছ থেকে সংগৃহীত বিবরণ পুনরাবৃত্ত করল।

প্রসাদ সিংহ ম্লান ভগ্ন কণ্ঠে বললেন : মণিমালা এত নীচ···

সুনন্দ বলল : আপনি তো আগেই জানতেন যে মণিমালা দেবী চরিত্রহীন। তবে আগে মনে করেছিলেন অবিনাশবাবুর সঙ্গে, এখন জানলেন শৈলেন

চৌধুরীর সঙ্গে। তাতে নতুন করে কি ক্ষতি হলো আপনার ?

প্রসাদ সিংহ এক মুহূর্তে যেন বুড়ো হয়ে গেলেন। অসুস্থের মত ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন: তাইতো! মণিমালার দোষগুণ বিচার করার আমি কে? আমিই কি তাকে কম কষ্ট দিয়েছি।

: ঠিক কথা। শুনলে হয়তো আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে আপনার জন্তেই মণিমালা দেবী শৈলেন চৌধুরীর মৃতদেহ জলে ফেলে দিয়েছিলেন। ছুরিটাও তাঁর শরীর থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। আশা করি তাঁর দোষগুণ বিচার করার সময় এ কথাগুলো ভুলে যাবেন না।

খানিকটা গুম হয়ে বসে রইলেন প্রসাদবাবু। অবিনাশবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: আমায় ক্ষমা কর ভাই।

অবিনাশবাবু উঠে এলেন প্রসাদ সিংহের কাছে। কিছুক্ষণ বাদে প্রসাদ সিংহ আবার প্রশ্ন করলেন সুনন্দকে: মণিমালা কি বেঁচে আছে ?

: থাকলে আপনার লাভ ?

: না না, লাভ লোকসানের কথা নয় সুনন্দবাবু। যদি দেখা হয় তার সঙ্গে, বলবেন তাকে আমি ক্ষমা করেছি। সেও যেন আমাকে ক্ষমা করে। আজ মনে হচ্ছে সে বোধহয় আমাকে খুবই ভালবাসত। নইলে তার উজ্জ্বল ফিল্ম-কেরিয়ার···যশ···অর্থ···সব পেছনে ফেলে আমার জন্তে সাঁওতাল পরগণার ঐ পাণ্ডব-বর্জিত অঞ্চলে নির্বাসন বরণ করে নেবে কেন ? না, না, এ ভালই হয়েছে। আমিও তাকে ফাঁকি দিয়েছি, সেও আমাকে ফাঁকি দিয়েছে।— হঠাৎ যেন অস্থির হয়ে উঠলেন প্রসাদ সিংহ।

এমন সময় নেপথ্য হতে একটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল—

: না, না,—মণিমালা তোমায় ফাঁকি দেয় নি।

চমকে উঠলেন প্রসাদ সিংহ·· কার গলা !

:·· কে ? কে কথা কইল ওখান থেকে ?

: আমি···

স্বর লক্ষ্য করে টলতে টলতে এগিয়ে গেলেন প্রসাদ সিংহ পাশের ঘরের দিকে।

: মণি···তুমি···তুমি এখানে···

শোনা গেল অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ : ভাল আছ তুমি ?

: আর ভাল !

ম্লান হাসলেন প্রসাদ সিংহ। দেখা গেল অদৃশ্য নারীর একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি কোন এক সময়।

ছাদের উপর দেখা গেল অবিনাশবাবু ও সুনন্দকে। দুজনের মুখেই তৃপ্তির হাসি। হঠাৎ বাইরে থেকে আলোটা কে যেন নিবিয়ে দিল। শুক্লা একাদশীর অপূর্ব জ্যোৎস্না মুহূর্তের মধ্যে ছাদ থেকে ছুটে এল ঘরের মধ্যে। সেই আলোয় দেখা গেল ঘরের মধ্যেকার ছায়া দুটো কাছে···আরও কাছে এগিয়ে আসছে। তারপর · ছায়া দুটো এক হয়ে গেল।

প্রেম ও প্রতিহিংসা

॥ এক ॥

রঞ্জন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছিল।

ল্যাবোরেটারীর রুদ্ধ কক্ষে শ্বাসরোধকারী উত্তাপ। সেই উত্তপ্ত পরিবেশে মেটালের উপর হিটের (heat) প্রভাব লইয়া বিশেষ গবেষণা চলিতেছিল। হরকুমার মিত্রের সুনজরে পড়িবার পূর্বে সে কলিকাতায় একটি বেসরকারী কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিল। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার হরকুমার মিত্রের সহিত তাহার একদিন আকস্মিক পরিচয়ের পর হইতে এখানে সে গবেষক বৈজ্ঞানিক হিসাবে যোগ দিয়াছে। মাহিনা ভাল, স্বাধীনতা অবাধ! হরকুমারের শ্রদ্ধারও অভাব ছিল না।

কিন্তু সংবাদটা শুনিবামাত্র রঞ্জনের সমস্ত শরীরে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। অথচ খবরটা অবিশ্বাস করিবারও উপায় নাই। সুজাতা নিজেই বলিয়াছে।

সেও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল।

এমন কথা যে কল্পনাও করা যায় না।

ল্যাবোরেটারীর উত্তপ্ত পরিবেশে অত্যন্ত দামী যন্ত্রের সাহায্যে টাঙ্‌স্টেন ষ্টীলের কয়েকটি জিনিসের উত্তাপজনিত বৃদ্ধির পরিমাপ করিতে করিতে রঞ্জন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িল। তাহার নিকট ল্যাবোরেটারী···চাকুরী···হরকুমার ···সব নিতান্ত অর্থহীন হইয়া পড়িল।···

সুজাতা ভুল করে নাই তো?

কিন্তু, তাহাই বা কিভাবে হইতে পারে? তাহার বয়স হইয়াছে। অন্তত: যে-বয়সে মেয়েরা এসব বিষয়ে অনেক কিছু বুঝিতে পারে সে বয়স তাহার হইয়াছে। সুতরাং ব্যাপারটা হাল্কাভাবে উড়াইয়া দেওযাও চলে না। অথচ প্রৌঢ় হরকুমারবাবুকে দেখিয়া শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না।

শ্রদ্ধা!···স্কাউণ্ড্রেল হরকুমার! তাহাকে চাবুক মারা উচিত। কিন্তু এই হরকুমারই তো সুজাতার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তাহাকে কন্যার ন্যায় লালন পালন করিয়া আজ দীর্ঘদিন ধরিয়া শিক্ষায় দীক্ষায় বড় করিয়া তুলিতেছে। সেদিন সুজাতার কেহই ছিল না। তাহার পিতা হরকুমারের বাল্যবন্ধু ছিলেন—কলেরায় বাবা মাকে হারাইয়া কেবল সেই সূত্রেই দশ বছরের সেই মেয়েটি হরকুমারের গৃহে তাঁহার কন্যার মতোই বাড়িয়া উঠিয়াছে। কোনও দিন যত্ন বা স্নেহের এতটুকুও অভাববোধ করে নাই। আজ একুশ বছরের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া সুজাতা হরকুমারের নিকট হঠাৎ একি আঘাত পাইল! এ আঘাতের কল্পনাও যে সে করে নাই···অন্তত: হরকুমারের নিকট হইতে।

সুজাতার কথা চিন্তা করিতে করিতে রঞ্জনের হিসাবে ভুল হইয়া যাইতেছিল। সে আবার মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগাইযা ধাতুর উপর উত্তাপের প্রভাবজনিত বৃদ্ধির পরিমাপ করিতে লাগিল!···না, হরকুমারকে জানিতে দেওয়া হইবে না···কোনো কলেজে আবার চাকুরীর চেষ্টা করিতে হইবে। তারপর সুজাতা —

রঞ্জনের চিন্তায় বাধা পড়িল।

হরকুমার আদুড় গায়ে কোন্ সময় পাশে আসিয়া দাঁড়াইযাছেন। বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়াছে। শরীরের বাঁধুনি সুন্দর। মাথার চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে বটে কিন্তু চামড়া একটুও কোঁচকায নাই। সোজা উঁচু গড়ন·· বেশ রাশভারি শ্রদ্ধা-উৎপাদক চেহারা।

গম্ভীর গলায় হরকুমার বলিলেন: আজ তোমার কাজের ভুল হচ্ছে রঞ্জন!

: আই অ্যাম সরি স্যার। আর ভুল হবে না।

: না তোমার হাত স্টেডি নেই, মেজরমেণ্ট ঠিক হচ্ছে না। কি হয়েছে তোমার আজকে?

যন্ত্রের দিকে চোখ রাখিয়া রঞ্জন বলিল : কিছু হয়নি স্যার।

এক মিনিট রঞ্জনের দিকে তাকাইয়া হরকুমার বলিলেন : এদিকে তাকাও রঞ্জন···

মুখোমুখি চাহিতে গিয়া রঞ্জন মুখ নীচু করিয়া ফেলিল। হরকুমারের চোখ দুটি বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছে। হরকুমারের চোখে এ ধরনের হিংস্রতা সে আগে কোনও দিন লক্ষ্য করে নাই।

মুখ নামাইয়া রঞ্জন বলিল : বলুন স্যার।

: তোমাকে চাকরী দেওয়া হয়েছে আমার কাজের সুবিধার জন্য— একথা নিশ্চয়ই তুমি অস্বীকার করবে না।

: আজ্ঞে না।

: কিন্তু তোমার কাজ যদি আমাকে বিরক্ত করে, তাহলে তার ফল কি ভাল হবে?

রঞ্জন চুপ করিয়া রহিল।

হরকুমার গম্ভীর গলায় আবার বলিলেন : আশা করি তুমি আমার কথা বুঝতে পেরেছ।

রঞ্জন মুখ লাল করিয়া নিজের কাজ করিতে লাগিল। কথা বলিল না।

॥ দুই ॥

সন্ধ্যার সময় লেকে পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে দুজনের দেখা হইল। সুজাতার আসিতে বেশ কিছুটা দেরী হইয়া গিয়াছিল। আসিবামাত্র রঞ্জন প্রশ্ন করিল : এত দেরী হল যে সুজাতা—

: বাঘের মুখে পড়েছিলাম।

: বাঘের মুখে।

: হ্যাঁ, বেরোবার মুখে দেখি কাকাবাবু বাইরে মোটরে বসে আছেন—

: তারপর—

: বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ? চল আমার সঙ্গে একটু বেড়িয়ে আসবে।'

: তুমি কি বললে?

: আমি তো পালাতে পথ পাই না। শেষে বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম, এক

বন্ধুর খুব অসুখ করেছে···দেখতে যাচ্ছি—

: ছাড়া পেলে ?

: না কাকাবাবু বললেন, 'চল তোমাকে তাহলে গাড়ী করে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।' কি আর করি। লেকের কাছে এক বন্ধু থাকে, কাকাবাবুর সঙ্গে তার বাড়ীতে এলাম গাড়ী করে। কাকাবাবু পৌঁছে দিয়ে চলে গেলেন। আমি সেখান থেকেই আসছি।

: তোমার কাকাবাবু তাহলে বুঝতে পারেন নি ?

: ঠিক জানি না। তবে চলে যাবার সময় বললেন, 'বন্ধুর অসুখটা শরীরের না মনের ? মনের যদি হয় তাহলে সাবধানে থাকতে বোলো। এ রোগে অনেক সময় প্রাণসংশয় পর্যন্ত হয়ে থাকে—'

রঞ্জন উত্তেজিত ভাবে বলিল : স্কাউণ্ড্রেল।···ভয় দেখিয়ে আমাকে সরাতে পারবে না।

সুজাতা ভীতভাবে বলিল : কি জানি, কাকাবাবুকে আমার যেন কেমন লাগছে আজকাল।

রঞ্জন জিজ্ঞাসু ভাবে তাহার মুখের দিকে তাকাইল। সুজাতা বলিয়া চলিল : কাকাবাবুর জন্যে আমি এতদিন মা বাবার অভাব বুঝতে পারিনি। কিন্তু যেদিন থেকে তুমি তাঁর সহকারী রূপে বাড়ীতে এলে এবং আমার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়ে গেল, সেদিন থেকেই কাকাবাবু যেন কি রকম বদলে যেতে লাগলেন।

: মনে হয় সেটা হরকুমারবাবুর গার্জেনির ব্যাপার। অভিভাবক হিসেবে তিনি বোধহয় আমাদের মেলামেশা ভাল চোখে দেখেননি তাই—

: প্রথম প্রথম আমারও তাই মনে হত। কিন্তু সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে তোমার ওপর তাঁর বিরক্তির আসল কারণটা বুঝতে পারছি—

রঞ্জন কৌতূহলের সহিত বলিল : সেদিনকার ঘটনাটা একটু খুলে বল তো ?

সুজাতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল ! হঠাৎ যেন ভূত দেখিয়া বোবা হইয়া গেল। লেকের আলো-অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—আর কেহ নহে, সশরীরে স্বয়ং হরকুমারবাবু। সামনে আসিয়া গম্ভীর গলায় বলিলেন : তোমার বন্ধুর অসুখ যাতে আর না বাড়ে, আশা করি সে ব্যবস্থা করেছ সুজাতা ? চল এবার বাড়ী ফেরা যাক।

সুজাতা মন্ত্রচালিতের ন্যায় উঠিতে যাইতেছিল। রঞ্জন বাধা দিয়া বলিল : দাঁড়াও—

হরকুমার যেন এইবার রঞ্জনকে দেখিতে পাইলেন। ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলিলেন : একি! রঞ্জন যে? তোমারও অসুখ নাকি?

রঞ্জন তীব্রস্বরে বলিল : অসুখের কথা থাক, আপনার সঙ্গে আমার একটা আলোচনা আছে।

: বেশ তো, কাল সকালে আমার ওখানে এস, আলোচনা করা যাবে।

: না কাল নয়, আজই এবং এখনই—

: তোমার আবদার রাখতে পারলে খুবই খুশীই হতাম, কিন্তু নষ্ট করার মত যথেষ্ট সময় এখন আমার হাতে নেই। সুজাতা উঠে এসো। আমাদের তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে।

: না, সুজাতার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।

: তাই নাকি। কিন্তু সুজাতা বোধহয় তোমার মত লোফারের সঙ্গে কোনও কথা বলার চেয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মত আমার গাড়ীতে গিয়েই বসাই বেশী পছন্দ করবে।

: আমি, আমি—সুজাতা ইতস্তত করিল।

: হ্যাঁ তুমি চল গাড়ীতে।

মন্ত্রচালিতের ন্যায় সুজাতা হরকুমারের সহিত গাড়ীতে উঠিয়া আসিল। কখন গাড়ী ছাড়িল, কখন তাহারা বাড়ী পৌঁছাইল—সে ভালো করিয়া বুঝিতেই পারিল না! অভিভূতের মতোই সে গাড়ীতে বসিয়া ছিল। সারা পথ হরকুমারও কোন কথা বলিলেন না।

ওদিকে লেকের মাঠে আলো-অন্ধকারের বিচিত্র পটভূমিকা।

রঞ্জনের মাথায় আগুন জ্বলিতেছে। সুজাতা তাহাকে সব কথা বলে নাই, কিন্তু যেটুকু ইঙ্গিত সে দিয়াছে তাহাতে হরকুমারকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার···এমন সাংঘাতিক শিক্ষা·· যাহাতে···রঞ্জন দাঁতে দাঁতে চাপিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

॥ তিন ॥

পরদিন ল্যাবোরেটারীতে রঞ্জন যথাসময়ে আসিল। বাড়ীর ভিতর ল্যাবোরেটারী। কিন্তু হরকুমারের সহিত দেখা হইল না। অনেক চেষ্টা করিয়া সুজাতার দেখা মিলিল ফিরিবার সময়। সুজাতা কাঁদিতেছিল। রঞ্জন কাছে আসিতে সুজাতাই প্রথম কথা বলিল : আমায ক্ষমা কর, আমি··· আমি···মানে আমার বিয়ের দিন ঠিক হযে গেছে।

: বিযের দিন ! ঐ বুড়ো হরকুমারের সঙ্গে !

সুজাতা চুপ করিযা রহিল।

রঞ্জন আবার কথা বলিল : হয় তোমার মাথা খারাপ হযেছে, নয় তুমি বড় ভয় পেযেছ ? কিন্তু কিসের ভয় !

সুজাতা বিবর্ণভাবে ঘরের ভিতরে তাকাইল। রঞ্জন তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিল ঘরের মধ্যে হরকুমার বসিয়া আছেন। রঞ্জন গলা চড়াইযা বলিল : কিসের ভয় ? আমি তো আছি।

হরকুমার নড়িযা বসিলেন, তারপর কথাটা যেন লুফিয়া লইযা বলিলেন : বাড়ীটা আমার এবং এটা নাট্যশালা নয। সুজাতা, তুমি ঐ লোফারটাকে জানিযে দিতে পার আমি বিরক্ত হলে আমার দারোয়ানকে ডেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারি—

অপমানটা গাযে না মাখিযা রঞ্জন বলিল : সুজাতাকে আমি বিযে করতে চাই—

: আমি জানি।

: সুজাতাও আমাকে বিযে করতে চায়।

: তাই নাকি। এ খবরটা অবশ্য আমায় জানা ছিল না কিন্তু সুজাতা কি বলে ?

সুজাতা একটা কি কথা বলিবার চেষ্টা করিতে গেল কিন্তু মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হইবার পূর্বেই তাহার মাথাটা কেমন করিয়া উঠিল। যখন তাহার হুঁস হইল তখন রঞ্জনকে সেখানে পাইল না।

তাহাকে চোখ মেলিতে দেখিয়া হরকুমার নিকটে আসিলেন। বলিলেন : ভাল চাও তো জানিয়ে দিও যে তুমি রঞ্জনকে বিয়ে করবে না।

: আমি তা বলতে পারব না।

: এর ফল কি হবে জান ?

: আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিশ্চয়ই……নিশ্চয়ই আপনি অসুস্থ……

: অসুস্থ…হয়তো তাই…হয়তো…

: কি হয়েছে আপনার কাকাবাবু—

: কাকাবাবু নয়, বল রঞ্জনকে তুমি ফিরিয়ে দেবে।

: পারবনা।

: আমার সমস্ত সম্পত্তির জন্তেও না?

: না।

: রঞ্জনের বিপদ জেনেও?

: রঞ্জন ছেলেমানুষ নয়।

: হা হা হা—পিশাচের ন্যায় হাসিয়া উঠিলেন হরকুমার।

চোখ দুটি তাঁহার জ্বলিতেছে? সম্মোহিতের মত সুজাতা তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

হরকুমার আবার কথা বলিলেন: আমাদের বিয়ে হবে তিনদিন বাদে, একথা মনে রেখো। এই কটা দিন তোমার বাড়ী থেকে বেরোনো চলবে না।

হরকুমার চলিয়া গেলেন। সুজাতা বাড়ীর বাহিরে হইতে গিয়া দেখিল নেপালী দরওয়ান ফটক বন্ধ করিয়া দিয়াছে। সমস্ত রাত্রি তাহার ভাল করিয়া ঘুম আসিল না। যেমন করিয়া হউক রঞ্জনকে সংবাদ দিতেই হইবে… কিন্তু কিভাবে দেওয়া যায়? পরের দিন রঞ্জন ল্যাবোরেটারীতে আসিল না। রঞ্জনকে খবর দিতেই হইবে। টেলিফোন করিয়া? কিন্তু রঞ্জনের বাড়ীতে তো টেলিফোন নাই। আর এই বাড়ীতেও ফোনটা রহিয়াছে হরকুমার বাবুর শয়নকক্ষে…সেখানে গিয়া—

সুজাতা কি ভাবিতে লাগিল।

হরকুমার শয়নকক্ষে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। সুজাতাকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন: তুমি এখানে?

: ল্যাবোরেটারীতে গিয়েছিলাম রঞ্জনের খোঁজে—

: দেখা হল?

: না, খবর পেলাম। আপনি তাকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন!

: ঠিক বারণ নয়, দুচার দিন বাদে, আমাদের বিয়ের পর আসতে পারে। ল্যাবোরেটারীর কাজ তার যায় নি।

না, আপনার ল্যাবোরেটারীতে আর কাউকে আসতে হবে না। আমি নিজের হাতে আগুন দিয়ে এসেছি—

: আগুন !···

হরকুমার পাগলের স্থায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সুজাতা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করিয়া ঘরের দরজায় খিল দিয়া দিল। তারপর টেলিফোনটা তুলিয়া লইল। তাহার এক বন্ধুর বাড়ীতে ফোন আছে।···

হরকুমার একটু পরেই ফিরিয়া আসিলেন। আগুন কোথাও লাগে নাই। দেখিলেন, শয়নকক্ষ ভিতর হইতে বন্ধ। হরকুমার অনেকবার আঘাত করিবার পর অনেকক্ষণ বাদে দরজা খুলিল সুজাতা।

: দরজা বন্ধ করে তুমি ফোন করছিলে ?

: হ্যাঁ।

: রঞ্জনকে খবর দেবার ব্যবস্থা হ'ল ?

: হ্যাঁ।

: কিন্তু আমি যদি তাকে আসতে না দিই !

: তাহলে সে পুলিশের সাহায্য নিয়ে আসবে। বলবে আপনি তার ভাবী স্ত্রীকে বন্দী ক'রে রেখেছেন।

সুজাতার এ মূর্তি হরকুমার কোনও দিন দেখেন নাই। তিনি বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়িলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন : বেশ, তাই হোক।

সুজাতা শঙ্কিত ভাবে নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ভিতর হইতে খিল আঁটিয়া দিয়াও তাহার ভীষণ ভয় করিতে লাগিল। হরকুমারকে কি ভীষণ ··কি করুণ দেখাইতেছিল !

পরদিন বেলা বারোটার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে রঞ্জন ল্যাবোরেটারী ঘরে প্রবেশ করিল। দরওয়ান তাহাকে বাধা তো দেয়ই নাই বরং সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়াছে। কয়েকজন সহকর্মী ঘরের ভিতর কাজ করিতেছিলেন। হরকুমার নিজেই ধাতুর উপর উত্তাপের প্রভাব পরীক্ষা করিতেছিলেন। কক্ষটি উত্তপ্ত করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ আদুড় গায়ে বসিয়া হরকুমার কাজ করিতে-ছিলেন। পাশে একটা থার্মোফ্লাস্ক। সহকর্মীরা এটা সেটা আনিয়া দিতেছেন। ল্যাবোরেটারীর ভিতরের চেহারাটা রঞ্জন এক নিমেষে দেখিয়া লইল। অত্যন্ত স্বাভাবিক দৃশ্য। একবার তাহার মনে হইল সমস্ত ব্যাপারটাই

বুঝি দুঃস্বপ্ন·· সুজাতার মাথার ঠিক নাই।

একটু শব্দ করিয়া নিজের উপস্থিতি জানাইয়া দিয়া রঞ্জন বলিল: আমি এসেছি সুজাতাকে নিয়ে যাব বলে—

মাইক্রোস্কোপে চোখ রাখিয়া হরকুমার বলিলেন: সে যাবে না।

: যাবে না মানে? আপনি তাকে জোর করে আটকে রাখবেন নাকি? কি মনে করেছেন? এটা কি মগের মুল্লুক?

মাইক্রোস্কোপ হইতে মুখ তুলিয়া হরকুমার অ্যাসিষ্ট্যান্টদের বলিলেন: আপনারা একটু বাইরে যান···এর সঙ্গে একটু গোপন আলোচনা আছে। হয়ে গেলেই আমি আপনাদের ডাকব। আর বাইরে যাবার সময় এই ঘরের দরজা জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে যান।

সহকর্মীরা চলিয়া গেলে পর এইবার দুজনে মুখোমুখি হইলেন। দুজনেরই চোখ জ্বলিতেছে। রঞ্জন বলিল: জানেন, আপনি বেআইনি কাজ করছেন। পুলিস ডেকে—

: পুলিশ ডেকে আমিও তোমাকে কানমলা খাওয়াতে পারি হে ছোকরা? আমার বিনা অনুমতিতে তুমি এখানে ঢুকেছ—

: ভাল চান তো সুজাতাকে যেতে দিন—

: না দেব না। আর শুধু তাই নয়, সুজাতাকে আমি বিয়ে করব···জোর ক'রে··

: জোর করা ঘুচিয়ে দিচ্ছি রাসকেল—

ঠাস্ করিয়া একটা শব্দ বন্ধ দরজার বাহিরেও রঞ্জনের উৎকর্ণ সহকর্মীদের কানে গিয়া পৌছাইল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু হৈ-চৈয়ের চাপা শব্দও। তাঁহারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন। কিন্তু হরকুমার বাবু না ডাকিলে ভিতরে যাইবার হুকুম নাই। কিছুক্ষণ বাদে হাঁফাইতে হাঁফাইতে বাহিরে আসিল রঞ্জন। স্প্রিংয়ের দরজা আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে গোলমাল শুনিয়া কেহ দারোয়ানকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। কিন্তু রঞ্জন চলিয়া যাইবার অনেক পরেও ভিতর হইতে হরকুমার বাবুর কোনও আহ্বান আসিল না।

সহকর্মীরা উৎকণ্ঠিত ভাবে সেই আহ্বানের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রায় আধঘণ্টা কাটিয়া গেল। একটা ভীষণ সন্দেহ তাঁহাদের মনে চাপিয়া বসিল। অবশেষে একজন আর হরকুমার বাবুর আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়াই সকলের প্রতিনিধি হইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ভিতরে পূর্ব হইতেই অসহ্য উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া পরীক্ষা চালিতেছিল। দরজা জানালা সব বন্ধ থাকায় সে উত্তাপ এখন সহ্যের মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে। তাড়াতাড়ি দরজা জানালা দুই একটা খুলিয়া দিতেই ঘরের মধ্যে হরকুমার-বাবুকে দেখা গেল · চিৎ হইয়া পড়িয়া আছেন ·বুকের ভিতর হইতে ভলকে ভলকে রক্ত বাহির হইতেছে। যে সহকর্মীটি ভিতরে গিয়াছিলেন, তাঁহার আতঙ্কিত কণ্ঠের চীৎকারে অন্যান্য সকলেই হুড়মুড় করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। ঢুকিতেই যে দৃশ্য তাঁহাদের চোখে পড়িল তাহাতে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অবশেষে তাঁহাদের মধ্যেই একজন একটু সামলাইয়া লইয়া ফোনটা তুলিয়া হরকুমারবাবুর পারিবারিক চিকিৎসককে এই ভীষণ সংবাদটা জানাইলেন।

সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার আসিলেন। হরকুমারের বুকের দিকে তাকাইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কোন একটি ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে হরকুমারের হৃৎপিণ্ডের উপর আঘাত করা হইয়াছে। হরকুমার মারা গিয়াছেন। খবর পাইয়া অনতিবিলম্বেই পুলিসের হর্তাকর্তার দলও আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু রঞ্জন ··রঞ্জন কোথায় গেল? কেহ বলিল সে বাহিরে চলিয়া গেছে, কেহ বলিল সে নিশ্চয়ই সুজাতার ঘরে লুকাইয়া আছে।

পুলিশ আসিয়া সুজাতার ঘরের দরজায় আঘাত করিল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। ভিতরে কাহারা কথা কহিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হইল। দরজা খুলিল সুজাতা। ঘরের মধ্যে ইন্‌সপেক্টর চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিলেন। বলিলেন : রঞ্জনবাবু, আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে—

: চলুন—

ঘরের মধ্যে অনেকগুলি শাড়ী জামা ছড়ানো রহিয়াছে। দুই তিনটা সুটকেসের ডালা খোলা। সুজাতা কোথাও চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

সুজাতা রঞ্জনকে প্রশ্ন করিল : কখন আসছ?

রঞ্জনের হইয়া ইনস্‌পেক্টর চক্রবর্ত্তী উত্তর দিলেন : আপনি রঞ্জনবাবুর জন্য মিছিমিছি অপেক্ষা করবেন না। হরকুমারবাবু খুন হয়েছেন—একটা ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে—

: খুন হয়েছেন!

: হ্যাঁ—এবং খুনের সময় ঘরের মধ্যে রঞ্জনবাবু ছাড়া আর কেউ ছিল

না। ল্যাবোরেটারীতে কোনও ধারাল অস্ত্র পাওয়া যায় নি। তাই বাধ্য হয়ে আমাদের রঞ্জনবাবুকে সার্চ করতে হবে। সেই সঙ্গে এই ঘরটাও ভাল করে দেখতে হবে।

: এ ঘর ?

: হ্যাঁ রঞ্জনবাবু এই ঘরে অনেকক্ষণ এসেছেন। মাপ করবেন, আমাদের কর্ত্তব্য করতেই হবে। আপনার চাবির গোছাটা আমাদের দিন—

রঞ্জন কয়েকজন পুলিস কনেষ্টবলের সহিত কোথায় চলিয়া গেল। সুজাতার সব কিছু স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। হরকুমারবাবু মারা গিয়াছেন···খুন হইয়াছেন···খুন করিয়াছে রঞ্জন···ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে! একি স্বপ্ন না সত্য!

সুজাতার মাথা ঘুরিয়া গেল···সমস্ত শরীর কেমন অবশ মনে হইতে লাগিল; সংজ্ঞা হারাইয়া সে মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

॥ চার ॥

সুজাতা পাকা উকিল ঠিক করিল বটে কিন্তু মনে বিশেষ বল পাইল না। উকিলও সব কিছু দেখিয়া শুনিয়া সুজাতাকে খুব ভরসা দিতে পারিলেন না। অনেকটা murder in broad daylight···ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব ও পরের অনেক সাক্ষী আছে। তাহারা সাক্ষ্য দিবে যে ঘরের মধ্যে মৃত্যু-মুহূর্তে একমাত্র রঞ্জনই হরকুমারবাবুর নিকটে ছিল। কিছু পূর্বে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড তর্কাতর্কি হইয়া গিয়াছে—তাহার আওয়াজও বাহিরে অনেকে শুনিয়াছে। অর্থাৎ Circumstantial evidence রঞ্জনের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া murder-এর যে motive তাহাও অত্যন্ত স্পষ্ট। রঞ্জন সুজাতাকে ভালবাসিত। সুজাতাও রঞ্জনকে ভালবাসিত। এই ভালবাসা নষ্ট করিয়া বৃদ্ধ হরকুমারবাবু সুজাতাকে গায়ের জোরে, কিংবা টাকার জোরে, বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন।··

কোর্টে ঠিক এই ভাবেই সরকার পক্ষ হইতে কেস সাজান হইল। সুজাতার পক্ষের উকিল বিনোদ রায় বুঝিলেন এ মামলায় জেতার আশা দুরাশা মাত্র। তবু তিনি শেষবারের মত তাল ঠুকিয়া বলিলেন: ধর্মাবতার অভিযুক্ত রঞ্জন সান্যাল একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও বিজ্ঞানের গবেষক। তাঁর পক্ষে কাউকে খুন করা কি সম্ভব?

ধর্মাবতারের ভাবভঙ্গী হইতে বুঝিতে অসুবিধা হইল না যে তিনি বিনোদবাবুর এই যুক্তিতে মোটেই অভিভূত হন নাই।

বিনোদ রায় মহাশয় কিন্তু না দমিয়া বলিয়া চলিলেন : রঞ্জনবাবুকে হত্যা করতে কেউই দেখেনি। যদি অভিযুক্ত রঞ্জন সান্যাল হরকুমারবাবুকে কোনও ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করে থাকেন এবং তারপর সেই অস্ত্র তাঁর বুক থেকে টেনে বার করে আনেন তাহ'লে সেই মুহূর্তেই রক্তের দাগে তাঁর কাপড় জামা লাল হবার কথা। রঞ্জনবাবুকে ল্যাবোরেটারী থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে দরওয়ান, আর কয়েকজন ল্যাবোরেটারী কর্মী। কিছুক্ষণের মধ্যেই সুজাতাদেবীও দেখেছেন। এঁরা কেউই রঞ্জনের কাপড় জামায় রক্তের দাগ দেখতে পান'ন। তাঁর চাল চলনেও কোনও অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করেননি। আর রঞ্জনবাবু যদি কোনও ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে হরকুমারবাবুকে হত্যা করতেন তাহলে সে অস্ত্র ল্যাবোরেটারীতে, অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছে বা সুজাতা দেবীর ঘরে পাওয়া গেল না কেন? তাছাড়া রঞ্জনবাবু এই ঘটনার পর পালিয়ে না গিয়ে সুজাতাদেবীকে বাড়ী থেকে নিয়ে যাবার জন্য সুটকেশ গোছাচ্ছিলেন। এটা তাঁর নির্দোষিতাই প্রমাণ করে। রঞ্জনবাবু অপরাধী হলে সুজাতা দেবীই প্রথম বুঝতে পারতেন। কারণ তিনি সেদিন রঞ্জনবাবুর হাবভাব অনেকক্ষণ লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

বোঝা গেল সরকার পক্ষের উকিল মোটেই বিপর্যস্ত হন নাই। তিনি অতঃপর হরকুমারবাবুর ডাক্তারকে ডাকাইলেন। ডাক্তার তাঁহার সাক্ষ্যে জানাইলেন হরকুমারকে মৃত বলিযা ঘোষণা করার সময় তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মৃত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডে কোনও ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা হইযাছে।

: হরকুমারবাবু আপনার পেসেণ্ট ছিলেন। তিনি কি হার্টের অসুখে ভুগছিলেন, যাতে হঠাৎ পড়ে গিয়ে তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হতে পারে?

: না হরকুমারবাবুর হার্টের কোন অসুখ ছিল না। ছিল লিভারে ক্যান্সার। তাঁকে তা' জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। এমন কি তাঁকে একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে এই ধরনের ক্যান্সারে সাধারণতঃ রোগী খুব বেশীদিন বাঁচে না। হরকুমারবাবু ধারাল অস্ত্রের আঘাতে মারা গিয়েছেন। সে আঘাত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে করা হয়েছিল।

: আপনি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলেন কি করে?

: আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি হরকুমারবাবু চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর ডান হাত বুকের কাছে মুঠো পাকানো। বাঁ পাশে থার্মোফ্লাস্কটা খোলা পড়ে আছে। আশেপাশে জিনিষপত্র এলোমেলো ছড়ানো। বুকের ভিতর থেকে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। তাঁর বুকের ওপর কোনও ছোরা কি অন্য কোন ধারাল অস্ত্র ছিল না।

ইহার পর সরকারী ডাক্তারের সাক্ষ্য গৃহীত হইল। তিনি মৃতদেহের ব্যবচ্ছেদ (autopsy) করিয়াছিলেন। তিনিও প্রায় একই কথা বলিলেন। বলিলেন : মৃত ব্যক্তির লিভারে ক্যান্সারের ঘা ছিল। কোনও দেড় ইঞ্চি বা দু' ইঞ্চি মাপের সূচাল অস্ত্রের আঘাতে হৃৎপিণ্ডটা ফুটো হয়ে যায়। এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

এইবার সুজাতার এজাহার। কোর্ট এবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুজাতার সাক্ষ্যের গুরুত্ব অসাধারণ। সে কেবল সকল ঘটনার মূল কারণ নহে, হরকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রঞ্জনের সহিত অনেকক্ষণ কাটাইয়াও ছিল। এজাহার শুরু হইল।

: আপনার নাম সুজাতা দেবী ?

: হ্যাঁ।

: মৃত হরকুমারবাবুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ?

: রক্তের সম্পর্ক কিছুই নেই। কিন্তু পিতৃহীন ও মাতৃহীন আমাকে তিনিই লালন-পালন ভরণ-পোষণ করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। সে দিক থেকে তিনি সব চেয়ে বড় আত্মীয়।

: অভিযুক্ত রঞ্জন সান্যালের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল ?

: আমরা দুজনে বিবাহে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম।

: হরকুমারবাবু এ কথা জানতেন ?

: তাঁকে জানিয়েছিলাম অভিভাবক হিসেবে আশীর্বাদ নেবার জন্য। তাতে তিনি—

সুজাতা থামিয়া গেল।

: থামলেন কেন ?

: তাতে তিনি যে কেবল প্রবল আপত্তিই করেছিলেন তা নয়, তিনি স্বয়ং আমাকে বিয়ে করার অসঙ্গত প্রস্তাবও করে বসেন।

: এ ঘটনা কত দিন আগে ঘটে ?

: মৃত্যুর পাঁচ সাত দিন আগে।

: হরকুমারবাবুর প্রস্তাব শুনে আপনি কি করলেন ?

: আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। যাঁকে আমি এতদিন কাকাবাবু বলে এসেছি এবং সেই ভাবেই দেখে এসেছি তাঁর কাছ থেকে এ রকম প্রস্তাব! আমি দুঃখে অপমানে কেঁদে ফেলেছিলাম।

: হরকুমারবাবু এ ধরনের প্রস্তাব করলেন কেন ?

: তা জানি না। তবে অনেকদিন ধরে তাঁর মেজাজটা কি রকম খিট্‌খিটে হয়ে যাচ্ছিল। ডাক্তারবাবুর সাক্ষ্য শুনে মনে হল তিনি ক্যান্সারের যন্ত্রণায় বা মৃত্যুর চিন্তায় অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিলেন। আমার কান্নায় সান্ত্বনা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'বেশীদিন তোমাকে কাঁদতে হবে না। আমার মৃত্যুর আর বড় বেশী দেরী নেই। আমার মৃত্যুর পর বাড়ী ঘর টাকা পয়সার কোনো অভাবই তোমার থাকবে না।'—তাঁর প্রতি হয়ত সহানুভূতি জাগত, কিন্তু সান্ত্বনা দেবার সময় তিনি এমন অসঙ্গত আচরণ করে ফেলেছিলেন—

: কি আচরণ ?

: তা বলতে পারব না। কিন্তু আমি যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছিলাম। অথচ তাঁর কাছে ঋণ আমার সবচেয়ে বেশী। একদিন রঞ্জনকে সব কথা খুলে বললাম।

: রঞ্জনবাবু কি করলেন ?

: শুনে তো রঞ্জন ক্ষেপে গেল। বললে, এক্ষুনি চলে এসো ও বাড়ী ছেড়ে। আমি অন্য কোথাও চাকরী জোগাড় করে নেব। আমারও সেই মুহূর্তেই ও বাড়ী ছেড়ে রঞ্জনের সঙ্গে বেরিয়ে আসার দারুণ ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাকাবাবুকে একা ফেলে রেখে আসতে পারলাম না। বড় অসহায় তিনি। এতদিন তাঁকে মেয়ের মত ভালবেসেছি। এতদিনের ঋণ আজ কি করে অস্বীকার করি। রঞ্জনের কাছে কয়েকদিন সময় নিলাম। বললাম, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। তুমি নিজের একটা ব্যবস্থা কর।

: তারপর ?

: কিন্তু আমার মস্ত ভুল হয়ে গেল। আমাকে জোর করে বিয়ে করার জন্ত কাকাবাবু ক্ষেপে উঠলেন। যেদিন তিনি খুন হন তার আগের দিন কৌশলে এক বন্ধুর সাহায্যে রঞ্জনকে আমি সব খবর জানাই।

: রঞ্জনবাবু যে আক্রোশ বশে হরকুমারবাবুকে আঘাত করতে পারেন এ

আশঙ্কা আপনার হয় নি ?

: না। কারণ রঞ্জনকে আমি খুব ভাল রকমই জানি। তার পক্ষে কোনও বৃদ্ধকে অপমান করা, খুন করা ত দূরের কথা, অসম্ভব।

: তারপর ?

: তারপর ঘটনার দিন রঞ্জন কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করল ল্যাবোরেটারীর মধ্যে। শুনেছি, সেখানে দুজনের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হয়। তারপর সে ল্যাবোরেটারী থেকে বেরিয়ে সোজা আমার কাছে আসে।

: রঞ্জনবাবুকে তখন কি অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল ?

: সে খুব বিচলিত হয়েছিল এবং হাঁপাচ্ছিল। তবে কোনও অস্বাভাবিক ভাব তার মধ্যে লক্ষ্য করি নি।

: রঞ্জনবাবুর কাপড়ে জামায় রক্তের দাগ লক্ষ্য করেছিলেন ?

: না।

: তিনি কি কোনও জিনিস আপনাকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে বলেছিলেন ?

: না।

: আপনাকে কিছুক্ষণের জন্য ঘর থেকে চলে যেতে হয়েছিল কি ?

: না। রঞ্জন আমাকে কাপড় জামা গুছিয়ে নিতে বলে আমাকে সাহায্য করছিল। আমি কয়েকটা শাড়ী জামা স্যুটকেশে ভরছি, কয়েকটা তুলে রাখছি, এমন সময় পুলিস ইনস্পেকটর ঘরের দরজায় নক্ করেন।

: রঞ্জনবাবু আপনাকে হরকুমারবাবুর মৃত্যুর খবর দেন নি ?

: না।

: আপনাকে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলেন নি ?

: না। তাড়া করে নি।

: আপনি পুলিসের কাছেই প্রথম হরকুমার বাবুর মৃত্যু সংবাদ পেলেন ?

: হ্যাঁ। সংবাদ শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিশেষ করে যখন পুলিসের সন্দেহের খবর জানলাম যে ল্যাবরেটারীতে রঞ্জনই কাকাবাবুর সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত ছিল এবং কাকাবাবুর হৃৎপিণ্ডে কোনও ধারাল জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে।

: তারপর ?

: তারপর পুলিস ধরে নিয়ে গেল রঞ্জনকে কাকাবাবুকে খুন করার অভিযোগে।

: আপনি কি করলেন?

: তখন আমার মানসিক অবস্থা সাংঘাতিক। কাকাবাবু খুন হয়েছেন, রঞ্জনকে ধরে নিয়ে গেল খুনী সন্দেহে···আমি যেন পাগলের মত হযে গেলাম··· পায়ের তলা থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে মনে হল···পরে শুনেছি আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম প্রায় দু'দিন কোন জ্ঞান ছিল না।

: তারপর···

: ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে গেলাম উকিলবাবুর বাড়ী। তারপর জেলখানায় গিয়ে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করলাম উকিল বাবুকে নিয়ে।

: রঞ্জনবাবু কি বলেন?

: রঞ্জন বলে সে নির্দোষ। সে খুনের কিছুই জানে না।

: আপনারও কি তাই মনে হয়?

আসামী পক্ষের উকিল গর্জিয়া উঠিলেন, "এ প্রশ্ন অবান্তর···অপ্রাসঙ্গিক ·অসঙ্গত। সুজাতা দেবীর পক্ষে কোনও মতামত দেবার প্রয়োজন নেই।··"

বিচারক আপত্তি মানিয়া লইলেন।

সুজাতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কাঠগোড়া হইতে নামিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে এখুনি যে কথা বলিতে যাইতেছিল তাহা বলিতে না পারিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে।

সেদিনকার মত সওয়াল-জবাব শেষ হইল। কিন্তু মামলার অবস্থা দেখিয়া উকিল বাবু সুজাতাকে খুব সাহস দিতে পারিলেন না। কিন্তু সুজাতা রঞ্জনের বিপদে স্থির থাকিতে পারিল না। কিছু একটা করিতেই হইবে।

পুলিশের সাহায্যে কিছু হইবে না। বেসরকারী সাহায্য যদি পাওয়া যায়। কাহার কাছে যাইবে? দু-একজন বেসরকারী গোয়েন্দার নাম তাহার কানে আসিযাছিল। কিন্তু কাহাকেও সে চিনিত না।

মনে বল না পাইয়া সুজাতা দু-চারদিন মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিল। কিন্তু না, দেবতার নিকট হইতেও কোন ভরসা, কোন সাহায্য আসিল না। তাহার আশঙ্কা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিল।

অবশেষে সে একদিন টেলিফোন ডাইরেক্টরী দেখিয়া ফোন করিল সুনন্দ

চ্যাটার্জীকে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসাবে তাহার কিছু খ্যাতির কথা সে শুনিয়াছে।

সুনন্দ বাড়ীতেই ছিল। সুজাতা তাহার কথা মত তাহার সহিত দেখা করিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সুনন্দ সুজাতার কথা শুনিল। পরে যে ল্যাবোরেটারীর ভিতর সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল সেইখানে গিয়া হাজির হইল। হরকুমারবাবুর সহকারীরা সুজাতা দেবীকে সঙ্গে লইয়া সব কিছু দেখাইয়া দিল; হরকুমারকে শেষ কোথায় জীবিত দেখা গিয়াছিল। থার্মোফ্লাস্কটা হরকুমারবাবুর শরীরের পাশেই পড়িয়াছিল অথচ থার্মোফ্লাস্কে যদি কোনও তরল পদার্থ থাকিত তাহার কিছু অংশ হয় ফ্লাস্কে নয় মেঝেতে পড়িয়া থাকিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ফ্লাস্কের ভিতরে কিছুই ছিল না। তবে হরকুমার বাবু ঘরের মধ্যে ফ্লাস্ক লইয়া গিয়াছিলেন কেন?

সুনন্দ নিজে এম. এস. সি। টাঙ্গষ্টেন ষ্টিলের উপর উত্তাপের প্রভাবের জন্য ঘরে কি পরিমাণ উত্তাপের সৃষ্টি করা হইয়াছিল তাহা টুকিয়া লইল। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। ঘরের মধ্যে কিছু একটা জিনিষের সন্ধান করিল। পরে বলিল, "একবার হরকুমার বাবুর শোবার ঘর, লাইব্রেরী দেখতে হবে। যদি তাঁর কোনও ডায়েরী থাকে সেটাও দেখা দরকার।"

হরকুমার বাবুর শোবার ঘর, পড়ার বইগুলি সুনন্দ ভাল করিয়া দেখিল। তারপর কিছু মেটালর্জি বিষয়ে আলোচনার জন্য এবং কিছু পদার্থ বিদ্যার একটা জটিল ব্যাপারে সে কিছু নোট করিয়া লইল।

হরকুমার বাবুর ঘরে কুলপি বরফের চোঙ্গার মত একটি পাত্রের সন্ধান পাইয়া সুনন্দর চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সে হরকুমার বাবুর সহকর্মীদের সামনে সেই পাত্রটি ঘরের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিল এবং এই চুক্তির ন্যায় পাত্রটি যে হরকুমার বাবুর ঘরের ভিতর ছিল তাহা সহকারীদের দ্বারা লিখাইয়া লইল।

এইবার রঞ্জন চলিল Science College এর পদার্থ বিদ্যার প্রবীণ অধ্যাপকের বাড়ীতে। ডঃ অরুণাংশু হালদার সুনন্দর কথা মন দিয়া শুনিলেন। হরকুমার বাবুর শয়ন কক্ষ হইতে সংগৃহীত চুক্তিটিকেও ভাল করিয়া দেখিলেন। মনে হইল তিনি সুনন্দর একটা থিয়োরী লইয়া চিন্তা করিতেছেন।

॥ পাঁচ ॥

অভিযুক্ত রঞ্জনের এজাহারের দিন।

সুজাতা বুঝিয়াছিল এজাহারে নূতন কিছু পাওয়া যাইবে না, কেবল যন্ত্রণা বাড়িবে মাত্র।

কি যে হইবে !…

যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সকল ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে সেদিন তাহাকে কাঠগড়ায় দেখিয়া সুজাতা কাঁদিয়া ফেলিল। মামলা যে ভাবে চলিয়াছে তাহাতে রঞ্জনের কি যে ঘটিবে তাহা ভাবিতেও সুজাতার ভয় হয়। আবার রঞ্জনের দিকে তাকাইলে মাঝে মাঝে নিজের মনে একটা সন্দেহও উঁকি দিতে থাকে।

সুন্দর সুঠাম চেহারা। চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি…সরল প্রসন্ন মুখ, দাড়ি গোঁফে জঙ্গল হইয়া উঠিয়াছে…কিন্তু মুখে কোনও অপরাধের কালিমা আছে বলিয়া মনে হইল না। সুজাতার অন্তর হায় হায় করিয়া উঠিল।

কি যে ঘটিবে !

ওদিকে রঞ্জনের সওয়াল জবাব আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে—তাহার নাম কি ? কি করে ? কি করিয়া এই চাকুরী পাইল—ইত্যাকার মামুলী প্রশ্ন। সুজাতার মন তখন এসব প্রশ্ন ছাড়াইয়া অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে।

আচ্ছা দমবন্ধ হইয়া যাহারা মারা যায়, জলের তলায় অথবা গলায় দড়ি দিয়া…তাহাদের, তাহাদের…

ভাবিতে ভাবিতেই সুজাতার শরীর কেমন করিয়া উঠিল। সে পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দিকে ঢলিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ বাদে তাহার যখন হুঁস আসিল তখন অনেক দূর হইতে সওয়াল জবাবের কথাগুলি তাহার কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে কোর্ট ঘর·· কাঠগড়া·· রঞ্জন·· ধীরে ধীরে তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

পাশে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন তিনি সস্নেহে বলিলেন : ঘাবড়ে যেও না মা। আমার মনে হয় রঞ্জন নির্দোষ।

: আপনি…আপনি কে ?

: আমি সুনন্দর সঙ্গে এসেছি। আমি কলেজে পড়াই। আমার মনে হয় ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও রহস্য আছে।

: রহস্য !

: তাই মনে হয়। এখন একটু চুপ কর মা। রঞ্জন কি বলে শোনা যাক।

যদি কিছু আলো পাওয়া যায় অন্ধকারের মধ্যে।

সুজাতার কানে রঞ্জনের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল। সওয়াল জবাব অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। সে এইবার দুর্ঘটনার দিনের কথা বলিতেছে।

সরকার পক্ষের উকিল প্রশ্ন করিলেন: হরকুমার বাবুর ওপর আপনার তীব্র ঘৃণার ভাব ছিল?

: ছিল।

: আপনাকে যখন হরকুমার বাবু জানালেন যে তিনি সুজাতা দেবীকে বিবাহ করবেন তখন আপনার ক্রোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল কি না?

: উঠেছিল।

: আঘাত করবার ইচ্ছেও জেগেছিল?

: অস্বীকার করব না—সে ইচ্ছেও জেগেছিল। শুধু জাগেই নি, তাঁর কাছে গিয়ে গালে একটা চড়ও বসিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপর তাঁর মুখের দিকে যখন তাকালাম তখন কেমন হতভম্ব হয়ে গেলাম।

: কেন?

: চড় খেয়ে তিনি যে কেবল সামলে নিলেন তাই নয়, গম্ভীর গলায় বললেন, "সুজাতা তোমাকে বিয়ে করতে পারবে না। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের বিয়ে হওয়া অসম্ভব।"···রাগে তখন আমার আপাদমস্তক ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। বললাম, 'শুধু বিয়ে তাই নয়, আপনার চোখের সামনেই হবে। আমি চললাম সুজাতার কাছে। সাধ্য থাকে বাধা দিন।'

সরকার পক্ষের উকিল প্রশ্ন করিলেন: হরকুমার বাবু বাধা দেবার চেষ্টা করলেন?

: না। হাসলেন তিনি আশ্চর্য্যভাবে। আমি ল্যাবোরেটারী থেকে বেরিয়ে আসার সময় বাইরের দরজার কাছে এসে একবার ভিতরের দিকে তাকালাম। দেখি হরকুমার বাবু আপন মনে হাসছেন! তাঁর সামনে রাখা থার্মোফ্লাস্কটা তিনি কাছে টেনে নিয়েছেন। বোধহয় কফি বা চা কিছু খাবেন. আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম ·স্প্রিং ডোরটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আমি সুজাতার কাছে গিয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিতে বলি। কিছুক্ষণ পরে পুলিস এসে আমাকে গ্রেপ্তার করে।

: আপনি বলতে চান হরকুমার বাবুর মৃত্যুর ব্যাপার আপনার তখন অজানা ছিল।

: হ্যাঁ···আমি ও বিষয়ে কিছুই জানি না।

: আপনি চলে আসার সময় হরকুমার বাবু জীবিত ছিলেন ?

: ছিলেন, এবং থার্মোফ্লাস্ক খুলে কফি বা চা কিছু পান করতে যাচ্ছিলেন।

: কিন্তু পোষ্টমর্টেমে তাঁর পাকস্থলীতে চা বা কফি কিছুই পাওয়া যায় নি।

: আশ্চর্য্য তো। তবে তিনি থার্মোফ্লাস্ক খুলছিলেন কেন ?

সরকার পক্ষের উকিল কোন জবাব দিলেন না। সে দিনের মত শুনানি শেষ হইল। পথে বাহির হইয়া সুজাতা দেখিল কোর্টের ভদ্রলোক এবং সুনন্দ তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বৃদ্ধ আপন মনে কি ভাবিতেছিলেন।

সুনন্দ সুজাতার দিকে আগাইয়া আসিল। বৃদ্ধ প্রফেসর হালদারও তাহার দিকে আগাইয়া আসিলেন। বলিলেন তিনি সুনন্দর সহিত ল্যাবোরেটারীটি আর একবার দেখিতে চাহেন।

ল্যাবোরেটারীতে আসিয়া প্রফেসর হালদার ঘটনার দিন কত উত্তাপে মেটালের উপর হিটজনিত প্রসারের পরীক্ষা হইতেছিল তাহা নোট করিলেন। অ্যাসিস্ট্যান্টদের কয়েকজনের নিকট হইতে তিনি জানিয়া লইলেন যে যখন রঞ্জনকে তাঁহারা ল্যাবোরেটারীতে রাখিয়া চলিয়া যান তখনও ফ্লাস্কটা বন্ধ ছিল। যে সহকারী হরকুমার বাবুর মৃতদেহ প্রথম দেখেন তিনি বলিলেন মৃতদেহের পাশে ফ্লাস্কটা খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল। তখন ফ্লাস্কে কিছুই ছিল না।

প্রফেসর হালদার থার্মোফ্লাস্কটা ভাল করিয়া দেখিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া কি সব মাপ জোখ করিলেন। তারপর সুজাতাকে বলিলেন: হরকুমার বাবুর ঘরের চাবি তোমার কাছে আছে মা ?

: আছে ?

: চল···তাঁর ঘরটা একবার ভাল করে দেখতে হবে।

প্রফেসর হালদার ও সুনন্দ হরকুমার বাবুর ঘর হইতে গেলেন সায়েন্স কলেজ ল্যাবোরেটারী। সেখান হইতে ফরেনসিক ল্যাবোরেটারী। প্রফেসর হালদারের সহিত সুনন্দ কি আলোচনা করিল। তারপর উকিলের বাড়ী। দিনকয়েক অস্থিরভাবে কাটিল সুজাতার। তারপর শেষ শুনানীর দিন আসিল। কোর্ট লোকে লোকারণ্য। সরকার পক্ষের উকিল ও রঞ্জনের পক্ষের উকিল একই সঙ্গে কোর্টে আসিলেন। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকাইলেন। কাঠগড়ায় আসিল রঞ্জন। কোর্টে সচকিত হইয়া উঠিল

সুজাতা। হরকুমার বাবুর ল্যাবোরেটারীর কয়েকজন সহকর্মীকে কোর্টে দেখা গেল। রঞ্জনের মুখ বিষণ্ণ…বিচারে কি হইবে তাহা বুঝিতে বাকী নাই। সুজাতা তাহার দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিল।

মৃদু গুঞ্জন উঠিল ··বিচারপতি আসিতেছেন।

কোর্টের কার্য যথাবিধি আরম্ভ হইলে রঞ্জনের পক্ষের উকিল বলিলেন, "ধর্মাবতার, অভিযুক্ত রঞ্জন সান্ন্যাল যে নিরপরাধ তা প্রমাণ করবার জন্তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের প্রফেসর অরুণাংশু হালদার এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর সাক্ষ্য-গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হোক। সঙ্গে আছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ সুনন্দ চ্যাটার্জী। তাঁর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রোফেসর হালদার কিছু বলবেন।"

কোর্ট চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সরকার পক্ষের উকিল বলিলেন: প্রফেসর হালদার বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁর সাক্ষ্যে আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে এ মামলার কি সম্পর্ক?

অধ্যাপক অরুণাংশু হালদারের নাম শুনিয়া রঞ্জনও চমকিত হইয়া দেখিল দীর্ঘদেহ প্রশান্তবদন প্রৌঢ় প্রফেসর হালদার একটা থার্মোফ্লাস্ক লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন।

জজসাহেব অনুমতি দিলেন। সরকার পক্ষের উকীল প্রশ্ন করিলেন: আপনিই প্রফেসর হালদার…Head of the Department of Physics, Calcutta University ··

: হ্যাঁ।

: এই মামলা সম্পর্কে আপনি কি বলতে চান?

: সুনন্দ চ্যাটার্জি হরকুমার বাবুর মৃত্যুর বিষয়ে যে অনুসন্ধান করেছেন তাতে আমার মনে হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্দোষ। তবে তার আগে ধর্মাবতারকে এই ফ্লাস্কের দিকে দয়া করে একবার নজর দিতে বলি। এই রকম ফ্লাস্ক সেদিন ছিল হরকুমার বাবুর কাছে। হরকুমার বাবুর সহকর্মীরা আজ কোর্টে উপস্থিত আছেন। তাঁদের কাছ থেকে জানা যাবে যে তাঁরা যখন হরকুমার বাবু ও রঞ্জনকে ল্যাবোরেটারীতে রেখে বাইরে যান তখন ফ্লাস্কটি বন্ধ ছিল। যখন ফিরে আসেন তখন দেখেন তা খোলা পড়ে আছে। অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে ফ্লাস্কটি খোলা হয়েছিল।

: তাতে কি হয়েছে ?

এইবার বিচারকের অনুমতি লইয়া সুনন্দ কথা বলিতে লাগিল।

: ফ্লাস্কে সাধারণতঃ কফি বা গরম চা অথবা ঠাণ্ডা সরবৎ রাখা হয়ে থাকে—তাতে বাইরের উত্তাপ ভিতরের উত্তাপকে পরিবর্তিত করে না। কিন্তু পোষ্ট-মর্টেম পরীক্ষায় হরকুমার বাবুর পাকস্থলীতে কোনও ঠাণ্ডা বা গরম পানীয়ের কিছু পাওয়া যায় নি—

: তা আমরা জানি।

: সেইটেই আশ্চর্যের বিষয়। ফ্লাস্কের মধ্যে সাধারণ পানীয় ধরণের এমন কিছুই ছিল না যা খাবার জন্য ফ্লাস্কটা খুলতে হয়েছিল। অথচ ফ্লাস্কটা এই সময়ের মধ্যেই খোলা হয়েছিল। তাহলে কি জিনিষ ছিল তার মধ্যে ?

: কি জিনিষ ছিল তা জানবার দরকার কী ?

: সেইটে জানাই সবচেয়ে দরকারী ছিল। আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এক সেকেণ্ডের জন্য ফ্লাস্কটা খুলে একটা ঘটনা দেখাতে চাই। প্রফেসর হালদার দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।

সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রফেসর হালদারকে দেখিতে লাগিলেন। প্রফেসর হালদার ক্ষিপ্র হস্তে ফ্লাস্কটা খুলিয়া তিন ইঞ্চি লম্বা সূচ্যগ্র একটা কি বাহির করিয়া খোলা পাত্রে রাখিয়া জজ সাহেবের টেবিলে রাখিলেন।

জজ সাহেব প্রশ্ন করিলেন : এটা কি ?

সুনন্দ উত্তর করিল : এই রকম একটি অস্ত্রের সাহায্যেই সেদিন হরকুমার বাবুর হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়েছিল !

কোর্ট সচকিত হইয়া উঠিল।

সরকার পক্ষের উকিল প্রশ্ন করিলেন : কোথায় পেলেন এই অস্ত্র যার সন্ধানে পুলিস তন্ন তন্ন করে খুঁজে হয়রান হয়েছে !

: প্রফেসর হালদারের ল্যাবোরেটারীতে।

: প্রফেসার হালদারের ল্যাবোরেটারীতে ?

: হ্যাঁ···তৈরী করতে হয়েছে—

: তার মানে—

: বলছি সব কথা। ততক্ষণ অস্ত্রটি ধর্মাবতারের টেবিলের ওপরেই থাক···

: বেশ থাক···আপনি বলুন আপনার কথা—

: হরকুমার বাবু ডাক্তারের কাছে তাঁর ক্যান্সারের খবর পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। যখন ডাক্তারের কাছে তিনি জানলেন যে তাঁর মৃত্যু কেবল অবধারিত নয় খুব আসন্ন, তখন তিনি কেমন একরকম হয়ে গেলেন ; তারপর ধীরে ধীরে রোগের যন্ত্রণায় আর আসন্ন মৃত্যুর চিন্তায় তিনি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় তাঁর মনে হয়েছিলো যদি তাঁর কোনও ছেলেপুলে থাকত তাহলে তাঁর বিপুল সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা হত। সুজাতাকে এতদিন তিনি স্নেহ করে এসেছিলেন, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ঠিক করে এসেছিলেন। এইবার যখন দেখলেন যে তাঁর অসুখের অসহ্য যন্ত্রণার পাশে সুজাতা রঞ্জনকে নিয়ে আনন্দ করছে, তখন তিনি রঞ্জন ও সুজাতার কথা চিন্তা করতে করতে ক্ষিপ্তবৎ হয়ে গেলেন। সবাই আনন্দ করবে তাঁরই টাকা নিয়ে, আর তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিযে যাবেন—ভাবতে ভাবতে তাঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত ইচ্ছা জেগে উঠল। মনে করলেন সুজাতার মধ্যে যদি তাঁর একটি ছেলে আসত মন্দ হত না! ক্যান্সার বংশগত নয়। সুতরাং তাঁর সন্তান ঐ রোগ নিযে জন্মাবে এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। সুজাতার কাছে তিনি বিয়ের প্রস্তাব করলেন। ভয় দেখালেন। কিছুতেই কিছু হোলো না। প্রেম নির্ভীক। তাঁর সমস্ত কথা অস্বীকার ক'রে মৃত্যুর দিন রঞ্জন ল্যাবোরেটারীতে এসে হাজির হল। তাঁকে জানাল সুজাতাকে সে বিয়ে করবেই···সুজাতা সাবালিকা, সুতরাং তিনি কিছুই করতে পারবেন না। ল্যাবোরেটারীতে তর্কাতর্কি হল। ক্রুদ্ধ রঞ্জন চলে গেল ল্যাবোরেটারী থেকে। যাবার সময় দেখল হরকুমার বাবু ফ্লাস্কটি খুলছেন। রঞ্জন ল্যাবোরেটারী থেকে বেরুতেই ফ্লাস্কের ভেতর থেকে বার করলেন ঐ অস্ত্র। তারপর মুহূর্তের মধ্যে নিজের হৃৎপিণ্ডের ওপর আঘাত করলেন সজোরে।

সরকার পক্ষের উকিল বলিলেন : তাহ'লে ঐ অস্ত্র তাঁর হাতে বা হৃৎপিণ্ডে আটকে থাকত না কি ?

: না, থাকত না। এই তো জজ সাহেবের কাছে অস্ত্রটা রাখা হয়েছে। দেখুন না সেটা কোথায়।

এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জজ সাহেব সুনন্দর কথা শুনিতেছিলেন। এইবার সচকিত হইয়া অস্ত্রের দিকে তাকাইলেন।

এ কি ! কোথায় গেল সেই তিন ইঞ্চি লম্বা চকচকে বস্তুটা ! টেবিলের উপর পাত্রটা শূন্য পড়িয়া আছে। ম্যাজিকের সাহায্যে ছুরিটা অদৃশ্য হইয়া গেল নাকি ?

: কোথায় গেল জিনিষটা ?

: আর পাওয়া যাবে না।

: ভাল করে খোঁজা হোক।

: খুঁজলেও লাভ হবে না। ছুরিটা ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড আইস-এর (Carbon di-Oxide Ice) তৈরী। আশী ডিগ্রী ফারেনহিট টেম্পারেচারেই তা গ্যাসে পরিণত হয়। ঘরের উত্তাপে তা এতক্ষণে গ্যাস হয়ে গেছে। আর এ গ্যাসের কোনও গন্ধ নেই, তাই বাতাসে কোন ছাপই রেখে যায় নি। আমার কথা যে সত্য তা প্রোফেসার হালদার বলবেন।

: সে কি।

: হ্যা হরকুমার বাবু নিজে বৈজ্ঞানিক ছিলেন। শেষ অস্ত্র হিসেবে তিনি এই জিনিস তৈরী করে রেখেছিলেন। নিজের হাতে তিনি কার্বন ডাই-অক্সাইড বরফের ছুরি তৈরী করে সূচাগ্র অ্যালুমিনিয়মের পাত্রের ছাচে ঢালাই করেছিলেন। তারপর পাছে বাইরের উত্তাপে তা নষ্ট হয়ে যায় তাই থার্মোফ্লাস্কের মধ্যে বরফের আবরণে তাকে ভাল করে ধিরে রেখেছিলেন। ল্যাবোরেটারী কক্ষটি সেদিন অত্যন্ত উত্তপ্ত করে মেটালের উপর হিটের প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা চলছিল। কিন্তু ফ্লাস্কের মধ্যে বরফের আবরণে ঐ ছুরিটা ঠিকই ছিল, গলে যায় নি। রঞ্জন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর, মুহূর্তের মধ্যে ছুরিটা বুকে বসিয়ে দিলেন হরকুমার বাবু। একই সঙ্গে ক্যান্সারের যন্ত্রণা আর পরাজয়ের বেদনা হতে মুক্তিলাভ করে তিনি সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন সুজাতা আর রঞ্জনের ওপর। যখন ঘরের মধ্যে তাঁর সহকর্মীরা প্রবেশ করল তখন ঘরের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় সে ছুরি উবে গেছে।

সরকার পক্ষের উকিল প্রশ্ন করিলেন : Carbon di-Oxide Ice-এর ছুরি কি এতই শক্ত যে বুক ফুঁড়ে হৃৎপিণ্ডে আঘাত করলেও ভেঙে যাবে না ?

সুনন্দ উত্তর করিল : এ প্রশ্নের উত্তর আমার চাইতে Science College-এর Physics এর Head of the Department আরও ভাল করে দিতে পারবেন। তিনি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। তাঁর মতামত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

বিচারকের অনুমতি লইয়া সুনন্দ নামিল। প্রোফেসার হালদার তাঁহার অভিমত জানাইলেন : কার্বন ডাই অক্সাইডের আইস অত্যন্ত শক্ত। তা সূচ্যগ্র ছুরির মত করে হৃৎপিণ্ডের উপর আঘাত করলে কাজ হবে। কিন্তু তা মুহূর্তের মধ্যে করতে হবে। তা নইলে বাইরের উত্তাপে গ্যাস হয়ে যাবে।

: কিন্তু হরকুমার বাবু যে এরকম করেছিলেন তার প্রমাণ আছে ?

: প্রমাণ এই ভাল্‌কানাইটের পাত্রটি।

বিচারকের অনুমতি লইয়া সুনন্দ হরকুমার বাবুর ঘরে আবিষ্কৃত পাত্রটি দেখাইল। তারপর বলিল : এই পাত্রের মধ্যে Carbon di-Oxide Gas Co_2 থেকে বরফের ছুরি তৈরী করা হয়েছিল। আমি যে হরকুমার বাবুর ঘরের মধ্যে এই জিনিষটি আবিষ্কার করেছি এ-বিষয়ে হরকুমার বাবুর সহকর্মীরা সুজাতা দেবীর সঙ্গে আমার পক্ষে সাক্ষী দেবেন।

সরকার পক্ষের উকিল শেষ প্রশ্ন করিলেন : কিন্তু হরকুমার বাবু অন্য কোনও ভাবে আত্মহত্যা করতে পারতেন।

সুনন্দ উত্তর দিল

: তা নিশ্চয়ই পারতেন, কারণ ক্যান্সারে তাঁর মৃত্যু আসন্ন তিনি জেনেছিলেন। কিন্তু অন্য কোনও রকমে মৃত্যু হলে তিনি যে সম্পত্তি রেখে যেতেন তা ভোগ করত সুজাতা ও রঞ্জন। নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি রঞ্জনকেও শেষ করে দিয়ে যাবেন—প্রতিহিংসা নেবার এই নিদারুণ ইচ্ছেতেই তিনি মৃত্যুর এই বৈজ্ঞানিক পথটি বেছে নিয়েছিলেন।

সুনন্দর কথায় প্রফেসর হালদার সায় দিলেন।

জজ সাহেব জুরিদের অভিমত চাহিলে তাঁহারা একবাক্যে জানাইলেন আসামী নিরপরাধ।

রঞ্জন সুজাতাকে লইয়া কোর্ট হইতে যখন বাহির হইল তখন প্রোফেসর হালদারকে লইয়া সুনন্দ চলিয়া গিয়াছে। রঞ্জন ও সুজাতা গাড়ীর দিকে আগাইয়া গেল। গাড়ীতে সুজাতা রঞ্জনের একটা হাত তুলিয়া লইল কিন্তু তাহার চোখে জল। দুটি তাজা মনে আগামী আনন্দের সহিত অতীতের একটি বিষণ্ণ স্মৃতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে মিলিয়া গিয়াছে। গাড়ীর ভিতর রঞ্জন ও সুজাতা ঘেঁসাঘেঁসি হইয়া বসিল বটে কিন্তু এক প্রৌঢ়ের অশরীরী দেহের করুণ কামনা যেন দুটি প্রেমব্যাকুল হৃদয়ের মধ্যে একটা অদৃশ্য ব্যবধান রচনা করিয়া দিয়াছে।

শেষ